বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা

(প্রথমে প্রবন্ধাকারে মাসিক বসুমতীতে
"বাংলার বিপ্লব কাহিনী"
নামে প্রকাশিত)

হেমচন্দ্র কানুনগো

প্রথম সংস্করণ

কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯২৮

নিবেদন

১৩২৯ সালের আশ্বিন হ'তে ১৩৩৪ সালের মাঘ পর্য্যন্ত মাসিক "বসুমতীর" কোন কোন সংখ্যায় "বাংলার বিপ্লব কাহিনী" নামক যে প্রবন্ধ গুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছিল তা-ই সংশোধিত হয়ে "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" নাম নিয়ে পুস্তকাকারে পরিণত হল। প্রথমে অনবধানতা বশতঃ এর নাম করণ অসঙ্গত হয়েছিল। কারণ বিপ্লব বলতে যা বোঝায় বাংলা দেশে তা যখন সংঘটিত হয়নি তখন তার কাহিনী হবে কেমন করে।

তারপর যাঁদের কীর্ত্তিতে বাঙ্গালী জাতি এত গৌরবান্বিত তাঁদের লোক চক্ষুতে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছি ব'লে অথবা ওরকম লেখা আমার পক্ষে "অনুদারতা" ব'লেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। আবার ওরকম লেখার যে একটা আবশ্যকতা আছে, তা ব'লেও অনেকে আমায় উৎসাহিত করেছেন। যাই হোক্ এসম্বন্ধে আমার এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

আমি কয়েক জন মাত্র নেতা বা কর্ম্মবীরের কায সম্বন্ধে সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি; অর্থাৎ জনকয়েক বিশিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীকে উপলক্ষ মাত্র ধরে নিয়ে, জাতীয় চরিত্রের যে সকল দোষ থাক্‌তে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি কখনও সম্ভব হতে পারে না, সেই সকল দোষেরই সমালোচনা করেছি।

সেই সমালোচনাও অনেক বাদ সাদ দিয়ে ঠিক যতটুকু মাত্র করলে বক্তব্যের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয় তার বেশী একটুও করিনি। তাঁদের যে সকল ত্রুটীর উল্লেখ করেছি তা যে পারিপার্শিক ঘটনা চক্রের

প্রভাবেই করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন এবং সেজন্য যে আমাদের সমাজই দায়ী, সেই কথাটাই এখানে পরিষ্কার ক'রে বলতে চেয়েছি। সেই সমাজের ভাব, ভাবনা, চিন্তাধারা আদির আমূল পরিবর্ত্তন না হলে যে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত, অধিকন্তু এই কথাটার মধ্যে যে সত্যটী নিহিত আছে তা প্রমাণ করবার জন্যই তাঁদের কৃত এমন কয়েকটি মাত্র ত্রুটীর বিশ্লেষণ ও তার কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছি যা বাদ দিয়ে এরকম বিষয় লেখা নিরর্থক।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'' এ অনুযায়ী সিদ্ধিটা সর্ব্বত্র তাদৃশী না হ'লেও এটা নিশ্চিত যে 'হাতীটা চাইলে তবে ঘোড়াটা মেলে'। অন্য সকল বিষয়ে যেমন এই প্রবাদ বাক্যটা খাটে নেতা উপনেতার বেলায়ও তেমনি খাটে। এই বিপ্লবের আদর্শটা যেখান থেকে আমরা পেয়েছিলাম, তার নেতা আর কর্ম্মী সম্বন্ধেও যদি একটা আদর্শের ধারণা সেখান থেকে ক'রে নিতে পারতাম, যে সকল নেতা আমরা পেয়েছিলাম তাঁদের হাড়মাসের দেহ বা শ্রীচরণ গুলিকেই যদি একমাত্র পূজ্য না ক'রে, তাঁদের দেয়া আদর্শ, ভাব আদিই উচিত মত গ্রহণ করা নেতাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ব'লে মনে করতাম, অন্য পক্ষে নেতারা যদি তাঁদের প্রবর্ত্তিত ভাব সঙ্গত ভাবে গৃহীত হওয়াই নেতা গিরির চরম সার্থকতা ব'লে মনে করতেন, আর তাঁদের কায, দোষগুণ বিচারের অতীত ব'লে যদি দাবী করা না হ'ত, তাহ'লে কি রকম নেতা বা কর্ম্মী পেতাম তা সহজে অনুমেয়। আর এখন কি রকম নেতা বা কর্ম্মী পেয়েছি তাও প্রণিধান যোগ্য।

যাঁদের সম্বন্ধে ঐ প্রকার সমালোচনা করেছি তাঁদের মধ্যে 'ক' বাবু ও বারীনই প্রধান। এ রাই এই বিপ্লব ব্যাপারের "পাইওনীয়ার" বা আদিগুরুদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সব চেয়ে দেশপূজ্য ও

আদর্শ পুরুষ ব'লে গণ্য। আদর্শের ভালমন্দের ওপরেই দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর যে করে, এ ধারণা যাঁদের আছে, তাঁরা এঁদের বাদ দিয়ে, বা কাজের ফলাফল দেখবার পর তার দোষ গুণের উল্লেখ না করে, এঁদের কাজের সমালোচনা করতে পারেন না।

দোষ যে নিশ্চয় ছিল আর তার সমালোচনা যে অবশ্য করণীয় তাও অস্বীকার করতে পারবেন না। আর এঁদের কাজের সমালোচনাই সমস্ত আন্দোলনটার যে সমালোচনা একথাও স্বীকার করতেই হবে। তবে এই ভক্তির দেশে পূজ্য ব্যক্তিদের দোষ সমাজের অহিতকর জেনেও ঢেকে চেপে রাখা, সে দোষ অস্বীকার করা অথবা তা লীলা ব'লে সমর্থন করা প্রচলিত প্রথা বা রীতি। এতে দেশের কল্যাণ অস্বীকার করে ব্যক্তি বিশেষকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এখানে আর বলা বাহুল্য মাত্র। তবে শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, দোষগুণ সমালোচনা দ্বারা ঐ রকম কোন ব্যক্তি বিশেষকে, প্রকৃত পক্ষে তিনি যা, তা থেকে তাঁকে ছোট বা হীন করা হয় না। পরন্তু তাঁদের কৃত কাযের বা তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ দেখান হয় মাত্র। যিনি যত বড় লোক বা যত অধিক দেশমান্য তাঁর কাজের তত অধিক সমালোচনা হওয়াই যে দেশের পক্ষে কল্যাণ জনক, ডেমোক্রেশির যুগে এ কথাটা স্বীকার করতেই হবে। আমি 'ক' বাবু, বারীন কিম্বা অন্য কাউকে হীন "অনুদার" ভাবে সমালোচনা করিনি। মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁদের দেশ সেবারই সমালোচনা করেছি। 'ক' বাবু ও বারীনের প্রকৃত স্বরূপ যা তা থেকে এতে তাঁরা একটুও ছোট বা হীন হবেন না।

কোন কিছুর মাত্র এক অংশ বা একদিক দেখে নির্ব্বিচারে সমস্ত

জিনিষটা জেনেছি ব'লে মনে করাকে "অন্ধ-হস্তীন্যায়" বলে। এই বিপ্লব অনুষ্ঠানের একটা ক্ষুদ্র অংশ বা দিক আছে যা বাংলার মত দেশের পক্ষে একটু গৌরব জনক। ঐটুকু মাত্র অতিরঞ্জিত ভাবে দেখেই সমস্ত ব্যাপারটার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হয়েছে ভেবে বাঙ্গালী আমরা বেশ গৌরব অনুভব করছি। আর একটা সস্তা অসঙ্গত আশায় বুক বেঁধে নিশ্চিন্ত আছি যে, দেশ উদ্ধারের আর দেরী নেই; বাংলা নিশ্চিত অথচ দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে; পেছন ফিরে আর দেখবার আবশ্যক নেই অথবা নতুনক'রে কিছু ভাববার বা করবার দরকারও নেই।

অনেকে মনে করেন আমি নাঁকি তথাকথিত গুপ্ত সমিতির গুপ্ত কথা ফাঁস ক'রে দিচ্ছি। ঐ সকল গুপ্ত তথ্য, কতটুকু গুপ্ত ছিল বা আছে আর যথা স্থানে কত অধিক ফাঁস হয়ে গেছে, সে বিষয়ে তাঁদের কোন ধারণা নেই ব'লেই এই রকম মনে ক'রে থাকেন। ঐ গুপ্ত কথা কতদূর ফাঁস হয়ে গেছে ও কেমন ক'রে হয়েছে সাধারণের পক্ষে তা জানবার কোন উপায় নেই। তবে তাঁরা যদি অন্ততঃ 'রাউলাট কমিশন রিপোর্ট' খানা একবার পড়েন তবে অনায়াসে আমার কথা কতটা সত্য তা কতকটাও উপলব্ধি করতে পারবেন।

যাই হোক্ আমি একটুও যে হতাশার কথা বলিনি, তা যাঁরা এই পুস্তকে লিখিত বক্তব্য ভাল করে পড়বেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। বসুমতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত এক আধটা প্রবন্ধ পড়ে, ঐ রকম হতাশার কথা ব'লেছি ব'লেই মনে করা, অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকবে।

আমরা স্বরাজ চাই, তাই স্বরাজ আনতেই হবে। কিন্তু স্বরাজটা কি জিনিষ, তার ধারণা না থাকলে তা কেমন ক'রে আনব? এই

কথাটাই আগে চিন্তার বিষয়ীভূত করাবার জন্য এত কথা বলা। কাজেই প্রকৃত পক্ষে আশার কথাই বলেছি।

আমার বাংলার ভাইদের কাছে সনির্ব্বন্ধ নিবেদন আপনারা নেতা, উপনেতা, কর্ম্মী, দেশ, দেশের কাজ, কর্ম্মপদ্ধতি, জাতীয়তা, জাতীয় উন্নতি, তা'র বাধা-বিঘ্ন আদি সম্বন্ধে চিন্তা করুন। নতুন নতুন উন্নততর আদর্শের সন্ধান করুন। আদর্শ বা উন্নতির ধারণা নিত্য ক্রম উন্নত না হ'লে, মহান না হ'লে, সর্ব্বজন বোধ্য না হ'লে, কর্ম্ম একধাপও এগোবে না। কর্ম্ম ব্যতীত উন্নতিও অসম্ভব। সর্ব্ববিষয়ে ক্রমোন্নতি ব্যতীত স্বরাজও অসম্ভব। স্বরাজ উন্নতির একটা ধাপ মাত্র। উন্নতি অসীম।

১লা জুন, ১৯২৮।
কলিকাতা।

হেমচন্দ্র কানুনগো

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

গুপ্তসমিতির সূচনা।

• বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ঠিক কবে প'ড়েছিলাম, মনে নেই। ১৯০২ সালের পূর্ব্বে থিয়েটারে 'আনন্দমঠ' অভিনয় হতে দেখেছি। তখন বিশেষ কিছু ভাব প্রাণে জেগে উঠেছিল ব'লে মনে হয় না। "বন্দেমাতরম্" গানটীতে যে এত শক্তি ও ভাব নিহিত ছিল, তাও কেউ তখন সন্দেহ কর্‌তে পেরেছিলেন ব'লে শুনিনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে না কি সভাবাজার রাজবাটীতে একদিন নিমন্ত্রিতদের সভাতে কথাচ্ছলে সে কালের কয়েকজন লেখক ও কবিদের নিকট বলেছিলেন, "তোমরা দেখবে এই বাংলাদেশে আমার 'আনন্দমঠ' জলজ্যান্ত অভিনীত হয়ে মহাবিপ্লব আন্‌বে।" বিশেষ বিশেষ ঘটনার ঠিক পরেই এই রকম উক্তি পরিকল্পিত হয়ে থাকে। এই উক্তিও সেই প্রকারের বলেই মনে হয়।

১৯০২ সালের পর 'আনন্দমঠ' আবার প'ড়ে অনুভব করেছিলাম, কেবল গল্প শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া ছাড়া, এটা অজ্ঞাতসারে মনের ওপর একটা সজীব এবং ঐকান্তিক ভাবের ছাপ মেরে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকখানি উপন্যাসে ঐ ভাবের ইঙ্গিত দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সেই ভাবটা যে কি, তা এখন অনেক ঘটনা-বিপর্য্যয়ের চাপে প'ড়ে যতটুকু বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তখন কিন্তু তার কিছুই পারিনি। তাই বেঁহুসে

ঐ ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাংলাদেশের তথাকথিত বিপ্লববাদীরা 'আনন্দমঠের' কেমন অভিনয় করেছিলেন, তা শোনাতে চেষ্টা কর্‌ছি।

ছেলে বেলায় যাত্রা থিয়েটারে যে পালায় অথবা যে পৌরাণিক গল্পে যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার না থাক্‌ত, তা আমাদের বড় ভাল লাগ্‌ত না। যুদ্ধের সংবাদ থাক্‌লে সংবাদপত্রের যেমন কাট্‌তি হয়, এমনটি আর কিছুতে হয় না। এ থেকে মনে হয়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অল্প বিস্তর যেন যুদ্ধের পক্ষপাতী। অবশ্য এখন যুদ্ধটা যে একেবারে গর্হিত অনাধ্যাত্মিক —সুতরাং অসভ্যতার পরিচায়ক, তা নানা রকমে ঘোষিত হচ্চে। আর তাই আমরা শিখ্‌ছি। ১৮৯৯ সালের অক্টোবরে সত্যিকার বুয়র-যুদ্ধের সংবাদে বাংলাদেশে কিন্তু এখনকার মত বিভীষিকা ও ঘৃণার বদলে তৃপ্তি ও ক্ষীণ আশার মধ্য দিয়ে প্রাণের একটা বেমালুম সাড়া অনুভূত হয়েছিল।

সেই সময়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। উভয়ে এক যায়গায় কাজ কর্‌তাম্। এর কিছুদিন আগে তিনি পরে পরে দুটী ইংরেজী সংবাদ-পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কাজেই রাষ্ট্র-নীতিতে তাঁর দখল ছিল এ কথা বলা যেতে পারে। মেদিনীপুরে তখন যাঁরা রাষ্ট্রনীতিতে মাতব্বর ছিলেন হয় ত তাঁদের চেয়ে 'অ' বাবু অনেক অগ্রসর ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁর সঙ্গে যাঁদের মত মিল্‌ত না, তাঁদের তিনি দেখ্‌তে পার্‌তেন না। তাই তাঁর অবসর কালে আলাপ কর্‌বার লোকের বোধ হয় অভাব হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় সুবিধামত লোক দেখে, তাকে মনের মত করে গড়ে নেওয়া ভিন্ন তাঁর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু মনের মত শিষ্য জোটা বড় ভাগ্যের কথা। মনের মত বুঝি জোটেনি। অগত্যা আমার ঘাড়ে চ'ড়ে বস্‌লেন। এ কাবটা তিনি আমায় ব'লে ক'য়ে নিশ্চয় করেন নি, এমন কি, তিনি নিজে বুঝে-সুজে করেছিলেন বলেও মনে

হয় না। এমনতর অনেক কাজ নিত্য করি, যার মতলব সম্বন্ধে আমরা তখন সম্পূর্ণ বেহুঁস থাকি।

তিনি সংবাদপত্র থেকে নিত্য বুয়র যুদ্ধের খবর পড়ে শোনাতেন ও নানা প্রকারে পলিটীক্‌স এমন আগ্রহ সহকারে বোঝাতেন যে আমার পক্ষে না বোঝাটা নিতান্ত অভদ্রতা হবে ব'লে অনেক সময় শোনবার ও বোঝবার ভাণ কর্‌তাম। তাঁকে এত খাতিরের কারণ, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ওপর আমার অসাধারণ ভক্তি। মামা ম'শয়ের নিকট বাল্যকাল থেকে তাঁর মহত্ত্বের কত প্রকার গল্প শুনেছিলাম। 'অ' বাবু, রাজনারায়ণ বাবুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মামা ম'শয়ও 'অ' বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ কর্‌তেন। এ হেন লোকের সহিত অখাতির বা অভদ্র ব্যবহার কর্‌তে পারা যায় না।

বুয়র যুদ্ধের অনেক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে সব চেয়ে বড় হয়ে প্রাণে লেগেছিল এই ঘটনাটি যে অত কটি অসভ্য (তখন এই রকমই বুঝেছিলাম) বুয়র অত বড় শক্তিশালী ইংরেজকে হটিয়ে দিচ্ছে। এটা যে কেবল সিক্রেট্‌ সোসাইটীর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল—'অ' বাবু তা নানা দেশের নানা ঘটনা থেকে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিতেন।

নতুন কিছু করবার, ভাব্‌বার, জানবার প্রবৃত্তিটা মা ও বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে বোধ হয় একটু পেয়েছিলাম। কিন্তু দিদিমা-সুলভ পারিপার্শ্বিক গতানুগতিকতার পাষাণচাপে সে প্রবৃত্তি কখনও সম্যক্‌ স্ফূর্ত্ত হ'তে পারেনি। শত শত উদ্যমশীলের উদ্যম, এই দেশজোড়া দিদিমা-প্রকৃতি কত রকমে যে আজও দমিয়ে দিচ্ছে, আরও কতকাল দমাতে থাক্‌বে, তা এখন ভাবলে আমাদের দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হ'তে হয়। কিন্তু তখন হতাশার কোন কারণ অনুভূত হয়নি। বরং সেই নতুন কিছু কর্‌বার প্রবৃত্তি, এতে সুবিধা পেয়ে আরও বেড়ে উঠ্‌ল। অবশেষে আমরা

বুয়রদের পথ অবলম্বন করি না কেন, এই প্রশ্নই বার বার আমাদের গল্পের মধ্যে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

বুয়রযুদ্ধের পূর্ব্বে আবিসিনিয়ায় ইতালীর পরাজয় এবং খুঁজলে, কালা আদ্‌মি দ্বারা গোরা লোকের পরাজয়ের আরও এক আধটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এসব খবর আমাদের দেশের খুব কম লোকেই রাখে। তাই এ দেশের লোকের দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছ্‌ল যে, গোরার বিরুদ্ধে কালা কখনও জয়ী হতে পারে না। বুয়রযুদ্ধ থেকে আমাদের সে ধারণা উল্‌টে গেল। বুয়ররা যদিও গোরা, তথাপি তখন বুঝে ফেলেছিলাম, তারা আমাদের তুলনায় অসভ্য মূর্খ। কারণ কোন প্রকারে অন্যকে চেঁচিয়ে ছোট বা অসভ্য জাহির করতে পার্‌লেই বড় হওয়ার পদমর্য্যাদার দায়টাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়। এ প্রকৃতি শুধু আমাদের নয়— ভারতের সাধারণ লোক আমরা ত চির-ক্রীতদাস; যে কোন জাতি যখন হীন অবস্থায় থাকে, তখনই এই প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, আসল কথা ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি। যাক্।

বুয়রদের পন্থাটি কিন্তু অবশেষে আমাদের পক্ষে নিতান্ত ঠিক ব'লে, একদিন শুভক্ষণে স্থির করে ফেলা গেল; অর্থাৎ কিনা সিক্রেট সোসাইটি গড়্‌তে হবে, এ মতলবটা আঁটা হয়ে গেল।

পূর্ব্বে যা হয়েছে বা শাস্ত্রে যার আদেশ আছে, তা ছাড়া নতুন কিছু করতে হলেই আমরা সঙ্কোচ বা অনিচ্ছা বোধ করি। দাস প্রকৃতির এও একটা প্রকৃষ্ট লক্ষণ। আর তখনও আমাদের মধ্যে দৈব আদেশের ব্যাপারটা গজায়নি। কাজেই আমাদের মন আরও নজির খুঁজে নিয়েছিল। যেমন আমাদেরই মত দাস জাতি ইতালি, এই সেদিন মাত্র সিক্রেট সোসাইটী করেই স্বাধীন হয়েছে; রাসিয়া এই করেই কিছু কিছু অধিকার পাচ্ছে এবং পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার আশা করে; চীনও তাই।

এতগুলি নজির দ্বারা যখন সমর্থিত হ'ল, তখন সিক্রেট সোসাইটী করবার মত অবস্থা আমাদের হয়েছিল কি না, এই লজ্জাজনক প্রশ্নটা আর উঠ্‌লই না।

সিক্রেট সোসাইটীর কাজ সুরু হ'ল। আপাতত বন্দুক ছোড়া, ছাতা মাথায় না দিয়ে রোদে জোরে জোরে হাঁটা, যে ঘোড়া হ'তে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই, বরং ঘোড়ারই পতন ও মূর্চ্ছার বিশেষ সম্ভাবনা, এমন ঘোড়ায় চড়্‌তে শেখা। বিশেষ ক'রে কাজ হয়েছিল, সিক্রেট সোসাইটীর সভ্য জুটোন, আর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি যত লোককে পারা যায়, আমরা যে সিক্রেট্ সোসাইটী করেছি, এই কথাটি গোপন রাখ্‌তে বলা। এই ভাবেই কয়েক মাস কেটে গেল।

এই বুয়র যুদ্ধের ব্যাপারটি প্রায় সমস্ত পরাধীন জাতির প্রাণে পরাধীনতার দুঃখ-অনুভূতি অপেক্ষাকৃত তীব্র করেছিল। বহুকাল চুপ-চাপে থেকে হঠাৎ এই ঘটনাটির পর হ'তেই যেন নানা দেশে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধানতালাভের জন্য মারামারি কাটাকাটি লেগে গেছে। আমাদের দেশও বাদ পড়েনি; কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় আমাদের স্বাধীনতা লাভের বাসনা যেন একটু অদ্ভুত রকমের ছিল।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের বাসনা

সে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন বুয়র-যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অনেক চেষ্টায় তিন চারজন সভ্য, আর আন্দাজ সাত কি আটজন অর্দ্ধসভ্য মাত্র যোগাড় হ'ল। আলীপুর জেলে নরেন গোসাইঁর হত্যাকারী সত্যেন্দ্রনাথ বসুও এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর আপন ভাইপো। অনেককে এই গুপ্ত সমিতির ব্যাপার চুপি চুপি "sound" করা হয়েছিল। এই sound শব্দটা একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার

করা হ'ত, অর্থাৎ সুযোগ বুঝে অনেক ভূমিকার পর আসল কথাটি এক রকম হেঁয়ালির ছলে ব'লে শ্রোতার মন পরীক্ষা করা হ'ত। সুবিধা বোধ হলে তবেই খুলে সব কথা বলা হ'ত। অনেকে শুনে বেশ ভয় পেতেন; তখন তাঁদের ভীতু আর নিজেদিগকে বীর মনে ক'রে বড় সুখ পেতাম। বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্‌বার কথা এই যে, এটা অন্যায় ব'লে প্রায় তখন কেউ প্রতিবাদ করেন নি; বরং আশার কথা ব'লে তাঁরা যে মনে কর্‌তেন, তা তাঁদের প্রাজ্ঞজনোচিত সতর্কতার বচনে ধ'রে নিতাম। এ থেকে ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, দেশশুদ্ধ লোক স্বাধীনতালাভের জন্য প্রস্তুত। এই প্রস্তুতের ভাবটা যে তখন কেমন ছিল, এখানে তা একটু খুলে বলি।

দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার জ্বালায় মৃতপ্রায় পুত্র কন্যার গ্রাস, যে ক্ষুধাতুর কেড়ে খায় অথবা নরমাংসদ্বারা যে, ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ কর্‌তে বাধ্য হয়, তারই প্রকৃত ক্ষুধার দুঃখ-অনুভূতি হয়েছে ব'লে যেমন বলা যেতে পারে, পরাধীনতাজনিত দুঃখের তেমন তীব্র অনুভূতি আমাদের দেশে ছিল না, এখনও নেই। দুঃখের অনুভূতি তীব্র হলে সে দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য প্রাণটা তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, প্রাণ দেওয়ার জন্য যে অস্থিরতা আসে, তার একটুও তখন পর্য্যন্ত আমরা অনুভব করি নি। কর্‌বার উপায়ও তখন ছিল না। স্বাধীনতালাভের এক রকম বাহ্যিক বা সখের বাসনামাত্র কারো কারো মনের কোণে হয় ত বা জেগেছিল। আর স্বাধীনতা-সুখের অনুভূতি ত আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। সে সুখের প্রকৃত ধারণা কর্‌বারও প্রবৃত্তি ছিল না। এমন কি পরাধীনতা-মোচনের প্রকৃত যোগ্যতা কাকে বলে, তারও কোন ধারণা কারও ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর তা সংরক্ষণের যোগ্যতা সম্বন্ধে ত তখন কোন চিন্তাই কারও মনে আসে নি। এরূপ অবস্থায় দেশ শুদ্ধ লোককে স্বাধীনতালাভের

জন্য প্রস্তুত ব'লে আমরা সহজে ধ'রে নিতে পেরেছিলাম কেমন ক'রে, তা এখন মনে হ'লে, নিজেদের ওপর ঘৃণার ভাব না এসে পারে না। আর সত্য ব'ল্‌তে কি, নেতাদের ওপরেও করুণার উদ্রেক হয়; কারণ তাঁরা সাঁতার না শিখিয়ে অগাধ জলে ঠেলে ফেলে দেওয়ার মত দুষ্কর্ম্মই করেছিলেন।

স্বাধীনতালাভের বাসনা আমাদের মধ্যে কেমন ক'রে এসেছিল, এখন যেন তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। পরাধীনতা থেকে যে অশেষ প্রকার দুঃখ আসে, তা আমরা কংগ্রেস-নেতৃগণের কৃপায় এক রকম শিখে ফেলেছিলাম ব'লে মনে করতাম। তাতে করে কিন্তু দুঃখানুভূতি জাগে নি; তাই স্বাধীনতার বাসনাও আমাদের ভেতর ঠিকমত জাগে নি। উক্ত নেতৃগণ এই বাসনা জাগান উচিত ব'লেও হয় ত মনে কর্‌তেন না; কারণ, এ দেশ যে কখনও পূর্ণ স্বাধীন হ'তে পারে, এ কথাও হয় ত তাঁরা বিশ্বাস কর্‌তেন না। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বাসনা জাগাবার চেষ্টা কংগ্রেস-নেতৃগণ না কর্‌লেও কংগ্রেসের বহুপূর্ব্বে মহাপুরুষ কবিগণ সমসাময়িক য়ুরোপের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, ভারতে পরাধীনতার দুঃখানুভূতির প্রথম দীর্ঘ নিশ্বাস স্বরূপ যে সকল মর্ম্মস্পর্শী গান ও কবিতা শিখিয়ে গেছেন, তার তুলনা নেই।

যাই হোক, অশেষ প্রকার দুঃখের মধ্যে কেবল একটামাত্র দুঃখ ছাড়া আর কোন দুঃখই আমরা অনুভব করিনা। সেই দুঃখটা হ'তেই আমাদের স্বাধীনতালাভের বাসনা জেগে উঠছে। এই স্বাধীনতা মানে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ।

স্মরণাতীতকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত এ দেশের জনসাধারণ, কত প্রকার পরাধীনতার পীড়নে নিদারুণ ভাবে নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও

পরাধীন ব'লে, সাধারণ ভারতবাসী আমরা কখনও অনুভব করিনি। কিন্তু এই ইংরেজের আমলে দেশের লোকমত, পূর্ব্বে যে একটা দুঃখ অনুভূতির উল্লেখ করেছি, তার খুব পোষক হয়েছে। সেটা হচ্ছে বিদেশীর আরোপিত নিন্দা ও ঘৃণাজনিত দুঃখ। নিন্দার কারণ সবটা সত্য নয় ব'লে অস্বীকার করতে পারি না। আবার নিন্দিতের তুলনায় নিন্দুককে যখন প্রায় সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে বাধ্য হই, তখন এই দুঃখের জ্বালা তীব্র হয়ে ওঠে। তীব্র অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখনিবারণ ইচ্ছা আসাই সঙ্গত। আমাদের কতকটা এসেছিল। সে ইচ্ছা পূরণের প্রধান উপায় দুটি। প্রথম নিন্দার যথাযথ কারণগুলি দূর করা। সে কায কতকটা স্থির ও দৃঢ়ভাবে সুরু হয়েছিল, রাজা রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রভৃতির দ্বারা। তার পর রক্ষণশীলতা ও ভূতপ্রীতির প্রভাবগ্রস্ত লোকমত এই চেষ্টাকে বিধর্ম্মী, বিদেশীর অনুকরণ—কাযেই আত্মসম্মান-হানিকর ব'লে অপবাদ দিলে। ঠিক সেই সময় কয়েকজন মৎলবী প্রাচ্য-প্রেমাতুর-পাশ্চাত্যবাসীর অনুমোদন ও সাহায্য পেয়ে এই অনুকরণাতঙ্ক ভীষণ হয়ে উঠল। এই প্রতিক্রিয়া নিন্দার কারণ দূর করবার সেই প্রথম চেষ্টাকে ব্যর্থপ্রায় করেছিল।

তখন উক্ত দুঃখনিবারণের দ্বিতীয় সহজ উপায়টী অবলম্বিত হ'ল। সেটি হচ্ছে বিদেশীরা যা নিয়ে গৌরব করে, তা ঘৃণা করা, আর তারা আমাদের যা কিছুর নিন্দা করে, তাতে লজ্জাবোধ না ক'রে তা সগৌরবে জড়িয়ে ধরা। বিদেশীর যা কিছু তা ছোট ক'রে, নিজেদের যা কিছু সে সমস্ত তাদের চেয়ে ভাল, এই সত্য প্রমাণ করবার জন্য দেশের আশাস্থল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতের মস্তিষ্কশক্তি ব্যয়িত হ'তে লাগল। দেশীয় সাহিত্য এই সত্য প্রমাণ করতে গিয়ে পুষ্ট হয়ে উঠল।

শত শত বিদেশীর মধ্যে দু একজন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজ জাতির

কোন কিছুর নিন্দা করে; আর দু' এক জন ব্যবসায়ী প্রাচ্য-প্রেমিক (Professional orientalist) হয় ত কোন মৎলবে ভারতের অল্প-বিস্তর সুখ্যাতি করে। যখন উক্ত সত্য প্রমাণ জন্য তাদের সাক্ষ্য অকাট্য ব'লে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করি, তখন তাদের মৎলব সম্বন্ধে ভেবে দেখ্‌বার কথা আমাদের মনে আসে না।

এই প্রকারে ইলবার্ট বিল পাশের সময় হ'তে ইংরেজ-বিদ্বেষ অপেক্ষাকৃত প্রবল হ'তে আরম্ভ করে। কংগ্রেস সেই বিদ্বেষবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকে। অবশেষে এই বিদ্বেষই স্বদেশপ্রীতি নামে অভিহিত হ'তে লাগ্‌ল। কালে ইংরেজ-বিদ্বেষের ফলে, ইংরেজ-শত্রু বুয়রদের প্রতি আমাদের সহানুভূতির আধিক্য; তার ফলে তাদের অবলম্বিত উদ্দেশ্যের অনুকরণ অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের বাসনা এল। সেই বাসনা পূরণের জন্য তাদের অবলম্বিত অনেক উপায়ের মধ্যে মাত্র একটি উপায়ের অনুকরণ, অর্থাৎ সিক্রেট সোসাইটীর এ দেশে উদ্বোধন হ'ল।

সফলতার যুক্তি ছিল এই যে, মাত্র কয়েক লক্ষ অশিক্ষিত বুয়র যদি এতবড় ইংরেজ জাতিকে হটিয়ে দিতে পারে, তবে বত্রিশ কোটি আমরা আর এই কটা ইংরেজকে পারি না! পন্থা ত বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠেই' দেখিয়ে দিয়েছেন; বাঙ্গালী মেয়েমানুষ, যাকে লোকে অবলা বলে, শান্তি তাদেরই একজন হয়েও সে ইংরেজ কাপ্তেনের হাত থেকে হেলায় যখন রাইফেল্‌টা কেড়ে নিতে পেরেছিল এবং তাকে কদলীপ্রেমসর্ব্বস্ব জেনে, ঘৃণাভরে যখন রাইফেল্‌টা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, তখন আমরা বাংলার পুরুষ, না পারি কি! শুধু শান্তি কেন, বঙ্কিমবাবুর আরও অনেক অবলা এমন করেছে। এর পরে সফলতা সম্বন্ধে কি আর সন্দেহ আস্‌তে পারে!

ভারতবাসীর স্বাধীনতা বল্‌তে যে জিনিষটি বোঝায়, সে হিসেবে

আমাদের এই বাসনাকে স্বাধীনতালাভের বাসনা না ব'লে বিদেশীর আরোপিত ঘৃণা, নিন্দা ও অপমান হ'তে কোন প্রকারে মুক্তিলাভের বাসনা বলা যেতে পারে। সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা ইংরেজ যদি আজ এই ঘৃণা, নিন্দা ও অপমানের তীব্র জ্বালা কোন প্রকারে জুড়িয়ে দিতে পারত, তবে ফরাসীর অধীন দেশগুলির মত আজও হয় ত আমাদের মধ্যে এই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতালাভের তথাকথিত বাসনাটুকুও জাগৃত না। হয় ত এই জন্যই যে অনেক সাদা হৃৎপিণ্ডে প্রাচ্য প্রেম উথলে ওঠে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

স্বদেশ প্রেম জাগাবার সোজা উপায়

১৯০২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এক দিন 'অ'-বাবুর কাছে শুনলাম, 'ক'-বাবু বাংলা দেশে সিক্রেট সোসাইটী স্থাপনের চেষ্টা করছেন। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র সিক্রেট সোসাইটী হয়ে গেছে। কলকাতার অনেক বড় বড় লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এ রকম অনেক আজগুবি খবর শুনে ধন্য হয়ে গেলাম।

দিন কতক পরে এক দিন 'ক'-বাবুর একজন ভীমাকৃতি সহকারী এসে হাজির হলেন। এঁকে 'খ'-বাবু ব'লে উল্লেখ করব। তাঁর জিহ্বাখানি তাঁর ভীম-বিনিন্দিত দেহখানির তুলনায় বেজায় লম্বা। তিনি যা বল্লেন, তার প্রায় সবই অসম্ভব আজগুবি। তিনি যা আওড়েছিলেন, তার সার মর্ম্ম যা মনে পড়ল, তাই লিখ্ছি। সমস্ত ভারত ইংরেজ তাড়াবার জন্য তয়ের। করদ রাজ্যগুলি এবং প্রত্যেক প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলওয়ার সানাচ্ছে। এমন কি, নাগা, গারো, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদেরও হাজার হাজার লোক পাঁয়তাড়া দিচ্ছে; খালি বাংলা প্রদেশ তয়ের নয় ব'লে আটকে বসে আছে। সেই জন্যই তাঁকে দূত-

স্বরূপ 'ক'-বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক বছরের মধ্যেই বাংলা দেশকে তয়ের ক'রে ফেল্‌তেই হবে। কামান, বন্দুক প্রভৃতি হাতিয়ারের ভাবনা একটুও নেই। জেনারেল কাপ্তেনও তয়ের, কিন্তু বাঙ্গালী কমাণ্ডার ও কাপ্তেন ত চাই। যে আগে যোগ দেবে, তাকেই এই সব পদগুলি দেওয়া হবে।

এ রকম কত আজগুবি গল্প ঝেড়ে ছিলেন; তা হুবহু দিতে পারলাম না, এই দুঃখ। কিন্তু ভারি মজার কথা এই যে, এ হেন বচনও সত্য ব'লে হজম ক'রে ফেলেছিলাম।

সিক্রেট সোসাইটীর উদ্দেশ্য, কার্য্য-প্রণালী ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমরা যা আগে স্থির করেছিলাম, তা থেকে অনেক নতুন জিনিস এঁর কাছে পেলাম। যেমন লাঠি ও তলওয়ার ঘুরোন, কুস্তি, বক্‌সিং ইত্যাদি শেখা। আর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হ'তে হ'লে তলওয়ার সাক্ষ্য ক'রে গীতা ছুঁয়ে দীক্ষা নেওয়া। ক্ষমতা-প্রাপ্ত দীক্ষিত-গুরু ব্যতীত অন্য কেউ দীক্ষা দিতে পারত না। দীক্ষার মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছিল। পরীক্ষার পর দীক্ষা দেওয়া হ'ত। এর আগে আমাদের কোন মন্ত্র ছিল না, ধর্ম্ম কিংবা ভগবানের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ ছিল না।

অধীনতা জনিত কুফলের ইনি যে সকল হিসেব দিলেন, তা কংগ্রেস-নেতৃগণের তালিকার অতিরিক্ত কিছু বলেছিলেন ব'লে মনে পড়ে না। যেমন একত্রে বিচার ও শাসন বিভাগ, নুণের ট্যাক্‌স্, ইন্‌কম্ ট্যাক্‌স্, হোম চার্জ্জ, বিলেতে আই, সি, এস্ পরীক্ষা, উচ্চ-রাজকর্ম্মচারীর পদগুলি ইংরেজের অধিকৃত, শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি, দেশের দারিদ্রবৃদ্ধি, দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর প্রকোপবৃদ্ধি, অস্ত্র-আইন, প্রেস্ এক্ট্ ইত্যাদি।

ইলবার্ট বিলের সময় হ'তে কংগ্রেসের এ সকল আন্দোলন দ্বারা মাত্র

এক ভাগ শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজ শাসনের ওপর ক্রমে অবিশ্বাস জন্মেছিল। আধ্যাত্মিক পুণ্য-সঞ্চয় কর্‌বার জন্য যে ইংরেজ ভারত শাসন কর্‌তে আসে নি, এই বিশ্বাস শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের মনে দৃঢ়ভাবে জাগিয়ে দেওয়াই কংগ্রেসের সার্থকতা।

কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত লোকেদের মনেও ইংরেজের ওপর এই অবিশ্বাস বিস্তৃতি লাভ করবার আরও অনেক কারণ ঘটেছিল। পুলিসের অত্যাচার (বিশেষতঃ গ্রাম্য পুলিসের অত্যাচার) এখন অপেক্ষা পূর্ব্বে অনেক অধিক থাক্‌লেও অথবা যথেচ্ছাচারী রাজা, জমিদার, কাজী প্রভৃতির অমানুষিক অন্যায় অবিচার সেকালের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হলেও অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ তখন জাগত্‌ না। দেশের সাধারণ লোক কিন্তু, আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব আদান-প্রদানের ফলে অন্যায় অত্যাচার যে অসহ্য ব'লে মনে করা উচিত এবং সে জন্য যে চীৎকার করা উচিত, তা শিখ্‌ছে। অত্যাচারীকে তখনকার মত ভয় ও ভক্তির দৃষ্টিতে না দেখে, ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখ্‌তে না পার্‌লে, লোকে কি বল্‌বে ব'লে, মনে কর্‌তেও শিখ্‌ছে।

কয়েক বছর পূর্ব্বে বোম্বেতে প্লেগের আমদানী হয়েছিল; অনেক অশিক্ষিত লোকের ধারণা হয়েছিল যে, ইংরেজই অকর্ম্মণ্য দেশী কালা লোকগুলোকে এদেশ থেকে চিরশান্তির দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এরকম মহামারী রোগ এ দেশে আমদানী করেছে। কুঁয়োতে রোগের বীজ ঢেলে দেয়, আর ঐ রোগের লক্ষণ বা যে কোন জ্বর দেখা দিলেই প্লেগে আক্রান্ত ব'লে, রোগী এবং রোগীর বাড়ী শুদ্ধ লোককে টেনে নিয়ে গিয়ে সিগ্রিগেশন ক্যাম্পে মেরে ফেলে। এই ব্যাপারে বোম্বেতে বিখ্যাত চাপেকার ভ্রাতারা মিঃ র‍্যাণ্ড নামক ডাক্তারকে গুলী করে। এই প্লেগের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনো-খুনী হয়েছিল।

কলকাতায় প্লেগের প্রথম আমদানীতেও ভীষণ কাণ্ড বেধেছিল। এর কিছু পূর্ব্বে টালার মসজিদ ভাঙ্গার দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। তারপর নোয়াখালীর জজ মিঃ পেনেলের রায় নিয়ে যে বিশ্রী ঘটনা ঘটে, তাতে দেশে হুলুস্থুল পড়ে গেছ্‌ল।

হিন্দু ও মুসলমান আমলের বিচার-পদ্ধতির তুলনায় ইংরেজের বিচারও আইন যে অনেক অধিক ন্যায়সঙ্গত, তা সাধারণ লোক আগে উপলব্ধি কর্‌ত। তাই ইংরেজকে ভক্তি কর্‌ত। পরে কিন্তু উক্ত ঘটনাগুলি বাংলা দেশের সাধারণ লোকের মনে ইংরেজের ওপর অবিশ্বাসের ও বিদ্বেষের বীজ ক্রমে দৃঢ়ভাবে রোপণ করে। উক্ত 'খ' বাবু সিক্রেট্‌ সোসাইটীর নতুন সভ্য জোটাবার, যে সকল কৌশল আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আমার মনে হয়, সে সমস্তই এই প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষকে জাগিয়ে ইংরেজের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

'ক'-বাবু এসে আমাদের দীক্ষা স্বয়ং দেবেন, এই আশা দিয়ে 'খ'-বাবু ফিরে গেলেন।

মিথ্যাই হোক্ আর বুজরুকীই হোক্, এই প্রকারে তিনি আমাদের মধ্যে একটা অতি প্রবল উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়ে ছিলেন। তখনকার ভাব আমার বেশ মনে আছে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ থেকে ইংরেজ চ'লে যাবে; দেশ একদম স্বাধীন হবে; নিজেদের রাজা হবে, তারপর স্বাধীন ভারতে স্বাধীন দেশবাসীর সাম্‌নে আমরা এক একটা দেশ উদ্ধার-কারী ব'লে পূজ্য হব। (গীতার নিষ্কামভাব তখনও আমাদের মধ্যে আসে নি।) এইটাই তখন জলজ্যান্ত সত্য ব'লে যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। ওর মধ্যে যে কোথাও একটুও ফাঁকি ছিল, তা স্বপ্নেও তখন দেখ্‌তে পাই নি।

আর এখন? তখন থেকে প্রায় বিশ বছর (১৯০২—১৯২৩)

কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে দুনিয়ার কত না পরিবর্ত্তন হয়ে গেল; চিন্তা, ভাব, আদর্শ, কার্য্য-প্রণালী, সব উল্টে-পাল্টে কত রূপ নিয়ে কত প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু হায়! এই বিশ বছরে ভারতের চিন্তায় তেমনই অলসতা, ভাবে তেমনই কুজ্ঝটিকা, আদর্শে তেমনই প্রহেলিকা, আর কাযে তেমনই প্রহসনের কত লীলাই না প্রকটিত হচ্ছে। অন্যে দেখে, নয় হাতে কাযে ক'রে, নয় ত ঠকে শিখ্‌ছে; আর আমরা, দেখে, হাতে কাযে ক'রে বারবার ঠকে কেবল ঠক্‌তেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই ছোট বড় সকল কাযেই দিন দুবেলা ঠক্‌ছি; তবু ভুলেও কখন এ প্রশ্নটা মনে আসে না যে কেন ঠক্‌ছি? তাইতে ত আজও হাতে চাঁদ পাবার নিশ্চিত আশায় মুগ্ধনেত্রে দিদিমা'র কোলে শুয়ে শুন্‌ছি—"আয় আয় চাঁদ আয়, আয় আয় আ'রে; মণির কপালে মোর টিপ্‌ দিয়ে যা রে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীক্ষাগুরু ও দীক্ষা।

আমাদের মধ্যে যেটুকু কর্ম্মপ্রবণতা জেগে উঠেছিল,—যা এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব, তা ঠিক পথে চালাতে হ'লে, গন্তব্যটা যে কি, আমাদের সকলের তার অল্পবিস্তর ধারণা আগে করা উচিত ছিল। তার পর তাতে পৌঁছবার পথটা ধোঁয়া, জ্যোছনা, ঘ্যানর ঘ্যানর বা আর কিছু, তা স্থির করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হ'ত। তখন সেই নির্ব্বাচিত পথটাকে চলনসই কর্‌তে না জানি কত অসাধ্য সাধন কর্‌তে হ'ত! কিন্তু আমরা অলসতাকে শান্তি নামে অভিহিত ক'রে সেই শান্তির জন্য কাঁদুনী এমনি অভ্যাস ক'রে ফেলেছি যে, এত হাঙ্গামাতে না গিয়ে, ঐ প্রকার শ্রমসাধ্য কাযে এমন একটী লোক পেতে চেয়েছিলাম, যিনি আমাদের কর্ত্তব্য বাৎলে দেবেন, আর আমরা গীতার ভাবে, ফলাফল বিচার না ক'রে, চক্ষু বুজে আদেশ পালন ক'রে যাব। তাই ধর্ম্ম, সমাজ, শাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ে আমরা এই প্রকারের একটীকে ধ'রে নিয়ে তাকে গুরুগিরিতে বরণ করি।

অন্য সকল দেশেও ঐ সকল ব্যাপারে এক এক জন গুরু বা নেতা অবশ্য থাকেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের ঐ প্রকার ব্যক্তিকে নেতা বা যে কোন নামে অভিহিত করা হো'ক্ না কেন, তিনি আমাদের এই গুরু হ'তে প্রায়ই ভিন্ন প্রকৃতির। সে সকল দেশে তিনি যে বিষয়ের নেতা বলে গৃহীত হন, সেই বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাধ্যমত নিজে অভিজ্ঞ হ'তে চেষ্টা করেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথানুসরণকারীদেরও সে বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ কর্‌বার জন্য নানা রকমে চেষ্টা না ক'রে পারেন না।

আমাদের 'অ'বাবু নিজে পড়ে-শুনে জ্ঞান লাভ করে তাঁর অনুগামী-দিগকে জ্ঞান দেবার চেষ্টা ক'র্‌তেন। কিন্তু আমাদের মন জ্ঞানসঞ্চয় কর্‌বার অতটুকু খাটুনি খাট্‌তেও চাইত না। তাতে আবার তাঁর শিক্ষার প্রণালীটা ছিল মাষ্টারী ধরণের। তাই তাঁর গুরুগিরিতে আমাদের মন বুঝি উঠ্‌ল না। নতুন দীক্ষাগুরুর নামে আমাদের মন নেচে উঠল।

পরে পরে অনেক রকমের অনেক নেতার সঙ্গে পাঠককে পরিচিত হ'তে হবে। তাই এখানে নেতার রকম নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা কর্‌ব।

আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীতে এমন সব গুরু জোটেন যে, আমরা যে বিষয়ের গুরু চাই, সে বিষয়ের জ্ঞান তাঁর আছে কি না, আমরা তা বড় একটা দেখ্‌তে চাই না। আমরা কেবল দেখতে চাই, তাঁর কোন অলৌকিক শক্তি আছে কি না; অবতারের লক্ষণ তাঁতে প্রকটিত কি না; সর্ব্বোপরি তাঁর সাত্ত্বিকতার কায়দা দোরস্ত আছে কি না। যদি থাকে, কেবল তা হ'লেই তিনি যে কোন বিষয়ে এমন কি রাজ-নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও নেতা বা গুরু হওয়ার শ্রেষ্ঠতম অধিকারী ব'লে মনে করে নিই। কাজেই তিনি যে বিষয়ের পথিপ্রদর্শক হন, সে বিষয়ে ক্রমে অধিক অভিজ্ঞতালাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তার ফলে তিনি সে বিষয় কোন কিছু বল্‌তে গিয়ে যখন প্রলাপ বক্‌তে থাকেন—তখন আমরা তার তরবেতর ব্যাখ্যা ক'রে ধোঁয়ার সৃষ্টি ক'রে থাকি। আমাদের ক-বাবু তখনও কিন্তু এ রকমের ধোঁয়ার গুরু হন নি।

সমাজের অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়েই নেতা বা গুরু গঠিত হয়ে থাকেন। যাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠার বা লোকপূজা পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

চরিতার্থের জন্য, লোকমতের আবদারকে খুব ফেনাতে পারেন অথবা সমাজের দুর্ব্বলতার সুবিধামত তোয়াজ করতে পারেন, তাঁরাই নেতা ব'লে সাধারণতঃ গৃহীত হন। এই প্রকার লীলাময় নেতারই এ দেশে বিশেষ পূজা, তাঁদেরই বিশেষ আধিক্য। ক-বাবু তখনও এ ধরণের নেতা হতে পারেন নি।

ভাবের নেতারা সমাজের দুরবস্থাজনিত দুঃখ অনুভূতির ফলে সেই দুঃখ দূর করবার উদ্দেশ্যে সুদূর ভবিষ্যতে সর্ব্ববিধ বিপ্লব আনবার জন্য সেই সমাজের চিন্তার ধারা বদলে নতুন ভাবের প্রবর্ত্তন করেন। এ দেশে এই রকম নেতারই সম্ভ আবশ্যক। 'ক'-বাবু এ রকম নেতাও ছিলেন না।

এই প্রকারে নবভাব প্রবর্ত্তনের ফলে অথবা অন্য কারণে দেশে যখন অদম্য কর্ম্ম-প্রবণতা জাগতে সুরু হয়, তখন তা প্রত্যক্ষ করবার ও তা সুপথে চালাবার প্রকৃত শক্তি যদি কারও থাকে, তবে তিনিই কর্ম্মের নেতা হন। এ দেশে এ রকম নেতা এখনও জন্মেন নি।

আর এক প্রকার নেতা দেখতে পাওয়া যায়, যাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, আত্ম-সম্মান, অথবা কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের আশা, যখন কোন প্রবল শক্তির আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়, তখন তাঁদের কেউ বা বৈরাগ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকেন—আর কেউ বা প্রতিহিংসার তাড়নায় উক্ত আঘাতকারী শক্তির উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। আর ঠিক সেই সময় যদি এই আঘাতকারী শক্তির বিরুদ্ধে সমাজের বিদ্বেষ কোন কারণে স্ফূরণোন্মুখ হয়ে থাকে, তবে ত সোনায়-সোহাগা হয়ে যায়। তিনি নেতৃত্বের সিংহাসন দখল ক'রে বসেন। এই প্রকারের নেতারা জগতে অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন ও করছেন। যদিও এই নেতাদের স্বদেশ-হিতৈষণা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাজাত, তথাপি এর প্রভাব অতীব

তীব্র ও নিরতিশয় ক্ষিপ্র। এমন কি, প্রতিহিংসার তাড়না সময় অসময়ের এবং সুযোগ সুবিধার প্রতীক্ষা করতে, অথবা তা সৃজনের তর সইতে দেয় না। কামড় দেওয়াটাই তার প্রথম ও প্রধান কায হয়ে পড়ে।

এই অহিংস যুগে বোধ হয় প্রতিহিংসা কথাটা অনেকের ভাল লাগবে না। তাঁদের জন্য লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণ না কি নিষ্কাম ধর্ম্মে, নিজের বহু যত্নে দীক্ষিত প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি জাগিয়ে, বীর জয়দ্রথ ও গুরু দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতিকে হত্যা করাতে পেরেছিলেন ব'লেই কুরুক্ষেত্রে এইরূপে জিত যুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ নামে আজও পূজ্য। পুরাণের উপাখ্যান ছেড়ে দিলেও জগতের ইতিহাসে এই জাতীয় মহাবীরের কীর্ত্তি অক্ষয় হয়ে আছে। তা ছাড়া আজকালকার এই অহিংসা-কাণ্ডের মূলেই যে প্রতিহিংসার প্রেরণা নেই, এ কথা কি কেউ বলতে পারেন?

এখন ভেবে দেখছি, আমাদের দীক্ষাদাতা 'ক'-বাবু তখন এই প্রকারের নেতাই ছিলেন। 'অ' বাবু তাঁকে বাল্যকাল হতে জানতেন। তাঁর কাছেই 'ক'-বাবুর এই পরিচয় তখন পেয়েছিলাম যে, তিনি এক জন অসাধারণ বিদ্বান্ ও জ্ঞানী; পলিটিক্সে তিনি বিশেষজ্ঞ। এ থেকে আমরা নিশ্চয় ক'রে বুঝে ফেলেছিলাম যে, আমাদের আর কোন বিষয়ে মাথা-ব্যথা করতে হবে না; খালি আদেশ পালন করলেই—বস্।

এক দিন বিকেলে দেখলাম, 'অ' বাবু তাঁকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে ছিলেন আমাদের স্বনামধন্য বারীণ দা। গুরুর প্রতি ভক্তি ত আগে থেকেই পুরোমাত্রায় গজিয়েছিল। অধিকন্তু আমার (মেদিনীপুরের) বাড়ীতে তাঁর অযাচিত শুভাগমনটাই আমার কাছে একটা মস্ত জিনিষ। তিনি বড় লোক না হ'লে আমার বাড়ীতে

তাঁর আসা ব্যাপারটা যে বড় হয় না! আর এত লোক থাক্তে, খুঁজে খুঁজে তিনি আমার বাড়ীতে এসেছিলেন, কেন না, তিনি আমার দেশ উদ্ধারের এক জন যোগ্য-পুরুষ ব'লে মনে করেছিলেন। এই রকম প্রাণমাতান চিন্তা আমার আত্ম গরিমাকে এমনই উস্কে দিয়েছিল যে, যদিও ভক্তি ব'লে জিনিষটা আমার মধ্যে অল্পই ছিল, তবু তাঁর সম্বন্ধে তখন আর কিছু না জেনেই, প্রথম দর্শনে আমার সমস্ত ভক্তিটুকু তাঁর ওপর নিংড়ে দিয়েছিলাম।

সত্যেন ও আরও দু' এক জন এসে জুটলে, আমরা আমাদের চাঁদমারী অর্থাৎ বন্দুক ছোড়া শেখ্‌বার স্থানে সকলে মিলে গেলাম। সম্বন্ধে, বারীণ সত্যেনের ভাগিনেয়। মাঠের মাঝে এক স্থানে কাঁকর খুঁড়ে নেয়াতে একটা প্রশস্ত গর্ত্ত হয়েছিল। তার মধ্যে বন্দুক আওয়াজ কর্‌লে বাইর থেকে বড় একটা শোনা যেত না। আমরা সেখানে নেমে গিয়ে প্রত্যেকে এক একটি আওয়াজ কর্‌লাম। 'ক'-বাবু ও বারীণের বন্দুক ধর্‌বার কায়দা ও তাক্ দেখে তখন মনে হয়েছিল—তাঁদের সেই প্রথম হাতে খড়ি।

'ক'-বাবু বিশেষ ক'রে 'অ'-বাবুর সঙ্গেই কথা বল্‌ছিলেন। তার বিশেষ কিছু মনে নেই। দেশটা কেমন ক'রে জয়ের কর্‌তে হবে, তার একটা প্ল্যান বা মতলব তখন দিয়েছিলেন কি পরে দিয়েছিলেন, এখন তা ঠিক মনে হচ্ছে না। দু-এক কথায় বল্‌তে গেলে সে মতলবটা এই ছিল যে, বাংলা দেশকে ছ'টি কেন্দ্রে ভাগ কর্‌তে হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে উপকেন্দ্র থাক্‌বে। মেদিনীপুরে ত একটি কেন্দ্র ছিলই। এক বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার সাহেবের বহুকালের যদিও একটা গুপ্ত আখ্‌ড়া কলকাতায় ছিল, তবু পৃথক ক'রে কল্‌কাতার প্রধান কেন্দ্র কিন্তু

তখনও খোলা হয়নি। তখন কল্‌কাতায় নাকি অনেক হুমরো চুমরো, 'ক'-বাবুর সঙ্গে জুটেছেন, আর কেন্দ্র খুলবার চেষ্টা হচ্ছে।

দীক্ষার মন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হ'লে আবার এসে দীক্ষা দেবেন, এই আশা দিয়ে 'ক'-বাবু পরদিন কলকাতা চ'লে গেলেন।

আবার মাস কতক পরে অর্থাৎ ১৯০২ সালের বোধ হয় শেষে 'ক'-বাবু একা এসেছিলেন। দীক্ষা নেয়ার জন্য আমরা অনেককে ভজিয়েছিলাম। ফলে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা জন চারেক মাত্র এসে জুটেছিলাম। দীক্ষা সম্বন্ধে 'অ'-বাবুর সঙ্গে আলাপ চল্‌তে লাগল। সংস্কৃতে রচিত মন্ত্র, সকল দীক্ষার্থীর বোধগম্য হবে না, তাই বাংলাতে রচিত হওয়া উচিত ব'লে 'অ'-বাবু আপত্তি করেছিলেন। তার পর 'অ'-বাবু মন্ত্রটি বাংলা ক'রে আমাদের শুনিয়ে দিলেন। শুনে আমাদের মধ্যে এক জন 'এই আস্‌ছি' ব'লে সরে পড়েছিলেন।

এর পরেও যখন আমরা নিজেরা দীক্ষা দিতে গিয়েছি, তখন অনেকে প্রথমে খুব আগ্রহ দেখিয়ে শেষে দীক্ষার সময় গা-ঢাকা দিয়েছেন। কেন তাঁরা স'রে পড়তেন, দীক্ষার পূর্ব্বে আমাদের মনের ভাব কেমন হ'ত, তা ভেবে দেখলে, আশা করি, পাঠক তার কারণ সম্যক্ বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

দীক্ষা-গ্রহণের অনেক দিন আগে থেকে, এর ভীষণ দায়িত্ব সম্বন্ধে ভালমন্দ অনেক রকম চিন্তা, আপনা আপনি মনটা দখল্ ক'রে বস্‌ত। ভালর দিক্‌টার আভাস পূর্ব্বেই দিয়েছি, এখন মন্দের কথাই বলি। সোসাইটীর তরফ থেকে যখন যা আদেশ আস্‌বে, তা পালন কর্‌তেই হবে; নচেৎ মৃত্যু-দণ্ড। বিনা উত্তেজনায় জ্যান্ত মানুষ খুন কর্‌তে হবে; খুনো-খুনী ব্যাপারের মধ্য দিয়ে ডাকাতি কর্‌তে হবে, জাল, জুয়াচুরি, চুরিও দরকার হ'লে কর্‌তে হবে; ধরা পড়লে ফাঁসি, দ্বীপান্তর

অথবা সাধারণ অপরাধীর মত দীর্ঘ কারাবাস। দেশের কাযে সর্ব্বস্ব পণ কর্‌তে হবে, তার মানে সম্পত্তি টাকা-কড়িতে আর নিজের অধিকার থাক্‌বে না; প্রয়োজন হলে অকাতরে তা' দেশের কাযে দিতে হবে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রাণের বন্ধুর কাছে বিদায় না নিয়ে, এক দিন হয় ত, চিরকালের তরে হঠাৎ সরে পড়্‌তে হবে; দরকার হলে আত্ম-সম্মানেও জলাঞ্জলি দিতে হবে। তার পর বিবেকের বিরুদ্ধে কায কর্‌তে হবে ভাবলে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ত; পরক্ষণে কিন্তু সুবোধ মন বু'ঝে ফেল্‌ত, দেশের মঙ্গলের জন্য কায কখনও বিবেক-বিরুদ্ধ হ'তে পারে না। যখন ভাবনা আস্‌ত—এই কীর্ত্তির কথা কেউ জান্‌বে না, শুন্‌বে না, চির অজ্ঞাত থেকে যাবে, অথচ গ্রেপ্তারের ভয়ে (ইঙ্গিতেও) কাউকে বলা চল্‌বে না— তখনই মনটা একবারে মুস্‌ড়ে যেত। নিষ্কাম কর্ম্মের বা নিঃস্বার্থপরতার দোহাই দিয়ে অবোধ মন সুবোধ হয়ে যেত। তার পর কোন স্নেহের বস্তুকে কোন দিন হঠাৎ ত্যাগ কর্‌তে হবে, এই চিন্তা যখন মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলত, তখন সবই অন্ধকার দেখ্‌তে হ'ত।

এটা নিশ্চয় যে, সকলের এ রকম চিন্তা আস্‌ত না। আবার অনেকের এর চেয়ে আরও অধিক মর্ম্মান্তিক চিন্তা যে আস্‌ত না, এমনও বলা যায় না। যাই হোক, এহেন চিন্তার পর কারো দীক্ষার ভয়ে স'রে পড়াটা নেহাৎ দোষের কিনা, তা বল্‌তে পারি না।

পরে কিন্তু নিজে দেখেছি এবং অনেকের নিকট জেনেছি, সিক্রেট সোসাইটীর কাযে আত্ম-সমর্পণ কর্‌বার আগে ঐ প্রকার চিন্তার পরিবর্ত্তে, এ কাযের সিদ্ধি হাতের কাছে ভেবে, কেবল ভাবী গৌরবের আশায় এ কাযে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের সংখ্যাই অত্যন্ত [illegible]ধিক ছিল।

আবার মন্দচিন্তা অনেকের মনে 'যাব কি যাব না'র উভয় সঙ্কট

এনেছিল। এ ক্ষেত্রে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁরা ভালমন্দ ভগবানে অর্পণ ক'রে নাকি নিশ্চিন্ত মনে দীক্ষা নিতে পেরেছিলেন, এমনও শুনেছি।

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমার দীক্ষা আরম্ভ হ'ল। আমি তলওয়ার ও গীতা হাতে নিলাম। সেই সংস্কৃত মন্ত্র অর্থাৎ "সত্যপাঠ" পড়বার হুকুম হ'ল। সংস্কৃত লেখাটি না প'ড়ে, আমি যা বলেছিলাম, যতদুর মনে পড়ে, তা হচ্ছে "ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব করব।" 'ক'-বাবু কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে যা বলেছিলাম, তাতে বুঝি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমায় সংস্কৃত মন্ত্র পাঠের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

দীক্ষার স্বার্থকতা সম্বন্ধে তখন কিন্তু আমার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। পরে যখন নিজে বিবেক-বিরুদ্ধ কায করতে বাধ্য হয়েছিলাম, তখনই এর সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলাম। ঐ বিবেক-বিরুদ্ধ কাযের কথা যথাস্থানে পরে বলব, এখন দীক্ষার সার্থকতার বিষয় কিছু না বলে দীক্ষার কথা শেষ করতে পারি না।

আমাদের পরিবর্ত্তনশীল মনে, আজ যা কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করি, ভীরুতা বা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অথবা জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি বশতঃ আমাদের কাছে পরে তা অকর্ত্তব্য হয়ে পড়ে; কিম্বা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্যের সন্ধান পেয়ে তা সাধনের জন্য পূর্ব্ব-কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে করি। এইটে বিচার-শক্তি-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ উদ্ধারের ব্যাপার—বিশেষতঃ আমাদের দেশের উদ্ধারের কায এমনই বিপদ-সঙ্কুল ও ভীষণ যে, এই সিক্রেট সোসাইটীর বীভৎস কায গুলোকে একবার কর্ত্তব্য ব'লে স্থির ক'রে নেয়ার পর, সঙ্কট এসে পড়লে বিবেকের দোহাই দিয়ে কথায় কথায় তা অকর্ত্তব্য ব'লে ত্যাগ করার

সম্ভাবনা খুবই অধিক। তখন অন্য কিছুকে শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করা ও পূর্ব্ব কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে পড়ে।

সঙ্কট-কালে কর্ত্তব্যত্যাগের এই পন্থাটি বঙ্কিমবাবু আমাদের জন্য প্রশস্ত ক'রে রেখে গেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে, ভবানী পাঠক ইংরেজের হাতে ধরা পড়া নিশ্চিত জেনে "My mission is over" বল্‌তে বাধ্য হয়েছিল। দেবী (ওরফে) প্রফুল্ল, ধরা প'ড়েও কোন গতিকে রক্ষা পেয়ে, যখন দেখ্‌ল, এত সাধনার দেবীগিরির কর্ত্তব্যপালন আর তেমন সুখকর নয়, তখন তা ত্যাগ ক'রে, শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণের ছুতোয়, স্বামীসেবা-ধর্ম্ম-পালনরূপ শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ব্রজেশ্বরের দুটি শাকের আঁটির ওপর আর একটি বোঝা হ'তে গিয়েছিল। 'আনন্দ মঠের' সত্যানন্দও প্রায় ভবানী পাঠকের মতই করেছিল। আর জীবানন্দ এক আত্ম-প্রতারণার অবতারণা দ্বারা দীক্ষার সর্ত্ত লঙ্ঘন ক'রে, ধর্ম্মসাধনার অছিলায় শান্তির আঁচল-ধরারূপ শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যপালনের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য নভেলে এবং বাংলার অন্য লেখকদের উপন্যাসে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ চরিত্র যখনই প্রেমের টানে বা অন্য কোন মুস্কিলে পড়েছে, তখনই কর্ত্তব্য ত্যাগ করেছে। তার পর তাদের কেউ বা অছিলা-রূপে ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে আমাদের অনুকরণীয় চরিত্ররূপে বিরাজ কর্‌ছে। বাংলা নভেলের এই সকল আদর্শ-চরিত্রের অনুকরণে, আমাদের চরিত্র গঠিত ব'লেই বুঝি অতিবৃহৎ নেতা থেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবকদের অধিকাংশ, কর্ত্তব্য ও অন্য কিছুর উভয় সঙ্কটে পড়লেই তাদের কর্ত্তব্য উল্‌টে পাল্‌টে ধোঁয়া হয়ে যায়।

এই সকল কারণে জীবদ্দশায় যাতে শপথ-দ্বারা গৃহীত এই কর্ত্তব্য ত্যাগ ক'রে অন্য কর্ত্তব্য শ্রেষ্ঠতর ও অবশ্য-পালনীয় জেনেও তা গ্রহণ কর্‌তে না

পারে, সেই জন্যই প্রত্যেক সভ্যকে সিক্রেট সোসাইটীর উদ্দেশ্য-সাধনরূপ কর্ত্তব্যপালনে দীক্ষা দিয়ে এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হ'ত ; আর এই ব্রত-ত্যাগের পরিণাম ছিল মৃত্যু-দণ্ড। কার্য্যতঃ এই দণ্ডের ভয় দেখান হ'ত।

দীক্ষাদাতা গুরু নিজে যদি এই ব্রত লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁর কি দণ্ডের ব্যবস্থা হবে বা কে ব্যবস্থা করবে, এ কথা দুর্ভাগ্য বশতঃ কখনও কারো মনে এসেছিল ব'লে কিন্তু শুনিনি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বঙ্গ-বিভাগের পূর্ব্বে।

দীক্ষা নেয়ার পর আমাদের উদ্যম ও চেষ্টা অনেক বেড়ে গেল। ঐ সময় আমি পূর্ব্বের কায ছেড়ে নতুন চাকরী নিয়েছিলাম। মেদিনীপুর জিলার কাঁথি, তমলুক ও সদরের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। তাতে মফঃস্বলে গুপ্ত-সমিতির কাজ কর্‌বার সুবিধা ঘটল, সহরের কায 'অ'-বাবু ও সত্যেনের ওপরেই ছিল।

নিরক্ষর চাষা-ভুষো থেকে আরম্ভ ক'রে দারোগা সাহেব, এমন কি, ডেপুটী সাহেব পর্য্যন্ত, সকলের কাছে কথাপ্রসঙ্গে, দেশের দুরবস্থার কথা পেড়ে, ইংরেজই যে, সেই দুরবস্থার একমাত্র কারণ, তা প্রমাণ কর্‌তে এবং সেই জন্য ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ জাগাতে লেগে গেলাম। তখন যে সকল যুক্তি দেখাতাম, এখন তা মনে হ'লে হাসি পায়। যখন কচিৎ কখনও কোন ইংরেজ-ভক্ত ইংরেজের পক্ষ হয়ে আমাদের যুক্তির অসারতা দেখিয়ে দিত, তখন তাকে গালি দিতেও ত্রুটি কর্‌তাম না।

একবার এক জন ডেপুটীবাবুর সঙ্গে মামামশয়ের সাম্‌নে ঐ প্রকার তর্ক বেধে গেছ্‌ল। প্রথমে কথা হচ্ছিল, অনেক বিষয়ে আমাদের দিন দিন কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। আমি ব'লে ফেলেছিলাম যে, ইংরেজই আমাদের সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। ডেপুটি হুজুরের সম্মুখে আস্ত সিডিসন্! তিনি নিতান্তই উগ্রভাবে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ ক'রে ফেলেছিলেন যে, ইংরেজ আস্‌বার আগে দেশে দুরবস্থার

একশেষ ছিল; ইংরেজ আসাতেই উন্নতি দেখা দিয়েছে। ইংরেজ না এলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকৃত না ইত্যাদি। উন্নতির যে সকল নজির তিনি দেখিয়েছিলেন, সেগুলির একটিরও খণ্ডন দিতে না পেরে, আমি একেবারে বেকুব বনে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে জন্য রাগে গরগরিয়ে হাকিমদের কীর্ত্তির ব্যাখ্যান ক'রে তাঁকে দু'কথা শোনাতে যাচ্ছিলাম। এ হেন সময় মামামশয়, আমার দুরবস্থা দেখে ভাগ্যিস্ আমার সমর্থন ক'রে বলেছিলেন ইংরেজ আস্‌বার আগে অনেক বিষয়ে এ দেশ অনুন্নত ছিল সত্য; কিন্তু পৃথিবীর অন্য সকল জাতি যেরূপে ক্রমে উন্নত হচ্ছে, আমরাও সেইরূপে ক্রমে উন্নত হ'তে পার্‌তাম; অধিকন্তু বিদেশীর অধীনতা-জনিত দোষগুলি আমাদের স্বভাবে পরিণত হ'তে পার্‌ত না। যাই হোক্, তা শুনে ডেপুটী বাবু আমায় তাঁর ধমক্‌কানীর দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। মামামশয়ের এই যুক্তি এর পরে, অনেক তর্কযুদ্ধে অব্যর্থ অস্ত্ররূপে প্রয়োগ কর্‌তে পেরেছিলাম।

সকল শ্রেণীর লোক ভজাতে গিয়ে দেখেছিলাম, স্বল্পশিক্ষিত যুবকরা বেশীর ভাগ এ কাযে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাত। পরেও লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, আমাদের এই কাযে যত যুবক ঝাঁপিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে খাস্ কল্‌কাতাবাসী কম ছিল। তাদের পনের আনাই কল্‌কাতার বাইরের ছেলে। নতুন ভাব গ্রহণের প্রবৃত্তি (innovation) কলকাতার মত বড় সহরের যুবকদের চাইতে পল্লীযুবকদের অনেক বেশী ব'লে আমার মনে হয়।

ঐ সব যুবকের মধ্যে যাদের উদ্যম অধিকমাত্রায় আমাদের চোখে ধরা দিত, তাদের নিয়ে শীকারে যেতাম, বাইক্ চড়তে, বন্দুক ছুড়তে আর নানা প্রকার কষ্ট সহ্য কর্‌তে শেখাতাম। যাদের একটু সুবিধার

ব'লে মনে হ'ত, তাদের গুপ্ত-সমিতির আভাস দিতাম। শুনে তারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য খুব আগ্রহ দেখাত। কিন্তু পরে যখন দীক্ষা দিতে যেতাম, তখন তাদের প্রায় পাত্তা পাওয়া যেত না। কচিৎ দু'এক জন যারা দীক্ষাও নিয়েছিল, তাদেরও পনের আনা কিছুই করেনি, আর যারা একটু আধটু কিছু করেছিল, তারা কাযের সময় "চাচা আপনা বাঁচা", লৌকিক বেদের এই বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

একবার এক দারোগার ভাই, দিন কয়েক সাধ্য সাধনার পর খুব আগ্রহসহকারে দীক্ষা নিয়েছিল। তার পর তার দারোগা দাদার গোলামীর "পাপ অন্ন" আর খাবে না ব'লে, বাড়ীতে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ লাগিয়ে, অবশেষে এক দিন বাড়ী ও স্কুল ছেড়ে আমাদের প্রচারকার্য্যে খুব যত্নের সহিত লেগে গিয়েছিল। তার এ প্রকার ঐকান্তিক ভাব দেখে মনে হয়েছিল, না জানি সে কত অসাধ্যসাধনই না করবে। পরে যখন তা'কে ম্যাজিক্ ল্যান্‌টার্ণ দেখিয়ে ভাবপ্রচার ও টাকা রোজগার কর্‌বার ভার দেওয়া হয়েছিল, তখন প্রথমে বেশ আশানুরূপ কায করে, কিছু দিন পরে কিন্তু আর টাকাও পাঠালে না, আর কোথায় থাকে, তার খবরও দিলে না। অনেক দিন পরে যাই হোক্ জানা গেল, সে অনেক টাকা নিয়ে সরে পড়েছে; আর দাদার সুবোধ ভাইটির মত বাড়ী গিয়ে, বে-থা ক'রে, বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়ছে।

এ কাযে সরকারী ছোট বড় কর্ম্মচারীদের মধ্যে এমন কি পুলিসের কাছেও বরং সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু জমীদারশ্রেণীর মধ্যে সব চেয়ে কম সাড়া পেয়েছি।

সহরে স্কুল-কলেজের মধ্যে সত্যেনই বেশীর ভাগ কায কর্‌ত। অন্য লোকদের মধ্যে আমাদের গুরুজী 'অ'-বাবু দীক্ষা এবং ভাবপ্রচারের কায

বেশ চালাচ্ছিলেন ব'লে বল্‌তেন। কিন্তু কাযে-কর্ম্মে বিশেষ কিছু দেখ্‌তে পাই নি।

জমীদার, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারী কর্ম্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদি সকল প্রকার লোকের মধ্যেই, সহানুভূতি কর্‌বার লোক জুটেছিল। তাঁদের মধ্যে সকলেই যে গুপ্ত-সমিতির সমস্ত ব্যাপার আমূল জান্‌তেন, তা নয়। দীক্ষা নিতে বড় একটা কেউ চাইত না। আর আমাদের এই গুপ্ত-সমিতির আদর্শ প্রায় কারও মনে, যতটা দৃঢ় ও স্থায়িভাবে স্থান লাভ কর্‌লে, প্রকৃতরূপে কায হ'লেও হ'তে পার্‌ত, তত দৃঢ়ভাবে স্থান পায় নি।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাতে আমরা এমনই হতাশ হয়ে পড়্‌তাম যে, আর এ সব কাযে প্রবৃত্তি হ'ত না। কিন্তু আমাদের গুরুজী 'অ'-বাবু ও সত্যেনের দিক্ দিয়ে হতাশা ভুলেও যেত না। অধিকন্তু তাঁদের কাছে আমাদের হতাশার নামটিও কর্‌বার যো ছিল না।

এই অকৃতকার্য্যতার কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে কর্‌তাম, অন্যকে অনুপ্রাণিত কর্‌বার শক্তি আমাদের নেই। এ শক্তি কি প্রকারে লাভ কর্‌তে পারি, সেই চিন্তা ও চেষ্টা তখন প্রবল হয়ে পড়েছিল। আমাদের আদিগুরু 'অ'-বাবুর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা চল্‌ত। আমাদের এই আধ্যাত্মিক দেশে সম্ভব অসম্ভব যে কোন শক্তি যত ইচ্ছা যোগ-সাধনার দ্বারাই যে নিশ্চয় লাভ করা যায়, এই নিত্য প্রত্যক্ষ সনাতন পন্থাটি কিন্তু গুরুজীর মাথা থেকে বেরুল না। আমার মনে পড়ে, তিনি বাৎলে দিয়েছিলেন যে, খুব ক'রে এ সকল বিষয় পড়ে ও চিন্তা ক'রে অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌লে শক্তিলাভ হ'তে পারে।

আমরা কিন্তু তখন দেখেছিলাম যে, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল, তবুও তিনি খুব বেশী লোককে আশার অনুরূপ অনুপ্রাণিত

করতে পারেন নি। তাঁর বাৎলে দেওয়া এই পন্থাটি তখন সেই জন্য ঠিক ব'লে মনে লাগে নি। তবে সত্যেন অনেকগুলি ছাত্রকে ভজিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেও ৫।৬টি ছেলে ছাড়া কেউ শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকে নি।

গুরুজী যখন তখন কলকাতা যেতেন। তিনি অত্যন্ত Optimist ছিলেন। গাছে কাঁঠাল আছে কিনা, খোঁজ না নিয়ে গোঁফে তেল লাগাতে, তাঁর জুড়ীদার প্রায় দেখা যেত না। তিনি যখন কলকাতা থেকে ফিরে এসে সেখানকার সমিতির কাযের হিসাব দিতেন, তখন তা শুনে আশাতীত কায হচ্ছিল ব'লেই মনে হ'ত। কিন্তু সমস্ত শোন্‌বার পর একটু চিন্তা ক'রে কাযের দিকটা ভেবে দেখ্‌লে দেখা যেত সবটাই ফাঁকি।

একবার কলকাতা থেকে এসে তিনি সেখানকার কাযের খুব লম্বা-চওড়া রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কাযের মধ্যে কিন্তু পেয়েছিলাম, যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার (?) জন্য একটা ঘোড়া, একখানি বাইক, আর একটি নামেমাত্র কুস্তির আখ্‌ড়া। এক বছরে বাংলা দেশটাকে প্রস্তুত মানে, অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক শিক্ষিত সৈন্য, আর সেই বরাবর আফিসার ও যুদ্ধের সরঞ্জাম, এক বছরে না হো'ক্, অন্তত দু' বছরে তয়ের থাকা। অথচ আসল কেন্দ্র কলকাতাতেই প্রায় দু' বছরে প্রস্তুত হয়েছিল (?) একটিমাত্র ঘোড়া, একখানি মাত্র বাইক, না হয় আরও ঐ রকম কিছু; আর জুটেছিলেন আন্দাজ এক ডজন নেতা ও উপনেতা, খুব বেশী হয় ত, জোনা চার পাঁচ সর্ব্বস্ব-পণকারী ভাবী সেনাস্থানীয় চেলা এবং জন কয়েক মাত্র আধচেলা। গুপ্ত-সমিতির কায যে সেরেফ কিছুই হচ্ছিল না, তা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয়নি।

গুরুজীর কাছে কলকাতা কেন্দ্রের কয়েক জন নেতার অনেক তারিফ্ শুনেছিলাম। তার মধ্যে এক জন শ্রীযুক্ত দেবব্রত বসু। তিনি না কি এ সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এখন পরলোকে।

আমি দু' এক মাস অন্তর প্রায়ই কলকাতা যেতাম। সভা-বাজারের কাছে থাক্‌তাম। 'থ'-বাবুর সঙ্গে সারকিউলার রোডে একটা বাড়ীতে দেখা করেছিলাম। সেইখানেই কলকাতার প্রথম কেন্দ্র। তিনি সেখানে সপরিবারে থাক্‌তেন।

তিনি এবারও প্রথমবার সাক্ষাতের মত অনেক নতুন নতুন আজগুবি গল্প ঝেড়েছিলেন। তিনি আমায় দেবব্রতবাবুর বাড়ী নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। দেবব্রতবাবুকে দেখে, বিশেষতঃ তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে সত্যই বড় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর বাড়ী আমাদের বাড়ীর কতকটা কাছে ছিল ব'লে কলকাতায় এলেই, দিন দু'বেলা তাঁর বাড়ীতে আড্ডা দিতাম।

দেবব্রতবাবুর কাছে শুধু বাংলাদেশ কেন, সমস্ত দুনিয়ার গুপ্ত আর প্রকাশ্য সকল সমিতির খবর থাকৃত। খবরগুলা অত্যন্ত বাড়িয়ে, আর কখনও বা নিছক কল্পনা থেকে বল্‌তেন। তিনি যে জেনে বুঝে এমন মিথ্যা বল্‌তেন, তা মনে হয় না। এ তাঁর অভ্যাস। এটাকে pious বা honest fraud অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যা প্রতারণা বলা যেতে পারে। এমন অনেক কল্পনা-প্রবণ লোক আছেন যে, কোন কিছু ঘটনার বিষয় বা কোন ভাব বাইর থেকে তাঁদের মাথায় ঢুকলে, নিজের প্রবৃত্তি (temperament) অনুযায়ী, তাতে জোড়া-তাড়া না দিয়ে পারেন না। এইরূপে নিজের ঝোঁকমত গ'ড়তে গ'ড়তে উক্ত ভাব বা ঘটনা বেমালুম এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, তার কতটুকু সত্য আর

কতটুকু মিথ্যা, কিছুকাল পরে নিজেই আর তা স্থির ক'রে উঠতে পারেন না। তখন তাঁদের কল্পনা তাঁদের কাছে ঘটনাতে পরিণত হয়। সুতরাং তাঁরা মিথ্যা কথা বলার দ্বিধা অনুভব না ক'রে, অবলীলাক্রমে তা সত্য ব'লে জাহির করেন।

তার পর অকাট্য প্রমাণ দিয়ে, যদি তাঁদের মিথ্যা বা ঘটনার কাল্পনিক অংশ কতটুকু, তা ধ'রে দেওয়া যায়, তবে তাঁরা বলেন "এরূপ ত হ'তেও পারত! বা ভবিষ্যতেও ত হ'তে পারে! তা না হ'লে আমাদের মনে এল কেমন ক'রে। এ এক রকমের সত্য, যাকে truth in anticipation বলা যেত পারে।" দেবব্রত বাবুও ঠিক এই প্রকার বল্তেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী, সকল সময় মৃদু হাসি, সুন্দর দাঁতগুলি, আর তাঁর অমায়িক ভাব ইত্যাদি মিলে শ্রোতার মনকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে ফেল্ত। তাঁর চেহারাখানি বেশ লম্বা-চওড়া ও ভারি সম্ভ্রমসূচক ছিল। চাহনী অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও হিপ্‌নটাইজিং। দৃষ্টি দ্বারা উইল্ ফোর্স প্রয়োগ ক'রে মানুষকে বশ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন। ইনি, 'ক'-বাবু, ও সেই সময়ের অন্য তিন জন প্রধান নেতার সহকারী ছিলেন বটে, কিন্তু সকলের ওপর প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষমতা বিস্তার করতে চেষ্টা করতেন এবং অনেকের ওপর ক'রেও ছিলেন। যথাস্থানে তা বলব।

পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার সাহেব হয়েছিলেন বাংলার বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্রের সভাপতি। ঐ সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে যখন বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন, তখন থেকেই সিক্রেট সোসাইটীর খেয়াল তাঁর মাথায় ঢুকেছিল এবং ক-বাবুর অনেক পূর্ব্বে অনুশীলন-সমিতি বা এই রকম আর কিছু নাম দিয়ে একটী গুপ্ত সমিতি চালিয়ে আস্‌ছিলেন। তা' ছাড়া দেশের মঙ্গলকামনায় চালিত প্রায় সকল

প্রতিষ্ঠানে ও প্রচেষ্টায় ইনি যোগ দিতেন। এঁর সঙ্গে 'অ'-বাবু আমায় পরিচিত করিয়ে ছিলেন। এর সংস্পর্শে আর এক উদ্যমশীল যুবকও নাকি কলকাতায় একটি দল গড়েছিল, তার নামও যেন আত্মোন্নতি সমিতি বা আর কিছু।

আর একজন বিলেত ফেরত প্রবীণ উচ্চ শিক্ষিত নেতা ছিলেন। তিনি 'ক'-বাবুর বিশেষ বন্ধু; কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ছিলেন না। এঁকে আমরা "গ"-বাবু ব'লে উল্লেখ করব।

আরও কয়েক জন নেতা ও সহকারী নেতা ছিলেন। আমাদের বারীণ তখন এঁদের ও 'খ'-বাবুর নীচু ধাপের কর্ম্মী ছিল। বারীণ, আরও দু' তিন জন ঘিয়ে ভাজা কর্ম্মী 'খ'-বাবুর সঙ্গে ঐ কেন্দ্রেই থাকৃত।

জিলায় জিলায় শাখা-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও দেবব্রত বাবুর কাছে যে সকল খবর পেয়েছিলাম, তা বেশ প্রহেলিকাময় ছিল। অর্থাৎ কোথাও যে কিছুই ঠিকমত হয়নি, এ কথা স্পষ্ট করে না ব'লে, এমনিটি ক'রে বলেছিলেন, আর এমনি ভাব দেখিয়েছিলেন, যেন জিলা-কেন্দ্রগুলিতেই কাযের মত কায হচ্ছে। সে কথা ঘুণাক্ষরে কাকেও খু'লে বলা নাকি গুপ্ত সমিতির কানুনবিরুদ্ধ ব'লেই যেন বল্‌তে পাচ্ছিলেন না।

মেদিনীপুর সম্বন্ধে আমিও প্রথমে অনেক বাড়িয়ে বলেছিলাম, অর্থাৎ সেখানে অনেকগুলি শাখা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, আর সব সমেত আন্দাজ ৪।৫ শত লোক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছে, ইত্যাদি প্রকার রিপোর্টই বেমালুম মুখ থেকে বেরিয়ে গেছ্‌ল। কাযেই আমি ধ'রে নিয়েছিলাম যে, অন্য জিলার রিপোর্ট কতখানি সত্য আর কতখানি truth in anticipation.

যাই হোক্, গুপ্ত সমিতির কায জোরের সহিত চল্‌ছিল ব'লে, যে সকল স্থানের খুব নাম ডাক তখন ছিল, সেই সকল স্থানে পরে নিজে গিয়ে দেখে-

ছিলাম ও শুনেছিলাম যে, তখন সেখানে প্রায় তেমন কিছু ছিল না। ঢাকা সম্বন্ধে তখন কিছু না শুন্‌লেও পরে জেনেছিলাম, সেখানে নাকি অনুশীলন সমিতি নামে একটি দল, উক্ত ব্যারিষ্টার সাহেবের অনুকরণে অথবা চেষ্টাতে গঠিত হ'য়েছিল। এর সঙ্গে আমাদের ক-বাবুর সমিতির কোন সম্পর্ক ঘটে নি। তারপর বাঁকুড়াতে এক খ্যাতনামা ভদ্র লোকের একটা নাকি দল ছিল। তাঁরা নামে মাত্র আমাদের সমিতির সহিত পরে যোগ দিয়েছিলেন। আর আড়বেলের কোন স্কুল-মাষ্টার একটু আধটু দেশ উদ্ধারের ভাব প্রচার কর্‌তেন ; তার ফলে কয়েকটি ছেলে কল্‌কাতার কেন্দ্রে এসে জুটেছিল।

এই সময় আর এক স্বনামধন্য অমায়িক ভদ্রলোক কলকাতার সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বিষয় পরে যথাস্থানে বল্‌ব। তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

দেবব্রত বাবু আমার কাছে মেদিনীপুর সমিতি থেকে কিছু টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার আর শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর 'নিউ ইণ্ডিয়ার' মূল্য স্বরূপ ৫৲ টাকা আদায় ক'রে নিয়েছিলেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' এক সময়ে ব্রাহ্ম কাগজ ছিল। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখ্‌ছি, সে সময় এটি রাষ্ট্র-নৈতিক ব্যাপারে সব চেয়ে গরম কাগজ ; দেবব্রতবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, আর তখন বেলুড়মঠের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনিও, শুনেছিলাম ঐ কাগজ খানিতে লিখ্‌তেন।

অনেক চেষ্টা স্বত্তেও লোকের মনে গুপ্তসমিতির আদর্শ শেকড় গাড়্‌তে পার্‌ছে না দেখে, দেবব্রত বাবু, 'খ' বাবু এবং অন্য দু' একজনের কাছে অনেক রকমে জান্‌তে চেয়েছিলাম যে, কি কর্‌লে লোকে আমাদের আদর্শ আশানুরূপ গ্রহণ কর্‌বে। তাঁদের কথার ভাবে বুঝেছিলাম, তাঁরাও এই মুস্কিল্‌টা হাড়ে হাড়ে অনুভব কচ্ছেন। তাই তখন তাঁরা

লোককে হিপ্‌নটাইজ্‌ বা সম্মোহিত কর্‌বার জন্য অত মিথ্যে কথা বল্‌তেন।

আর বোধ হয়, এতেও বিশেষ ফল না পেয়ে, তাঁরা ভাব প্রচারের সময়, ধর্ম্মের ফোড়ন আর ভগবান্‌, কালী, দুর্গাদির দোহাই দিতে সুরু করেছিলেন। এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক ছিল বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দমঠ', বিপিন বাবুর 'শোভনা' নভেল এবং রাজানারায়ণ বাবুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা'। শেষের দু'খানি বই কিন্তু খুব কম লোকই প'ড়েছিল।

ঐ পথ ধর্‌তে আমরাও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের গুরুজী 'অ'বাবু এ সম্বন্ধের কথাপ্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তার এইটুকু আমার ঠিক মনে আছে যে, "ধর্ম্মটা" আমাদের উন্নতির পথে draw back বা অন্তরায়।

এই সময় মেদিনীপুর মিঞাবাজারে ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী আব্দুল কাদের সাহেবের বাড়ী ভাড়া নিয়ে কুস্তি প্রভৃতি শেখার আখড়া খোলবার চেষ্টা হচ্ছিল। এর একটা কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, আমাদের দেখাবার মত কায কিছুই ছিলনা। অর্থাৎ ভাবী ভারত-উদ্ধার-যুদ্ধের আয়োজনাদির যে সকল আজগুবি গল্প ঝাড়তাম, তার প্রমাণ স্বরূপ সুরুতে অন্ততঃ একটা আখড়া না দেখাতে পার্‌লে চলে না। তার ওপর কলকাতায় যখন একটা আখড়া খোলা হ'য়েছিল, তখন আমাদেরও আখড়ার দরকারটা গজিয়ে উঠেছিল। আর একটা বিশেষ কারণ এই ছিল যে, যাঁরা সহানুভূতি দেখাতেন তাঁদের কাছে টাকা খরচের যোগ্য একটা কিছু কায না দেখিয়ে টাকা চাওয়া যেত না।

মনে হয়, ১৯০৩ সালের শেষে একবার কলকাতায় গিয়ে দেখলাম, কলকাতার কেন্দ্র, সারকিউলার রোড থেকে গ্রেষ্ট্রীটে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দোতালার ওপর ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে একগাদা কবিরাজী

বিজ্ঞাপন, আর আমাদের বারীণ ও তদ্রূপ আর দু' তিনটি যুবক। তার মধ্যে ছিল একজন জাপানী। তাকে দেখে, মনে করে নিয়েছিলাম, কি দেবব্রত বাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এখন ঠিক মনে পড়ে না, যে আমাদের এই ভারত উদ্ধারের প্রচেষ্টাতে জাপানী জাতির ভেতরে ভেতরে যোগ আছে।

তার নাম যেন 'হোরে' কি এই রকম একটা কিছু ছিল। ওকাকুরা ও আরও জনকতক জাপানী রাজনৈতিক মাতব্বরের নাম ক'রে দেবব্রত বাবু আমাদের এমনি তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, সমিতির কায কোথাও কিছু হচ্ছে না ব'লে এর আগে যা বুঝেছিলাম, সে ধারণা ভুল ব'লে মনে করতে তখন বাধ্য হ'লাম। কলকাতার কেন্দ্রে আগে যে কায দেখেছিলাম বা তখন গ্রেষ্ট্রীটে যে কায দেখলাম, তা' কেবল সন্দেহজনক অনুসন্ধিৎসাকে ব্যর্থ করবার, বিশেষতঃ মফঃস্বলের সভ্যদিগের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধার জন্যই একটু প্রকাশ্যভাবে করা হয়েছে ব'লে মনে ক'রে নিলাম। এ ছাড়া সম্পূর্ণ গোপনভাবে যে বিপুল আয়োজন চল্‌ছিল, এ কথা ধ্রুব সত্য ব'লে ধ'রে নেয়ার পক্ষে আর কোন বাধা থাকল না।

এই ধারণার ফলে তখন মনে হ'য়েছিল, আমাদের মেদিনীপুরে ত, তা হ'লে এর তুলনায় কিছুই হয়নি। আমাদের মিইয়ে যাওয়া উদ্যম এই জাপানীকে উপলক্ষ ক'রে আবার তাজা হ'য়ে উঠল। কিন্তু সেই জাপানী হোরের যে শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল, তা আর মনে পড়ে না। যাই হোক্, এ কথা নিশ্চয় যে, জাপানী জাতির বা কোন জাপানী সমিতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না।

আবার দিনকতক পরে যখন আমাদের আশা উদ্যম মিইয়ে আস্‌ছিল, তখন আবার একটা ঘটনা ঘ'টে আমাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

একদিন মেদিনীপুর বেণীহলে বিধবা-বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়ে দেখলাম, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরকারের বিরুদ্ধে এমন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ কচ্ছেন যে, 'মেদিনী বান্ধবের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক দেবদাস বাবু নাকি পুলিশ হাঙ্গামার সম্ভাবনা দেখে তাঁকে সাবধান হ'তে অনুরোধ কর্‌লেন। তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় এমন সব কথা সরকারের বিরুদ্ধে বল্‌লেন যে, আমরা তাঁকে আমাদের মতাবলম্বী ব'লে ধ'রে নিলাম। কাযেই তাঁকে বাসায় পোঁছে দেবার ভার নিলাম। সুবিধামত নিরিবিলিতে আমাদের গুপ্ত সমিতির আভাস তাঁকে দিলাম। প্রবাণ স্বদেশপ্রাণ তাই না শুনে, তাঁর কত কালের সাধনা সিদ্ধ হয়েছে ব'লে কত আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন! বিপ্লব আন্‌তে হলে লোকের মন বিপ্লব অনুযায়ী করে আগে হ'তে গ'ড়ে তোলা যে উচিত, আর প্রধানতঃ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে এই গঠনের কায হয়ে থাকে, তা বোঝাতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। আর তাঁর প্রণীত বইগুলি যে সেই উদ্দেশ্যে লেখা, তাও বলেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা বই যে ক'খানি কাছে ছিল, তা তিনি দিয়েছিলেন। তিনি আরও কতকগুলি বাংলা ও ইংরেজী বই আমাদের পড়বার জন্য বিশেষ করে বলেছিলেন। তার মধ্যে 'নীল-দর্পণ' ও 'কুলী-কাহিনী'র নাম মনে আছে। তাঁর বই পড়িয়ে লোককে আমাদের মতে আনা তখন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। কলকাতা কেন্দ্রের ঠিকানা তাঁকে দিয়েছিলাম; আর দেবব্রত বাবুকে তাঁর কথা লিখেছিলাম। এই সাক্ষাতের দিন কতক পরে তিনি বদলি হয়ে চ'লে গেলেন। তার মাসকতক পরে শুন্‌লাম, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মাঝে একবার গ্রেষ্ট্রীটের কেন্দ্রে তাঁকে অত্যন্ত রুগ্ন শরীরে দেখেছিলাম।

বোধ হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে, শুন্‌লাম, গ্রেষ্ট্রীটের আড্ডা ভেঙ্গে

গেছে। তার কারণ সংক্ষেপতঃ এই :—গুপ্তসমিতিতে যাঁরা প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের স্বভাবের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, অন্যের মন্তব্য বা উপদেশ (Suggestion) সহ্য কর্‌তে একেবারে পার্‌তেন না। অধিকন্তু যারা তাঁদের আধিপত্য বা মতামত অবনত মস্তকে স্বীকার না কর্‌ত, তাদের লোকের কাছে ছোট কর্‌বার অথবা তাড়াবার জন্য নিতান্ত হীনতম উপায় অবলম্বন কর্‌তেও দ্বিধা বোধ কর্‌তেন না।

এই সময় উপনেতাদের মধ্যে 'খ' বাবুই সব চেয়ে কর্ম্মপ্রবণ ছিলেন ব'লে তখনকার নেতাদের, বিশেষতঃ 'ক'-বাবুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাই এ কাল পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও কর্ত্তৃত্বস্পৃহা খুব প্রবল ছিল। তার ওপর তিনি ছিলেন মিলিটারী ম্যান অর্থাৎ সৈনিকপুরুষ। বাঙ্গালীর পক্ষে এটা এমনই অভাবনীয় ব্যাপার যে, তিনি সামান্য সেনামাত্র হ'লেও তাঁর মেজাজ ছিল 'জান্রেলের' মত। চেলাদের ওপর তিনি তাঁর এই 'জান্রেলী' পূরোমাত্রায় চালাতেন।

কলকাতা কেন্দ্রের সহকারী নেতাই যে পরে বাংলাদেশের, চাই কি নিখিল-ভারতের সেনাপতিতে পরিণত হবে, আর যুদ্ধশেষে ইচ্ছা কর্‌লে ভারতের সম্রাট, অথবা অন্ততঃপক্ষে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে বিরাজ কর্‌বেই, কল্পনার দৌলতে অনেকেই তা স্থিরনিশ্চয় ক'রে বসেছিলেন এবং এই সহকারী নেতার পদটির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন।

যোগ সাধনায় সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তপুরুষ না হ'লে যে সহকারী নেতা হওয়ার, আর সাধনা-রত না হ'লে যে চেলা হওয়ার অধিকারী হ'তে পারে না, এ বিধান তখনও প্রবর্ত্তিত হয়নি। নিষ্কাম কর্ম্মের বড়াই কর্‌বার ফ্যাসন্ তখনও প্রচলিত হয়নি। কাজেই কলকাতা কেন্দ্রের

লোভনীয় এই উপনেতার পদটি নিয়ে যে ঝগড়া-ঝাটি চল্‌বে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

আমাদের বারীণ অন্যের প্রদর্শিত পথে চল্‌তে দুনিয়ায় আসেনি, অন্যকে পথ দেখাতেই এসেছে। এই প্রকারের কথা বারীণের মুখে অনেকবার আমরা শুনেছি। কাযেও তাই ঘটেছিল। ক-বাবু ক্রমে ক্রমে বারীণের চোখে দেখ্‌তে, বারীণের কান দিয়ে শুন্‌তে এবং বারীণের মুখ দিয়ে বল্‌তে সুরু ক'রে দিলেন।

বারীণ এ যাবৎ 'খ'বাবুর কর্ত্তৃত্ব মেনে চল্‌তে বাধ্য হয়েছিল। এখন যদিও সকল নেতা উপনেতা, এমন কি, হবুনেতা পর্য্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু 'খ'বাবুকে তাড়ান তার প্রধান কায হয়ে দাঁড়াল। সুযোগও জুটে গেল।

তাঁর নাকি এক যুবতী আত্মীয়া সারকিউলার রোডের কেন্দ্রে থাকত। তার স্বভাব-চরিত্র শুনেছিলাম ভাল ছিল না; তাই 'খ'বাবু তাকে সুমতি দিয়ে সংশোধনের চেষ্টায় ছিলেন। তা সত্ত্বেও সেই যুবতী নাকি কারো কারো পরকীয়া সাধনের সুযোগ দিতে চেষ্টা করেছিল। সে কালে রাজনীতির ভেতর এত ধর্ম্মভাব ঢোকেনি। তাকে নিয়ে একটু-আধটু প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাকি চ'লেছিল। নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী 'খ'বাবুকে ঘায়েল কর্‌বার জন্য তাঁর ও ঐ যুবতীর মধ্যকার সম্বন্ধটা দুষিত ব'লে ক-বাবুর কাছে বারীণ যথারীতি রিপোর্ট করেছিল। একতরফা বিচারে ক-বাবু 'খ'বাবুকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। ফলে সারকিউলার রোডের আড্ডা উঠে গেল। 'খ'বাবু অন্যত্র পৃথক্ ভাবে দলগঠন কর্‌তে লাগ্‌লেন। আর বারীণের নেতৃত্বে গ্রেষ্ট্রীটে নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল। এই প্রকারে বারীণের সঙ্গে ঝগড়ার একতরফা রায়ের ফলে ক-বাবুর সঙ্গ যাঁরা ত্যাগ কর্‌তে সুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার সাহেব এক জন। মেদিনীপুরের

অ-বাবুও সত্যেন, বারীণকে আগে থেকে জান্‌তেন। সত্যেন—বারীণের মামা। বারীণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার ক'রে চলা তাঁদের পক্ষে হ'য়ে উঠ্‌ত না। তা ছাড়া এঁদের মধ্যে বারীণ হবুপ্রতিদ্বন্দ্বীর বীজ বোধ হয় দেখ্‌তে পেয়েছিল। সত্যেন তখন ঐ কেন্দ্রেই থাকত। তাই সত্যেনকেও ঘায়েল কর্‌বার জন্য উক্ত যুবতীকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় নি। সত্যেনও বিতাড়িত হয়েছিল।

মেদিনীপুর কেন্দ্রের সভ্যরা এই সকল ব্যাপারে যদিও বড়ই বিরক্ত ও হতাশ হ'য়ে প'ড়েছিলেন, তবু ক-বাবুর ওপর অগাধ ভক্তি বশতঃই বারীণকে একবারে ত্যাগ কর্‌তে পারেন নি। অথচ অন্য দলের সঙ্গেও এঁদের মেলা-মেশা ও খাতির বেশ চল্‌ছিল। যাই হোক্, বারীণের উপনেতৃত্বে 'ক'-বাবুর ওপর যে অনেকের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তা একটু বিচলিত হ'য়েছিল। 'খ'বাবুকে 'ক'-বাবুর সঙ্গে মেলাবার বৃথা চেষ্টাও অনেকে করেছিলেন।

তখনকার নেতৃত্বের উপযোগী সব চেয়ে যে দুটি বড় গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে ভক্তবৃন্দের ব্যাকুল সমাবেশের সম্ভাবনা ছিল, তার কোনটি তখন সুবিধামত বারীণের ছিল না। প্রথম, বারীণের চেহারাখানি বারীণের আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। ওটা প্রেমিক, কবি, সাধক, যোগী প্রভৃতি আর যে কিছু হওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক হ'লেও হ'তে পার্‌ত, কিন্তু ভারত-উদ্ধারকারী হবু জান্ত্রেলের গোড়া-পত্তন কর্‌বার পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, তখনও বারীণের জিহ্বাখানি যথেষ্ট শাণিত হয়নি। কারণ, দুনিয়ার রকম-বেরকমের খবর একটু-আধটু জানা থাক্‌লে, তবেই জিহ্বার কস্‌রত সম্ভব হয়। এ ছাড়া আরও অনেক কারণে বারীণের নেতৃত্বে ভক্তের অভাববশতঃ গ্রেষ্ট্রীটের কেন্দ্রও দিনকতক পরে উঠে

গেল। বারীন বাংলাদেশ ছেড়ে বরোদায় তার সেজদা'র কাছে চ'লে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল দেবব্রত বাবুর প্রভাব। অর্থাৎ দেবব্রত বাবুর এ ধারণা হ'য়েছিল যে, এ দেশের লোককে কোন ভাবে সোজাসুজি অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয়। যে ভাবের দ্বারা এ দেশ মজ্জায় মজ্জায় জরে আছে, সেই ভাবের আবরণে মোড়াই ক'রে দেশ-উদ্ধারের বা বিপ্লবের ভাব দেশের লোকের মনে, জিলেটিন দিয়ে মোড়া কুইনাইনের পিল গিলিয়ে দেয়ার মত ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই আবরণটি হচ্ছে ধর্ম্ম। এ পথটি আপাত সুগম ব'লে প্রায়ই সকল নেতাই অল্প-বিস্তর অবলম্বন কর্ত্তে অগত্যা বাধ্য হ'য়েছিলেন। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

ক-বাবু, এর কিছু পূর্ব্বে বাংলাদেশে সিক্রেট সোসাইটী গঠনের অসুবিধা দেখে অন্যত্র গিয়েছিলেন। তিনিও দেবব্রত বাবুর প্রভাব এড়াতে পারেন নি। কোন বিষয়ে প্রথমে যে ধারণা কোন রকমে তাঁর মনে আস্‌ত, তা তিনি বড় সহজে ছাড়্‌তেন না। এখন সিক্রেট সোসাইটীর কাযে ধর্ম্মকে উপায়স্বরূপ নিয়োগ কর্‌বার জন্য মালমস্‌লা সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি লাগলেন। অন্য নেতারা কিন্তু গুপ্ত-সমিতির তথাকথিত কায একবারে ত্যাগ কর্‌লেন না। 'ক'-বাবুর অবর্ত্তমানে আমরা এঁদের কাছে যেতাম, দেবব্রত বাবুও এঁদের সঙ্গে মিশ্‌তেন।

পূর্ব্বে ভূপেন বাবুর উল্লেখ করেছি। ইনি তখন প্রচারকার্য্যে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে মেদিনীপুরেও যেতেন। কোথাও কোন আশা-ভরসা না পেয়ে, তিনি প্রাণ খুলে হতাশার বেদনা জানাতেন; আর দেশের লোককে সাধ মিটিয়ে গালাগাল দিতেন। ইনি 'ক'-বাবুর বড় ভক্ত ছিলেন। এঁর সেনাপতি বা সম্রাট হওয়ার খেয়াল তখন বোধ হয় ছিল না। প্রচারের কাযে এঁকে অত্যন্ত পচা

পাড়াগাঁয়ে নিয়ে গেছি ও বিশ্রী খাবার খেতে দিয়েছি; দেখেছি, ইনি খাস্ কল্‌কাতাবাসী হ'য়েও কোন অভিযোগ, করেন নি।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর বঙ্গবিচ্ছেদের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আন্দোলন তীব্র আকার ধর্ত্তে সুরু করে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। আর রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছিল, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী। কিন্তু আমাদের প্রাণে এর প্রভাব বিস্তার কর্ত্তে আরম্ভ ক'রেছিল, ঐ সালের মাঝামাঝি থেকে।

তার পূর্ব্বে দু' বছরের অধিক কাল বাংলা দেশের বিপ্লবের কায ত দূরের কথা, বিপ্লবভাব প্রচারের চেষ্টা মোটের উপর ব্যর্থ হ'য়েছিল। চেলার চাইতে নেতার সংখ্যা অধিক; কাযের চাইতে অকাযের মাত্রা বেশী হ'য়েছিল। এক কথায় বল্‌তে গেলে এই বল্‌তে হয় যে, মানসিক ভাবের বিপ্লব আগে না ঘটালে, অন্য কোন বিপ্লব যে সংঘটিত হ'তে পারে না, এ কথা কেউ জান্‌তেন না। অর্থাৎ সমাজের ভাল-মন্দের বিধাতা যে লোকমত, তাকে ভাবী স্বাধীনতা লাভের উপযোগী কর্‌বার জন্য তার আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে, তাকে উন্নততর ন্যায়-অন্যায় বিচার জ্ঞানের ওপর স্থাপিত করা উচিত ব'লে নেতাদের প্রায় কারও মনেই আসেনি।

এই দুটি ঘটনা—রাসো-জাপানিজ সমর আর বঙ্গবিচ্ছেদ—বা এ রকম আর কিছু যদি না ঘটত, তা হ'লে আমাদের সিক্রেট সোসাইটীর ব্যাপার ক্রমে যে ঐখানে লোপ পেয়ে যেত, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এই জিনিষটি প্রথমে আমরা বাইর থেকে পেয়েছিলাম এবং মাঝে মাঝে বাইরের আঘাতেই এক রকম ক'রে জাগিয়ে রেখেছিল। অল্প সময় পরে আঘাতের বেগ যেমন কমে এসেছিল, তেমনি পরে পরে এক একটি ঘটনা ঘ'টে আবার একটু জাগিয়ে তুলেছিল। শুধু যে বাঙ্গালী আমরাই

এই রকম ঝিমিয়ে পড়্‌তাম তা নয়, ভারতের সব যায়গায় এ রকম যত কিছু উত্তম প্রায়ই ঝিমিয়ে পড়ে।

কেউ অতিরিক্ত মাত্রায় আফিং খেয়ে যখন মৃতপ্রায় অবস্থায় লোক-চক্ষুতে ধরা পড়ে, তখন তার নিদ্রালসতা পাছে মৃত্যুতে পরিণত হয়, এই ভয়ে তার চুল ছিঁড়ে, কান টেনে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জখম ক'রে ফেল্‌লেও সে বেহুঁশে ঝিমিয়ে থাকে। যখন খোঁচার মাত্রা অত্যধিক হয়, তখনই কেবল সে একটু বেদনা বোধ করে। কিন্তু সে বেদনাবোধ সম্পূর্ণ বেহুঁস অবস্থায় ব'লে বেদনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তার নিজের চেষ্টা থাকে না। আমাদের অবস্থাও ঠিক ঐ রকম। আমরা বাইরে থেকে খোঁচা পেলে আমাদের যেন একটু হুঁস হয়; অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য একটু বেদনা অনুভব করি, পরক্ষণে আবার বেহুঁস হ'য়ে পড়ি। তখন আর বেদনা-বোধ থাকে না, বেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা ত দূরের কথা।

এই আফিংএর বিষে মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে আফিং যেমন বিষ-ক্রিয়া করে, মৃতপ্রায় আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম সেই রকম বিষ-ক্রিয়া কর্‌ছে কিনা যথাস্থানে আমরা তা খুঁজে দেখবার চেষ্টা কর্‌ব। এখন দেখ্‌ব, আমরা দেশকে এই "স্বাধীনতার আদর্শে" অনুপ্রাণিত কর্‌তে পার্‌লুম না কেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত-সমিতির আদর্শ ব্যর্থ হ'ল কেন ?

এই পরিচ্ছেদে যা' লিখ্‌তে যাচ্ছি, তা' "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" ব'লে অনেকের মনে হ'তে পারে, জেনেও লিখ্‌ছি এবং পরেও লেখ্‌বার আশা রাখি ; কারণ, এটা বাদ দিলে এরূপ প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন কিছু থাক্‌তে পারে বলে মনে হয় না। যাই হোক্, যত সংক্ষেপে পারি, আমার বক্তব্য শেষ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

আমাদের গুপ্ত-সমিতির আদর্শ ছিল—এ দেশকে স্বাধীন করা। পূর্ব্বেই বলেছি, এই স্বাধীনতা মানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। আমাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণের অভাব আছে, যা' এই প্রকার স্বাধীনতা শুধু নয়, কোন প্রকার স্বাধীনতা লাভের পক্ষে আমাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ক'রে রেখেছে। এ কথা স্বীকার করা নেহাৎ কষ্ট-দায়ক হ'লেও, অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই ; কারণ, আমাদের চারিত্র বলের অভাব না থাক্‌লে আমরা আজও প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে পরাধীন হয়ে আছি কেন ? আরও দুঃখের সহিত স্বীকার কর্‌তে আমরা বাধ্য যে, কোনও দিন যে আমরা স্বাধীন হতে পারি, তার যুক্তিসঙ্গত উপায়ের ধারণা, সেকালে কর্‌তে পার্‌লেও, এই সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর, আমরা এখন আর কল্পনাতেও তা' ক'রে উঠতে পারি না। তাই যাদুকরের যাদু, অর্থাৎ দেবতার লীলা বা আদেশ, অথবা দুষ্কৃতের দমনের জন্য অবতাররূপে স্বয়ং ভগবানের সম্ভব হওয়ার তথাকথিত প্রতিশ্রুতির ওপর ঐকান্তিক নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের উপায় নেই।

এমন অস্বাভাবিক রূপে আমাদের মন শ্রমকাতর হ'য়েছে যে, আমরা কোন কিছু বেশী ক'রে চিন্তা বা অনুভব করতে অপারক্। এ জন্য তীব্র দুঃখের অনুভূতি যেমন আমাদের নেই, তেমনি বেশী করে সুখের ধারণাও করতে পারি না। অথবা এও বলা যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের আকাঙ্খা করবার প্রবৃত্তিও আমাদের জাগে না। তাই পরিবর্ত্তন-বিমুখতা আমাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। ফলে সজ্ঞানে কোন নতুন আদর্শ বা নতুন চিন্তাপ্রণালী গ্রহণে আমরা একেবারে অসমর্থ। ফলকথা, প্রকৃত মানুষের মত অভাব বোধ করবার শক্তি আমাদেয় নষ্ট করা হ'য়েছে। এইটিই এ দেশবাসীর বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণে অপার-কতার বিশিষ্ট কারণ। সেই কথাই এখন আমাদের আলোচ্য।

আমাদের দেশে নতুন কোন ভাব বা আদর্শ প্রবর্ত্তন করবার প্রচেষ্টা (movement) বা আন্দোলন গৌণভাবে এক আধটুকু সার্থক হ'লেও, মুখ্যভাবে মোটের ওপর যুগে যুগে প্রায় ব্যর্থ হ'য়েই আসছে।

আমরা দেশ বা সমাজ বলতে সাধারণ লোককেই বুঝি। তথাকথিত সত্যযুগ থেকে আজ অবধি নিছক তাদেরই অবস্থার উন্নতি করবার জন্য কোন প্রচেষ্টা যে কখনও হ'য়েছিল, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও বোধ হয় তার প্রমাণাভাব। উত্তরোত্তর তাদের আষ্টে পৃষ্টে বাঁধবার চেষ্টাই চির-কাল সফল হ'য়ে আসছে। কিন্তু কোন অবতারের, ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রচেষ্টায় তাদের সেই চিরবন্ধন একটুও স্থায়ীভাবে কখন মোচিত হ'য়েছিল তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যে নেই, তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। এমন কি, সে অমানুষিক বন্ধন যে কখনও কোন কারণে একটু শিথিল হয়েছিল, তাও বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু জগতের সবই পরিবর্ত্তনশীল বলে সেই শূদ্র বা শূদ্রেতর সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন মন্দই হোক বা ভালই হোক সর্ব্বদা ঘটে আসছে ; কারও চেষ্টায়

অপেক্ষা রাখে নি। সে কেবল কালের চক্রে ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপেই সাধিত হয়েছে। তাই তার ফল বিশেষ মঙ্গলদায়ক হয় নি।

অথচ এ কথাও হয় ত সত্য যে, কোন দেশে কোন প্রচেষ্টা কখনও পূর্ণ সফল হয়নি। কারণ সকল প্রচেষ্টারই বিলম্বে বা অনতিবিলম্বে প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হ'য়ে প্রচেষ্টার গতি কতকটা রোধ করে বা গতির মুখ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রচেষ্টারই যে প্রতিক্রিয়া আসে, তা'র বেগ এমন প্রচণ্ড হয় যে, গন্তব্যপথ থেকে ত তা'কে বিচলিত করেই, তা'র ওপর সে প্রচেষ্টার সুফল ত দূরের কথা, তা'র প্রতিক্রিয়ার কুফল আমাদের মজ্জায় মজ্জায় চিরকালের তরে জড়িত হ'য়ে থাকে।

বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানের আদর্শ গ্রহণ ক'রে, ভারতের বাইরে জগতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক ধন্য হ'লেও, আমাদের সনাতনধর্ম্মের দেশে তা' যে শুধু ব্যর্থই হয়েছিল, তা' নয়, তার প্রবল প্রতিক্রিয়ার দাপটে দেশ আজও খোলা চোখে দিন-দুপুরে দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছে—জগৎ মিথ্যা। অথচ পৃথিবীর মধ্যে এক জন অত বড় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহাপুরুষ আমাদেরই স্বদেশবাসী, আর অন্য দেশের অত লোক, তাঁর ধর্ম্ম আর আমাদের সভ্যতা নিয়ে ধন্য হয়েছেন ব'লে, চেঁচিয়ে গৌরবের দাবী কর্‌তে আমরা একটুও লজ্জা বোধ করি না!

যাই হোক্, উক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে সাধারণ লোক যখন শত শত বছর যাবৎ ত্রাহি ত্রাহি কর্‌ছিল, তখন "তথাকথিত" সনাতনধর্ম্ম আর সামাজিক রীতিনীতির নৃশংস বন্ধন থেকে স্বাধীনতার এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। প্রতিক্রিয়ার ফলে তার পরিণাম যে কি নিদারুণ হয়েছে, তা' বোধ হয়, আর কাউকে ব'লে দিতে হবে না।

এই প্রকারে মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত যুক্তিবাদ

(Rationalistic movement) আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্ম-সম্পর্ক বিহীন জনসাধারণের শিক্ষার (Secular mass education) আদর্শ অনুযায়ী ফল ফল্‌তে না ফল্‌তেই, প্রচণ্ড বেগে প্রতিক্রিয়া এসে সব ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে। তা'র ফলে যে সকল দোষ মানুষের চরিত্রে থাক্‌তে, কোন দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা কখনও উন্নত হয়নি, সেই সকল দোষ এ দেশে আবার এমন শেকড় গেড়ে বসেছে যে, তা' থেকে মুক্তির আশা করবার মত কোন কিছু আজও খুঁজে পাওয়া যায় না, বল্‌লে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

যাই হোক্, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার এ দেশে যে সকল কারণে ব্যর্থ হয়েছে, তা'র মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অভাববোধের শক্তিনাশই প্রধান।

অভাব বল্‌তে বুঝি, মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকাতে মানুষ অন্য জীব থেকে নিজেকে উন্নত ব'লে মনে করে, সেই সকলের অভাব বা দারিদ্র্য। এই অভাবের বোধ অর্থাৎ দারিদ্র্যের তীব্র অনুভূতি না থাকলে মানুষকে আর মানুষ বলা চলে না। এইটেই মনুষ্য চরিত্রের গোড়ার কথা। মানুষের উন্নতির সীমা আমরা যেমন ধারণা কর্‌তে পারি না, এই উন্নতির পথে বাধা, বিঘ্ন, অন্তরায়েরও তেমনি ইয়ত্তা কর্‌তে পারি না। এ হেন বাধা-বিঘ্নাদির কবল হ'তে ক্রমে যে অব্যাহতির ইচ্ছা তারই নাম স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা চেষ্টাকে ভিত্তি ক'রেই মানব স্বভাব বা চরিত্র গঠিত। আমাদের এ স্বাধীনতার অভাববোধ কোথায় গেল, আর কেমন ক'রে গেল?

অভাববোধই যদি জীবনের আদি লক্ষণ হয়, তবে যে জীব যত অধিক অভাব বোধ করে, সে জীব তত অধিক জীবনের পথে অগ্রসর অর্থাৎ উন্নত। আমরা দেখতে পাই, মানুষ ছাড়া প্রায় অন্য সকল জীবের অভাব বোধের সীমা আছে, তাই তারা সীমাবদ্ধ জীব। মানুষের অভাব-

বোধের সীমা নেই ব'লে মানুষ এক অসাধারণ উন্নত জীব। মানুষ নিজের চেষ্টায় কত দূর উন্নত হতে পারে, ত'ার সীমা নির্দেশ বা তা'র ধারণা করতে মানুষ পারে না। অন্য মানুষের কথা পৃথক্, কিন্তু ভারত-বাসী আমরা, অন্য জীব অপেক্ষা পিচিণ্ড চিন্তা ছাড়া, যে সকল অতিরিক্ত অভাবের বোধ থাকাতে মানুষ নামে অভিহিত, সেই সকল অভাবের সে তীব্র জ্বালা আমাদের নেই, যা, থাকলে তা'র তাড়নায়—আমরা সে অভাব মোচনের চেষ্টায় প্রাণপণ করতে পারি। অধিকন্তু, বড়ই অসাধারণ ব্যাপার এই যে, অভাবের জ্বালাবোধের পরিবর্ত্তে আমরা এই অভাবে এক রকমের অহেতুক সন্তোষ অনুভব ক'রে থাকি। অভাবের দুঃখ বা জ্বালা আমা-দের দংশন করে না, কাযেই অভাবের কারণ এবং অভাব মোচনের উপায় অনুসন্ধানে প্রেরণা দেয় না। সেই জন্য আমাদের হিতকরী চিন্তা-শক্তির যথেষ্ট বিকাশ কোন দিন হ'তে পায়নি, তার ফলে আমাদের জ্ঞানও এক রকম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই অভাবের দুঃখে আমরা তৃপ্তি বা শান্তি লাভ করি কেন? কারণ, অভাব বোধ না করাই যে আমাদের সনাতন নীতির প্রধানতম কর্ত্তব্য অর্থাৎ যদিচ নেহাত অনিবার্য্য কারণে অভাববোধ করেই ফেলি, তবে তাতে দুঃখ বোধ না করা অথবা সে অভাবমোচনের চেষ্টা করার পরিবর্ত্তে, সেই অভাবের অবস্থায় তা'র দুঃখটি সইতে পারার আত্ম-প্রসাদ লাভ করতেই, ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা বহু পুরুষ পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত হয়ে আসছি। সেই শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে আমাদের স্বভাবের স্তরে স্তরে বিরাজ করছে। এই আমাদের তথাকথিত সাত্ত্বিক ভাব; এটা শুধু আমাদেরই নয়, নাকি সমস্ত মানবগণের মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ; এইটী জগৎকে নাকি ভারতের দান। এতে সেই শান্তি দেয়—যা নাকি আমাদের সনাতন ভারতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, আমরা সনাতন সভ্যতার বৈশিষ্ট রক্ষা

কর্‌তে গিয়ে মানবতার বৈশিষ্ট্য যে হারিয়ে ফেলেছি সে হুঁস আমাদের নেই। তার পর এক দিকে অভাবজনিত দুঃখ অনুভব করা যেমন অতি নিন্দনীয় মহাপাপ, অন্য দিকে অভাবের দুঃখে শান্তি অনুভব করাও তেমনই মহাপুণ্যের কায। এক দিকে পরম সাধনার বস্তু সাত্ত্বিকতা অর্থাৎ ত্যাগ, নিবৃত্তি, বৈরাগ্য দৈন্য, দারিদ্র্য, ভিক্ষাচর্য্যা, সুখে দুঃখে সমজ্ঞান ইত্যাদির মহিমায় যেমন আমরা মহিমান্বিত, অন্য দিকে তেমনই অভাবজনিত দুঃখমোচন বা অভাবপূরণের চেষ্টার ফলে যা' ঘটে থাকে, তা'কে তামসিকতা অর্থাৎ প্রবৃত্তি, লালসা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগ, বাসনা, বিলাসিতা, পরানুকরণ প্রভৃতি লোকমতে নিন্দিত অসংখ্য নামে অভিহিত ক'রে, তা' থেকে নিবৃত্ত থাকাই পরম পরমার্থ বলেই, তদনুযায়ী কর্ম্ম কর্‌তে শিক্ষিত হয়েছি, এখনও হচ্ছি।

কিন্তু মানুষের এই অভাব-বোধ-শক্তি-রূপ জন্মগত অধিকার থেকে মানুষকে একেবারে বঞ্চিত কর্‌লে মানুষ আবার পশুতে পরিণত হ'য়ে পাছে গোলমাল বাধায়, বা দাসত্বেরও অযোগ্য হয়ে পড়ে তাই বুঝি স্বাভাবিক অভাববোধের বদলে নেহাৎ অস্বাভাবিক, নিছক কাল্পনিক, নিতান্ত অবোধ্য একটি পদার্থের অভাব বোধ কর্‌তে শেখান হয়েছে। সেই পারমার্থিক জিনিষটির নাম পরকালে মুক্তি বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—যা অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়, অভাবনীয়—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

ইহকালে অভাবমোচন অর্থাৎ এর নামান্তর, ভোগ, লালসা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির চরিতার্থের চেষ্টা কর্‌লে পরকালে অনন্ত দুঃখ, নরক ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যপক্ষে ইহকালে সুখে দুঃখে সমজ্ঞান অর্থাৎ কেবল বেঁচে থাকতে হ'লে যে সকল অভাব পূরণ কর্‌তেই হয়, তা' ছাড়া আর যত কিছু অভাবমোচনের চেষ্টা না ক'রে তা'র দুঃখ সয়ে থাকতে পার্‌লে পরকালে মুক্তি। আর ইহকালেও এই মুক্তির

সাধনাই লোকসমাজে শ্রদ্ধা, মান, ভক্তি, পূজা, অর্থ প্রভৃতি সাংসারিক যাবতীয় ভোগ্য লাভের সহজ ও শ্রেষ্ঠতম উপায়।

কিন্তু আমাদের অভাববোধের প্রকৃত ক্ষমতা লোপ পেলেও পূর্ব্বোক্ত আফিমখোরের মত ইদানীং আমাদের মধ্যে বাইরের প্রবল তাড়নায় অতি অল্পমাত্র হুঁস্ অর্থাৎ অভাববোধ জেগেছে ব'লেই না আমরা নামে মাত্র স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ কর্‌তে পেরেছি!

আমাদের অভাববোধ-শক্তি নাশের জন্য আর একটা উপায় অবলম্বিত হ'য়েছিল। অভাবটা এমনই জিনিষ যে, অনেক সাধ্যসাধনায় একটি অভাবমোচন হ'তে না হ'তে, আমরা আরও বৃহত্তর অনেক অভাব অনুভব করি, তাও যদি কোনও প্রকারে পূরণ হয় ত আবার নতুন নতুন অভাব আসে। এই প্রকারে অভাবের শেষ হয় না। এ কথা অতি সত্য। কিন্তু এও অতি সত্য যে, এমন জঙ্গলবাসী মানুষ আদিম অবস্থায় এখনও আছে, যাদের অভাববোধ না থাকাতেই হাজার হাজার বছর প্রায় এক রকম অবস্থাতেই কাটাচ্ছে, ক্রমোন্নতি ব'লে জিনিষটা তাদের মধ্যে সেই জন্যই নেই। আন্দামানবাসীরা এইরূপ একটা জাতি।

পরন্তু অভাবমোচনের চেষ্টাতে যখন সে অভাব দূরীভূত হ'য়ে আবার নতুন নতুন অভাব উত্তরোত্তর বেড়েই যায়, তখন অভাবমোচনের চেষ্টা যে নিতান্ত বৃথা আর মূঢ়তা, তা' আমাদের নীতিবেত্তারা সেই আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত শিখিয়ে আস্‌ছেন। কারণ, অভাববোধেই যত দুঃখ, আর অভাবের বৃদ্ধিতে দুঃখেরও বৃদ্ধি, এই যুক্তিকে আমাদের অভাববোধ নাশ কর্‌তে ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার কর্‌বার জন্য, এর অন্য যে দিক্‌টি অতি যত্নের সহিত আমাদের জ্ঞানের বাইরে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটি হচ্ছে, অভাববোধে দুঃখ যেমন আছে, অভাবপূরণে সুখও

তেমনই আছে। অভাবের বৃদ্ধিতে দুঃখের যেমন বৃদ্ধি, সেই বর্দ্ধিত অভাবের পূরণে সুখেরও তেমনই বৃদ্ধি আছে। দুঃখ বিনা সুখ যদি অসম্ভব হয়, তবে এই দুঃখ সুখেরই প্রজনক। কিন্তু এ সুখ নাকি মর্ত্ত্য, বাস্তব (materialistic) তামসিক সুখ। ভারত নাকি এ সুখ চায় না; কারণ, তা দুঃখেরই উৎপাদক, ক্ষণিক, অলীক ইত্যাদি। ভারত চায় সচ্চিদানন্দ, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

অভাববোধ নাশের তৃতীয় উপায় হচ্ছে—আমরা যা' কিছু করি বা সুখ দুঃখ যত কিছু ভোগ করি, তা আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুযায়ীই ক'রে থাকি—মনে করা। ইহজন্মে আমাদের কর্ম্ম ও সুখ-দুঃখের মাত্রা, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই সৃষ্টিকর্ত্তা নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। হাজার চেষ্টাতে তার একটু মাত্রও পরিবর্ত্তন করা নাকি একেবারে অসম্ভব। সুতরাং আমাদের অভাব দূর করবার চেষ্টা পাগলের অকারণ কষ্ট মাত্র। আর নাকি সেরূপ করাটা ভগবানের সঙ্গে চালাকি করা; কাযেই পাপ। পরজন্মে যদি আমরা আমাদের মঙ্গল চাই, তবে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, যোগ, সাধনা, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা ইত্যাদি, আর বিশেষ ক'রে দান-দক্ষিণা দ্বারাই তা সম্ভব!

চতুর্থ, আমাদের ইহকালের যাবতীয় কর্ম্মের ও সুখ-দুঃখের আর এক নিয়ামক হচ্ছে গ্রহতারাদি। জন্মরাশি-নক্ষত্রাদির অবস্থান অনুযায়ী গ্রহাদি আমাদের শুভ বা অশুভ ফল দেয়; সুতরাং গ্রহাদির বিরুদ্ধে, অভাব পূরণের জন্য মানুষের নিজের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

পঞ্চম, মানুষের স্বভাবের মধ্যে গৌরব বোধ করবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। গৌরব বা যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ভাবী উন্নতির জন্য প্রেরণা দেয়। মাদক দ্রব্যের নেশার মত যশ, নাম, গৌরব বা কীর্ত্তি-জনিত আনন্দেরও উগ্র নেশা আছে, যাতে মানুষ বিভোর হ'তে চায়।

আবার তা অতীব সংক্রামক। কিন্তু যশাকাঙ্ক্ষা উন্নতি বিধায়ক ব'লেই তার অভাববোধ আমাদের নীতি-বেত্তাদের দ্বারা এত দূষ্য। আর অতীত গৌরবও তেমনি আনন্দদায়ক; এরও তেমনি উগ্র নেশা আছে, যা একবার ধর্‌লে ছাড়ান প্রায় অসম্ভব। এটাও তেমনিই সংক্রামক, কিন্তু উন্নতির সবচেয়ে বড় পথ-রোধক। এটা সহজলভ্য, কারণ এ লাভ করতে একটুও নড়তে চড়তে হয় না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেও হয়না। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বা জাতিবিশেষকে অধঃপাতে দিতে হ'লে, অতীত গৌরবের নেশাটি একবার ধরিয়ে দিলেই বস্। আমাদের অভাববোধ-শক্তি-নাশের জন্য এই অব্যর্থ বিষের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। অতীতকে, সম্ভব অসম্ভব, সঙ্গত অসঙ্গত বিচার না ক'রে, মানুষের কল্পনায় যত রকম অদ্ভুত কীর্ত্তির দ্বারা যত অধিক গৌরবান্বিত করা যেতে পারে, তা করা হ'য়েছে। এখন আবার তার ব্যাখ্যা (interpretation) দিয়ে দিন দিন যেমনটি ক'রে তোলা হ'য়েছে, তেমন কীর্ত্তি বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন মানুষের বা মনুষ্য-সম্প্রদায়ের সাধ্য ব'লে ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই আমরা ভবিষ্যৎকে কার্য্যতঃ ছেড়ে দিয়ে অতীত গৌরবের নেশাতেই মস্‌গুল হ'য়ে আছি।

অতীত গৌরবের আর একটা বড়ই অদ্ভুত রহস্য এই যে, অতীতের যে কীর্ত্তির জন্য আমরা সাধারণ লোক গৌরব অনুভব করি ব'লে ভবিষ্যতে নতুন কোন গৌরব অর্জ্জনের কল্পনাও করি না, সেই সকল অতীত গৌরবের কীর্ত্তি ক'রেছিল যা'রা, তারা নিশ্চয় দেশের সাধারণ লোক শূদ্র নয়। তবে সাধারণ লোকের মধ্যে এক আধ জন যারা কিছু করেছিল, তারা শাপভ্রষ্ট, দেবতা, মহাপুরুষ অথবা ভগবান্ লীলা কর্‌বার জন্যই সাধারণের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন ব'লে দাবী করা হয়। এতদ্দ্বারা প্রমাণ করা হ'য়েছে, জনসাধারণ কীর্ত্তি বা গৌরব লাভের অধিকারী নয় অর্থাৎ

তাদের পক্ষে কোনও গৌরবজনক কায করবার আকাঙ্ক্ষা বন্ধ্যার সন্তান কামনারই তুল্য। তার পর পুরাণ-সংহিতাদি-বর্ণিত কোনও কীর্ত্তিমান্ পুরুষকে আদর্শ ক'রে বা তাদের অনুকরণে কোন মহৎ কায সাধনের দ্বারা শূদ্রেরা যে পূজ্য হবে, সে পথও একেবারে বন্ধ। কারণ কর্ম্মের অধিকার-ভেদ আছে, ফলেরও ভেদ আছে। সাধারণের গৌরব অর্জ্জনের পথ যারা বন্ধ করেছে, তাদেরই গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে নিজেদের যশোগৌরবের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হ'য়েছে ব'লে মনে করতে আমরা জন্ম জন্ম অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছি। কাযেই আমরা জনসাধারণ নিজেরা গৌরবজনক কার্য্য ক'রে গৌরব অর্জ্জন করার অভাব বোধ করতে সাহস পাই না।

ষষ্ঠ, জান্‌বার ইচ্ছা মানুষেরই ধর্ম্ম (virtue); জান্‌বার ইচ্ছাতে অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে, তার ফলে সত্য আবিষ্কারের বিমল আনন্দ উপভোগ ক'রে মানুষ ধন্য হয়। একটীর পর একটী এই প্রকার সত্য আবিষ্কার ও উপলব্ধি করবার ফলে মানুষের জ্ঞান বেড়ে যায়, সেই সঙ্গে আনন্দও বাড়ে, তা'তে মনুষ্য-জীবন সার্থক হয়। এরূপ জ্ঞানই আমাদের অভাব পূরণের সহায় হ'তে পারে জেনে জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যে অনুসন্ধিৎসা, তা' একেবারে যাতে জন্মাতে না পারে, তার অমোঘ উপায় অবলম্বিত হ'য়েছিল।

সন্দেহ থেকে অনুসন্ধিৎসার উৎপত্তি হয় ব'লে সন্দেহবাদকে যেমন অতি ভীষণ ব'লে লোক-মতে নিন্দিত করা হ'য়েছে, ভক্তি থেকে অন্ধ বিশ্বাস বা অন্ধতার উদ্ভব হয় ব'লে ভক্তিবাদকে তেমনি লোক-মতে অতি মহিমান্বিত করা হয়েছে। যেমন সাধারণ লোককে বিশ্বাস করান হয়েছে যে, স্বয়ং ভগবান্ থেকে আরম্ভ ক'রে দেবতা ঋষি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বজ্ঞ; তাঁদের প্রণীত (স্ববিরোধী বা পরস্পর বিরোধী) সমস্ত শাস্ত্র অভ্রান্ত; সাধারণ লোকের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের যত সব জ্ঞান বা সত্য এই সকল শাস্ত্রে নিবদ্ধ; আর এই সকল শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন ক'রে,সত্যজ্ঞান আহরণ করার দায় থেকে আমাদের মুক্তি দেয়ার জন্যই, শাস্ত্রের সত্য প্রচারের ভার পুরোহিতদের ওপর অর্পিত। কাযেই আমাদের কোন কিছু জানবার প্রবৃত্তি গজাবার পূর্ব্বেই, এমন ভাবে পুরোহিতরা আমাদের জ্ঞান (dogma) দিয়ে রেখেছিলেন (এখনও রেখেছেন) যে, আমাদের কোন কিছু নতুন করে জানবার অভাব বোধই হয় না। তার পর ঐ সকল শাস্ত্রে আমাদের সকল রকম কর্ত্তব্য আর অকর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে। নিজের কর্ত্তব্য নিজ জ্ঞানের সাহায্যে নিজে খুঁজে যদি নিই, আর, যদি ঐ সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়, তা' হলেই মহাপাপ করা হয়, আর শাস্ত্র বা ধর্ম্মদ্রোহী ব'লে বিবেচিতও হ'তে হয়। এই প্রকারে নিজের বিচার বুদ্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত কর্ত্তব্যপালন-জনিত আত্মপ্রসাদ লাভের অভাব জনসাধারণ যাতে কখনও অনুভব না করে, শাস্ত্রে তার অসংখ্য প্রকার ব্যবস্থা আছে। পরম ভক্তি সহকারে সেই সকল ব্যবস্থা অন্ধভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেই আমাদের বিচারবুদ্ধি (conscience) একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।

সপ্তম, জগৎ যে প্রপঞ্চ, মিথ্যা, তা' ঘট, পট, সর্প, রজ্জু প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ উপমাদ্বারা প্রমাণ করে ফেলা হয়েছে। কাজেই জাগতিক অভাব, তার দুঃখানুভূতি, তার পূরণে সুখানুভূতি, সবই অলীক, প্রপঞ্চ, ভ্রান্তি। আমাদের অভাব-বোধ-শক্তি নাশের জন্য বা জীবনের যাবতীয় ঐহিক ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট, অজ্ঞ ক'রে রাখবার এও একটি পাশুপত অস্ত্র।

এই অভাব-বোধ-শক্তি নাশের যে সকল অসংখ্য উপায় অবলম্বিত হ'য়েছিল ও হ'য়ে আসছে তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল। এইগুলিই—আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করবার পক্ষে বোধ হয়

যথেষ্ট। এখন দেখা যাক্ কেন এই অভাব-বোধ-শক্তি নষ্ট করা হ'য়েছিল।

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে জেতা ও বিজিতের মধ্যেকার সম্বন্ধটার সার মর্ম্মটি এই যে, যুদ্ধে জয়লাভের পর জেতা অব্যক্ত ভাষায় বলে :—

"বিজিত, তোমার প্রাণটি আমার মুঠোর মধ্যে। আমি ইচ্ছে কর্‌লে তোমায় রাখতেও পারি মারতেও পারি। তুমি কি চাও?"

বিজিত উত্তরে বলে :—

"প্রভু, মরতে ভয় করি বলেইত পরাজিত হয়েও বেঁচে আছি। এখন কোন রকমে বাঁচতে দাও।"

জেতা—"তুমি বেঁচে থাকলে আমার সুখ ও সুবিধে যদি হয়, অর্থাৎ আমার দাস হওয়ার যোগ্য ব'লে যদি মনে করি, তবেই তোমাকে এই সর্ত্তে বাঁচতে দিতে পারি যে, তোমার অস্তিত্বের দ্বারা আমার যে স্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে—তা থেকে আমায় বঞ্চিত করতে, আমার অধীনতা থেকে মুক্ত হতে অথবা আমায় উল্টে পরাজিত করতে যে কোন শক্তি বা উন্নতির আবশ্যক তার আকাঙ্খা পর্য্যন্ত করতে তোমায় দোব না।"

তাই এক জাতি অন্য জাতিকে অথবা এক সম্প্রদায় ভিন্ন সম্প্রদায়কে যখন চিরকাল অধীন ক'রে রাখতে চেয়েছে, এমন কি, চির ক্রীতদাসে পরিণত কর্‌তে চেয়েছে তখন ভবিষ্যতে যাতে সেই অধীন জাতি কখনও স্বাধীন হতে না' পারে, তার জন্য তাদের স্বাধীনতা লাভের সকল পথ রুদ্ধ কর্‌তে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। এইরূপে চির অধীন ক'রে রাখবার অবলম্বিত পথ অনেকগুলি। তার মধ্যে অধীনস্থ জাতির অভাব-বোধ-শক্তির নাশই অব্যর্থ। এর দ্বারা অধীনস্থ জাতিকে অর্থাৎ বিজিতকে পুরুষানুক্রমে চিরদাসে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধিলাভ ক'রেছে

তা' আমাদের ভারতে যেমনটি প্রতিপাদিত হয়েছে, বোধ হয়, তেমনটি আর কোথাও হয় নি।

সনাতন ভারতে আর্য্যরাই জেতা আর শূদ্র এবং শূদ্রেতর নামে অভিহিত জনসাধারণ বিজিত। অবশ্য আর্য্য সম্প্রদায়ের অনেকে, ব্যক্তিগতভাবে কোন বেগতিকে প'ড়ে শূদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত হ'য়েছিল। আর শূদ্র-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকে ব্যক্তিগতভাবে কোন গতিকে বা কোন কারণে শূদ্রসম্প্রদায় থেকে ডিগবাজী খেয়ে আর্য্যদের দলে কচিৎ মিশেছে, এখন বরং অধিক পরিমাণে মিশ্‌ছে। একালের ভদ্র নামধারীরা সে কালের আর্য্য সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী ব'লে দাবী করেন; আর জনসাধারণ তথাকথিত ভদ্রলোকদের দ্বারা কখনও কখনও মুখ ফুটে (আর সর্ব্বদা মনে মনে) ইতর বা অন্ত্যজ ব'লেই বিবেচিত হয়।

নিম্ন সম্প্রদায় উচ্চ সম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যায় নেহাৎ অধিক ব'লে বহুকাল যাবৎ বৃহত্তর সংখ্যার অভাববোধশক্তি নাশ কর্‌বার চেষ্টায় যে ফাঁদ পাতা হ'য়েছিল, সেই ফাঁদে অবশেষে অল্পসংখ্যক ভদ্রলোকেরাও প'ড়েছেন। তা'র মানে ভদ্রলোকদেরও অভাববোধ-শক্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে। বর্ত্তমানে অন্য এক বিদেশী জেতার চেষ্টায়, অতি মন্থর গতিতে অথচ বেহুঁসে, কোন কোন বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অভাব বোধ কর্‌তে আমরা আরম্ভ ক'রেছি। অথচ তারাও সর্ব্বকালের সকল জেতাদের মতই আমাদিগকে অধীন ক'রে রাখতে চায়। কারণ, আমাদের সংখ্যা এত বেশী যে, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতির অধিবাসীর মত সংখ্যা হ্রাস বা নাশ করা সম্ভব নয়; বিশেষতঃ ভারত তা'দের উপনিবেশের যোগ্য নয় ব'লে ভারতবাসীর একটু আধটু অভাববোধ-শক্তির প্রশ্রয় না দিলে তা'দের সাম্রাজ্য অধিকারের প্রধানতম উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা স্বদেশবাসীর ধনসম্পদবৃদ্ধির পথ সুগম করাই সেই

উদ্দেশ্য। আমরা অভাব বোধ না করলে তা'দের পণ্য বিক্রীত হয় না। ধনের দ্বারাই যে' সকল অভাব দূর করা যেতে পারে, এ কথা তা'রা ধ্রুব সত্য ব'লে জেনে ফেলেছে, এবং এও জেনে ফেলেছে যে, যত দিন সনাতন ধর্ম্মের পূণ্যে, ভারতের উচ্চনীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে কুমুরে পোকা আর আরশুলার সম্বন্ধ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, তত দিন ভারতের সাধারণ লোকের স্বাধীনতার অভাববোধ যথাযথরূপে পুনরুদ্দীপিত হ'বে না। আর ততদিন ৩২ কোটি উৎপাদনে-অক্ষম-ক্রেতা-সমন্বিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বাজার তা'দের হাতছাড়া হ'বে না।

পরিশেষে অভাববোধশক্তি হারিয়ে আমরা চিন্তায় আর কাযে এমনই শ্রমকাতর হ'য়ে পড়েছি যে, "পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাওয়া" আমাদের সুখের আদর্শ হ'য়েছে। তা'র পরিণামে নতুন কিছু করবার প্রবৃত্তি (innovation) আমরা হারিয়ে ভূতপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছি। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কার্য্যপ্রবণতা হারিয়ে শাস্ত্র, লোকাচার, গুরু বা নেতার অন্ধ অনুকরণ বা অনুগমন ক'রে ধন্য হচ্ছি। অন্য রকম অনুকরণের আতঙ্ক এমনই বেড়ে উঠেছে যে, বিদেশী কিংবা বিধর্ম্মীর কাছ থেকে, যুক্তিসঙ্গত নতুন কোন কিছু সত্য এবং তথ্য আবশ্যক ব'লে জেনেও যদি শিখি তবে জাতীয়তা গেল, ভারতের বৈশিষ্ট্য গেল ব'লে আঁৎকে উঠ্তে দেখি; অথচ দেশে এক আধ শতাব্দী বা তা'রও পূর্ব্বে যা অন্যের নিকট থেকে অনুকৃত হ'য়েছিল, তা' নেহাৎ অন্যায়, যুক্তিবিরুদ্ধ, অনিষ্টকর জেনেও অন্ধভাবে অনুকরণ করলে, এমন কি তা' আমাদের মানবতার পরিপন্থী হ'লেও, জাতীয়তাতে একটুও বাধে না, বরং তা'তে জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য, প্রাণ, ভিতরকার বস্তু—আরও কত কি রক্ষিত হয়। এইরূপে নতুনত্ব গ্রহণের পথ রুদ্ধ ক'রে আমরা এখনও কূপমণ্ডুক হ'য়ে আছি।

তা'র ফলে, চিন্তায়, কাযে, বচনে, চলনে, সমস্ত বিষয়ে কেবল লীলাই প্রকট ক'র্‌ছি। এই লীলা যত দিন প্রকট হ'তে থাক্‌বে, ততদিন আমাদের গুপ্ত সমিতির আদর্শ কেন, যে কোন মহান্ আদর্শ গ্রহণ কর্‌তে আমরা অক্ষম হবই।

এক জন মহাপুরুষের নিকট এই লীলা শব্দের যা' ব্যাখ্যা শুনেছিলাম, তা' ব'লে এই পরিচ্ছেদ শেষ করি। যা' সঙ্গত নয়, যা'র কোন অর্থ হয় না, যা' রুচিবিরুদ্ধ, যা' অনিষ্টকর, যা নীতিবিরুদ্ধ, তা' যদি এমন কোন বিশেষ লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় যে, তাঁ'র প্রতি পরম ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ভাবের উদ্রেক লোভনীয় না হয়, অর্থাৎ তাঁ'র ঐ প্রকার কাযের জন্য নিন্দা করা লোকমতের বিরুদ্ধ হয়, তা' হ'লে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে লীলা বলা যেতে পারে। নানা ভাষায় অভিজ্ঞ এই পণ্ডিতজী এও বলেছিলেন যে, এমন শব্দ নাকি আর কোনও ভাষায় নাই। এমন লীলাও বুঝি বা কোন দেশে প্রকট হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধার

বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের চেষ্টা বিশেষ ক'রে আরব্ধ হ'য়েছিল, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। ত'ার কিছু পূর্ব্ব থেকে মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতি গঠিত হ'য়েছিল ব'লে শুনেছি। কিন্তু ত'ার আদর্শ নাকি এমন উন্নত ছিল না। যাই হোক্, মহারাষ্ট্র গুপ্ত সমিতি ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন ছিল না। বাংলা দেশে গুপ্ত সমিতি গঠন সুরু করবার আগে, শুনেছি 'ক'বাবু নাকি মারাঠা গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশে তিনি যে গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, ত'ার পত্তন থেকে দু'বছর যাবৎ তিনি নিজে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করতেন না, আর দীক্ষা-কালীন গীতা স্পর্শ করা ছাড়া সমিতির কাযে বা ভাবে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না। যদি 'ক'বাবু নেহাৎ থিওরিটিক্যাল না হ'তেন, অথবা তঁা'র থিওরি কাযে পরিণত করবার জন্য এক জন যোগ্য কর্ম্মী জুটত, তা' হ'লে এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-বিহীন গুপ্তসমিতির কাযের ঠিকমত প্রসার আরও হয় ত বাড়্‌ত। কিন্তু তা' না হ'য়ে যখন বারীণের গ্রেষ্ট্রীটের আড্ডা ভেঙ্গে গেল, তখন 'ক'বাবু হতাশ হ'য়ে পড়্‌লেন।

অন্য নেতাদের মধ্যে দেবব্রত বাবু বিশেষ ক'রে আগে হ'তে ধর্ম্মচর্চ্চা করছিলেন। ভারত যে ধর্ম্মের দেশ, ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে ব্যতীত কোন নতুন ভাব এ দেশ গ্রহণ করতে পারে না, এই ধারণা আমাদের দেশে খুব সাধারণ হ'লেও, 'ক'বাবুকে কিন্তু অনেক দিন থেকে তা' ধরাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন দেবব্রত বাবু। সিদ্ধ-যোগী, সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক

শক্তি সম্বন্ধে দেবব্রত বাবুর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তা'র থেকেও বেশী ছিল তাঁ'র অন্যকে বিশ্বাস করাবার শক্তি।

'ক'বাবু স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের বিফলতাতে নিজের কিংবা সহনেতা বা সহকারী নেতাদের কোন ত্রুটী নিশ্চয় দেখ্‌তে পাননি। কাযেই তাঁর পক্ষে ধ'রে নেওয়া সহজ হ'য়েছিল যে, এ দেশবাসীকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা, কোন প্রকার লৌকিক শক্তির কর্ম্ম নয়। অথচ এ দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াবার ইচ্ছাটা তাঁর ছিল পূরো-পুরি। মনের যখন এই রকম অবস্থা (temperament), তখন দেবব্রত বাবুর তথাকথিত, সিদ্ধযোগীদের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও নির্ভর করা ছাড়া 'ক'বাবুর গত্যন্তর ছিল না। এই অলৌকিক শক্তির দ্বারা এত বাড়াবাড়ি আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর্‌তে হ'লে নিজেকে ঐ রকম শক্তিশালী কর্‌তে অথবা ঐরূপ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজে বার কর্‌তে হ'ত। প্রথমে তৈরী, অর্থাৎ ready-made, শক্তিধারী খুঁজে বার কর্‌বার জন্যই কিন্তু 'ক'বাবু বাংলা হ'তে স্থানান্তরে গেলেন। অন্য নেতারা তা'তে সম্ভবতঃ সায় দিয়েছিলেন বা অন্ততঃপক্ষে কোন প্রতিবাদ করেন নি। তখন কিন্তু তাঁরা বা খোদ 'ক'বাবু নিশ্চয় জান্‌তেন না যে, উপায় একদিন উদ্দেশ্যে পরিণত হ'তে পারে।

যাই হোক, এই অলৌকিক বা দৈবশক্তি অর্থাৎ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ভারতের সনাতন সভ্যতা ও ধর্ম্মের উদ্ধার জন্য দেশ স্বাধীন কর্‌বার চেষ্টাকে, "ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধার" ব'লে অভিহিত করা হ'য়েছে।

এই রকম উদ্ধারের প্রণালীটা কিন্তু হুবহু 'আনন্দমঠ' থেকে নেওয়া হ'য়েছিল। আংশিকভাবে তা'র সামান্য একটুখানি নমুনা দিই। 'আনন্দ-মঠের' এক স্থানে বন্দী অবস্থায় সত্যানন্দ মুসলমান সরকারের জেলের মধ্যে মহেন্দ্রকে ব'লেছিলেন, সেদিন দুপুর রাত্তিরে তাঁ'রা জেল থেকে মুক্ত

হবেন। নিজে পূর্ব্বে তা'র ব্যবস্থা ক'রেও খালি অলৌকিক শক্তি-দেখাবার জন্তই যে ইচ্ছা ক'রে তিনি মহেন্দ্রকে তা জানান নি, এ কথা ধ'রে নিতে পারা যায়। পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত নির্দ্দিষ্ট সময় অবাধে যখন তাঁ'রা জেল থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছিলেন, তখন মহেন্দ্রের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। এহেন অকাট্য প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে, সত্যানন্দ যে এক জন দৈবশক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ, আর সেই শক্তি যে তিনি ধর্ম্ম-সাধনাদ্বারাই পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে মহেন্দ্রের আর কোন সংশয় থাক্‌ল না।

আনন্দমঠের অনুকরণে এই রকম ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্‌বার মত আর সকলই তখন বাংলা দেশে সহজলভ্য ছিল। কিন্তু ছিলনা কেবল দুটি মানুষ; সত্যানন্দের মত এক জন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা-কারী, সন্ন্যাসী নেতা, আর তাঁ'র ত্রিকালজ্ঞ গুরুর মত এক জন, যিনি অসম্ভবকে সম্ভব কর্‌তে পারেন, অর্থাৎ, আমগাছে কুষ্মাণ্ড আর শালগাছে কদলী ফলাতে পারেন। এই কথাগুলি আমার মনগড়া রসিকতা নয়। সত্য সত্যই এই রকম গুরু খুঁজ্‌তে অনেকবার অনুসন্ধানকারী দল (Expeditionary party) বেরিয়েছিল।

খুঁজে নিতে পার্‌লে যে এমন অলৌকিককর্ম্মা সিদ্ধপুরুষ পাওয়া যায়, 'ক'বাবুকে এ ধারণাও সম্ভবতঃ দেবব্রত বাবুই করিয়ে দিয়ে ছিলেন। দেবব্রত বাবুর কাছে এমন সাধু সন্ন্যাসীর কথা অনেকবার শুনেছি। এঁ'রা নাকি বাংলার বাইরে নেপাল, বিন্ধ্যাচল, গুজরাট্‌ প্রভৃতি স্থানে থাকেন। এই রকম এক জন খুঁজে এনে তাঁ'র কাছে দীক্ষা নিয়ে, প্রথমে 'ক'বাবু বোধ হয় নিজে সত্যানন্দের পালা অভিনয় কর্‌বেন, মনস্থ করেছিলেন।

অসম্ভবকে কোনও অলৌকিক উপায়ে যে না সম্ভব কর্‌তে পারে, তা'র দ্বারা যে ভারত উদ্ধার হ'তে পারে না, এ কথা মেনে নেওয়া আমাদের

মত সামান্য প্রাণীর পক্ষে নেহাৎ অন্যায় নাও হ'তে পারত। কিন্তু 'ক'বাবুর মত অত বড় অভিজ্ঞ নেতাদের পক্ষে একথা বলা আদৌ চলেনা। কারণ, দেশের জনসাধারণ যে নিতান্ত অন্ধ-বিশ্বাস-পরায়ণ এবং অজ্ঞ, তা এঁরা বিলক্ষণ জান্‌তেন। শুধু রাষ্ট্রনৈতিক অধীনতা কেন, আমাদের সকল দুর্ভাগ্যের বা অধীনতার একটী প্রধান কারণ যে অন্ধ-বিশ্বাস-পরায়ণতা ও অজ্ঞতা, এঁরা তাও জান্‌তেন। দেশের জনসাধারণকে এই দু'টো অভিসম্পাৎ থেকে যতটুকু উদ্ধার কর্‌লে অন্ততঃপক্ষে স্বাধীনতা শব্দের মানেও তারা বুঝতে পারত, ততটুকু উদ্ধার না ক'রে দেশটাকে স্বাধীন করার মানে যে কি, তা' এঁরা বুঝতেন না বল্লে এঁদের নেহাৎ হীন ব'লে মনে করা হয়।

কিন্তু এত সব জানা সত্ত্বেও যে, এঁরা অন্ধ-বিশ্বাস-পরায়ণতার পোষক সেই অলৌকিক শক্তিরূপ মরীচিকার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন কেন, তা'র কারণ হচ্ছে, এঁরা বড় বেশী ক'রে জেনে ফেলেছিলেন যে, ভারতের মত দেশকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হ'লে, অতি বড় লৌকিক শক্তিসম্পন্ন নেতার পক্ষেও এক জীবনে সাফল্য লাভ করা কত কঠিন ও কত সুদূরপরাহত। এঁরা চেয়েছিলেন সহজে কায সার্‌তে, দু'পাঁচ বছরে নিজ কর্ম্মের সুফল ভোগ কর্‌তে, অবতারের পূজা পেতে, দেশের কোটি কণ্ঠে নিজ নামের জয়ধ্বনি শুন্‌তে; আর চেয়েছিলেন, এঁদের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে চোখ বুজে প্রাণ দেওয়াতে।

অনেকেই জানেন অসভ্য আদিম-নিবাসীদের মধ্যে ধূর্ত্ত ওঝা বা গুণিন্‌রা (medicine men) নিজেদের ধূর্ত্তামি ঢাক্‌বার এবং অজ্ঞ লোকের মনে ভয়, ভক্তি, গুণমুগ্ধতা ইত্যাদি উদ্রেক করবার জন্য যেমন দেবদেবীর দোহাই দিয়ে, অবোধ্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান এবং অর্থহীন মন্ত্রাদির উচ্চারণ ক'রে থাকে, আর তাতে ক'রে পূজা ও নির্য্যাতনপ্রিয় দেবদেবী

এবং ভূত-প্রেতরা তা'দের আজ্ঞাকারী মনে ক'রে, সাধারণ অজ্ঞলোক যেমন সেই ভূতপ্রেতাদির নির্য্যাতন থেকে অব্যাহতি বা তা'দের অনুকম্পা-লাভের জন্য ঐ গুণিনদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হ'য়ে, তা'দের সকল আবদার পূরণ করে, তেমনি অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, তা'র হরেক-রকম ব্যাখ্যা, আর দেবদেবী বা স্বয়ং ভগবানের নামে আদেশাদি প্রচার দ্বারা, অজ্ঞ লোককে, যে কোন দুরূহ বা অসঙ্গত কাযে নির্ব্বিচারে আজ্ঞানুবর্ত্তী করা খুব সহজসাধ্য ও অল্প সময়সাক্ষেপ হয় ব'লে, জগতে অনেকবার অনেক লীলাময় নেতা (demagogues) নিজেদের অতিমানুষ ব'লে জাহির করেছেন, তদনুযায়ী লোকপূজা পেয়েছেন, আর অনেক রকম কীর্ত্তি রেখে গেছেন এবং এখনও যেখানে ধর্ম্মের গোঁড়ামী বর্ত্তমান, সেখানে লীলা প্রকট করছেন। আমাদের নেতাদের এই অলৌকিক শক্তিশালী গুরু খোঁজা বা ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধার, উল্লিখিত ওঝামীর বিংশ শতাব্দীর উপযোগী উন্নততর সংস্করণ কি না, এ সন্দেহের ভাব এ দেশে আজকাল কদাচিৎ দেখা দিলেও আমাদের দেশবাসী, চিরকাল এত অধিক পরিমাণে অন্ধবিশ্বাস-পরায়ণ যে, সন্দেহবাদ (Scepticism) যতটুকু প্রবল হ'লে সত্য নির্দ্ধারণের জন্য একটুও অনুসন্ধিৎসা জাগতে পারত, কোনও বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ততটুকু প্রবল কখনও হ'তে পারে নি। এখনও যে তেমন প্রবল আকার ধারণ করবে, তা'র কোন আশাও নেই। তা'র কারণ, ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ করাটা যে সব চেয়ে ঘৃণিত পাপ, তা' আমাদের আবহমানকাল সব চেয়ে বেশী ক'রে শেখান হ'য়েছে, এখনও হচ্ছে। আর সকল শিক্ষার ভিত্তি গাড়া হয়েছে ভক্তিবাদের ওপর, তাই যুক্তিবাদ বা চিন্তার স্বাধীনতা ঘৃণ্য ; তাই গতানুগতিকতা বা গড্ডলিকাপ্রবাহ আমাদের স্বভাবে পরিণত হ'য়েছে ; তাই প্রকারান্তরে

এই গড্ডলিকাপ্রবাহের নাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, constructive method (গঠন নীতি); আর এর উল্টো যা' কিছু, তাই নাকি destructive method (ধ্বংসনীতি)।

দেশে লোকমতে, কোনও বিষয় নির্ব্বিচারে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য করাবার জন্য আমাদের মধ্যে কতকগুলি শব্দ অধুনা প্রচলিত করা হ'য়েছে, যা'র উক্তিতে লোকমত মন্ত্রমুগ্ধবৎ অন্ধভাবে চালিত হচ্ছে। সেই যাদুপ্রভাব-বিশিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে destructive শব্দটির প্রভাব অতীব সাংঘাতিক। এই শব্দটি শুধু সন্দেহবাদ নয়, যে কোন বিষয়ে ঠেকিয়ে দিলেই, তা লোকমতে ভীষণ ঘৃণ্য, কাযেই বর্জ্জনীয় হয়ে থাকে।

এখানে এ'ও উল্লেখযোগ্য যে, কেবল একটা বিষয়ে, ঠিকমত না হ'লেও, আমাদের মধ্যে কতকটা সন্দেহের ভাব বদ্ধমূল হ'য়েছে। সে সন্দেহটা এই যে, বৃটিশরাজ আমাদের হিত করবার জন্যই ভারত শাসন করছেন, না স্বজাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য? একথা পূর্ব্বে বিশেষ করে লিখেছি।

যাই হোক্, এ দেশে অন্য সকল বিষয়ে সন্দেহবাদকে ঐরূপে মেরে রাখা হয়েছে ব'লে নেতাদের দূরদর্শিতা অর্জ্জন বা পরিণামচিন্তা করবার প্রয়োজনই হয় না। অন্য দেশে, নেতারা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অনুগমন-কারীদের পাছে ভুলপথে নিয়ে যায়, এই সন্দেহ উত্তেজনা বা হুজুগের মধ্যে'ও ফুটে ওঠে। তা'র পর সন্দেহের কারণ পেলে, সে নেতার পরিণাম যে কি রকম মারাত্মক হয়, যাঁরা অন্য দেশের সম্যক্ খবর রাখেন, তাঁ'রাই জানেন। কিন্তু আমাদের দেশে কোনও আদর্শের নেতারা যখনই কোন ভুল ক'রেছেন বা তাঁ'দের নেতৃত্বের ফলে যখনই কোন অঘটন ঘটেছে, তখনই তাঁ'দের সেই ভুল বা অঘটন ব্যাপারটাকে পূর্ব্ববর্ণিত লীলা ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে. আর জনসাধারণও পরম ভক্তি ও সন্তোষসহকারে তা' মেনে নিয়েছে। লীলা না করলে যখন অবতার ব'লে গ্রাহ্য হওয়াই শাস্ত্র-

বিরুদ্ধ, তখন সেই অপরিমাণদর্শী নেতা, তাঁ'র লীলার মাত্রা অনুযায়ী, খণ্ড বা অখণ্ড অবতার ব'লে, পুরাকালের কথা ছেড়ে দিলে, এ কালেও লোকপূজা পাচ্ছেন ; তাই অপরিণামদর্শিতাই যেন আমাদের নেতাদের সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ হ'য়েছে। আর ধর্ম্মের গোঁড়ামী দেখিয়ে যেমন ক'রে হোক, একবার কোন রকমে নেতা অথবা গুরু ব'লে জাহির হ'তে পারলেই, জনসাধারণের নিকট তিনি চিরকালের জন্য সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের অতীত। দেশ উদ্ধারের কেন, যে কোনও আদর্শের চাইতে অবতারত্ব বা Popularity লাভটাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য করা এ দেশে নেতৃত্বের নিত্য-ধর্ম্ম। তাই আমাদের 'ক'-বাবু শুধু নয়, সকল ধর্ম্মপন্থী নেতারাই ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে, স্বদেশ উদ্ধারের পরিণাম কি, তা' ভাব্‌বার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

ধর্ম্মকে স্বদেশ উদ্ধারের একমাত্র পন্থা ব'লে গ্রহণ কর্‌লে যে দু'টি ঘোর সমস্যা ইংরেজের কবল থেকে ভারত উদ্ধারের পথে হিমাচলসদৃশ অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় না হয়ে যায় না, সে দু'টি, 'ক' বাবু ও অন্য নেতাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হয় নি, এ কথা জোর ক'রে বল্‌তে না পারলেও, এর গুরুত্ব যে তাঁরা উপলব্ধি কর্‌তে পারেন নি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

প্রথম, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা ;* দ্বিতীয়, অভিজাত-ইতর অর্থাৎ হিন্দুর উচ্চ নীচ জাত (Caste) সমস্যা।

ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধার চেষ্টা সুরু হবার পর একদিন গুপ্ত সমিতির এক মজলিসে, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে, তিন চার জন বড় বড় নেতারা যে সকল মত প্রকাশ করেছিলেন, সে সব কথা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। তবে এ সমস্যা সমাধানের মত

* ১৯২৩ সালের অক্টোবরে লিখিত। তখন তুর্কীর খালিফা বিতাড়িত হন নি।

প্রকার মতলব খুঁজে বা'র করবার চেষ্টা হ'য়েছিল, তা'র মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত ও সহজ ব'লে তখন গৃহীত হ'য়েছিল, সেটা হচ্ছে, এই যে, মুসলমানগণ যদি এই বিপ্লবে যোগ দেয়, তবে ভালই; দেশ স্বাধীন হ'লে, তা'দের সাহায্যের পরিমাণ অনুযায়ী অধিকার তাদের দেওয়া যাবে, আর যদি তা' না ক'রে, তা'দিগকে শত্রু অর্থাৎ ইংরেজের সামিল ব'লে গণ্য করা হ'বে। এ প্রকার সমাধানের কল্পনাও যে, নিতান্ত চিন্তা-হীনতার পরিচায়ক, তা' বলা বাহুল্য। কারণ, এই রকম জাঁক বরং মুসলমানগণই করলেও করতে পারত।

একেই ত এই সমস্যার, অন্ততঃ সুশীল মনকে সুবোধ করবার মত সমাধানের সঙ্গত পথ খুঁজে বা'র করা চিন্তারও অতীত, তা'র ওপর ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে ভারত উদ্ধারের খেয়াল, অবিকৃত মস্তিষ্কে কি ক'রে এসেছিল, তাই ভেবে এখন আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়ে ভারত উদ্ধারের মানে যে হিন্দুধর্ম্মের তরফে ভারত উদ্ধার, এ সহজ কথা মুসলমান ভায়াদের বুঝিয়ে দিতে হয় না; পরন্তু এ তাঁ'দের আঁতে যে কি রকম ঘা দেয়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। এতে মুসলমানগণ এ আন্দোলনে যে কেবল যোগ দিতে বিরত থাকতে পারেন, তা' নয়, তাঁ'রা ইংরেজের অপেক্ষাও হিন্দুদের প্রবল শত্রু না হয়ে পারেন না। কারণ ইংরেজের বদলে হিন্দুদের অধীন হওয়ার ধারণা করাও তাঁদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় যদি মুসলমান নেতারা সুলতান অথবা আমীরের ওপর নির্ভরতাই ইংরেজের অধীনতা থেকে ভারত উদ্ধারের একমাত্র উপায় ব'লে মনে ক'রে থাকেন, অথবা প্যান-ইস্‌লামিক আন্দোলনে ঐরূপ কোন মতলবে যোগ দিয়ে থাকেন, তবে তা' নিশ্চয় বিশেষ কিছু অন্যায় ক'রেছেন বলে বলা যায় না।

যদি তর্কের খাতিরে ধ'রেই নেওয়া যায় যে, ইংরেজের গ্রাস থেকে, ভারত কেড়ে নেয়াতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমান স্বার্থ আছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থের মিলন হওয়া সঙ্গত। কিন্তু যেখানে উভয়ের মধ্যে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, সেখানে কোন প্রকার কায চালানগোছ মিলনও যে অসম্ভব, এ কথা অস্বীকার যা'রা করে, তা'রা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনাই ক'রে থাকে।

কোন ধর্ম্মের আত্মরক্ষার অব্যর্থ উপায় হচ্ছে,—অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণতা জাগান। যে ধর্ম্ম তা'র ভাবসম্পদের আকর্ষণে অপরকে আকৃষ্ট করতে ও নিজ ধর্ম্মাবলম্বীদের ধ'রে রাখ্‌তে যত অপারক, সে ধর্ম্ম আত্মরক্ষার জন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়াবার ও তা' জাগিয়ে রাখবার, তত অধিক হীন উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। আমাদের বর্ত্তমান 'সনাতন' হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে কম করে নি। কারণ, হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ নাই, বর্জ্জন আছে। কাযেই আত্মরক্ষার খাতিরে হিন্দু, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মানুষকে এতদূর ঘৃণা ও বিদ্বেষ করতে শিক্ষিত হ'য়েছে যে, কোন জন্তু-জানোয়ারকেও তেমন করতে পারে না।

যদি ধ'রেও নেওয়া যায় যে, কোন গতিকে উক্ত দুই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ঘুচে গেল, তা' হ'লেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যক্তিগতভাবে কি সাম্প্রদায়িকভাবে গুণমুগ্ধতা উৎপন্ন হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। তখন অকৃত্রিম গুণমুগ্ধতা হ'তেই বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি স্থায়ী মিলনের বীজ উপ্ত হ'বেই। তখনই শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও যৌন আদান-প্রদান ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণশীল নয় ব'লেই তাতে হিন্দুরই সংখ্যা হ্রাস ও সেই সঙ্গে নাশ অনিবার্য্য। অথচ হিন্দুধর্ম্মকে গ্রহণশীল করাও প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব,

অথবা কোন প্রকারে সম্ভব হ'লেও হিন্দু জাত (caste)-ভেদ প্রথার আবর্ত্তনে তা' কেবল বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হ'তে বাধ্য, অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্ম হ'তে যা'রা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হবে, তাদের স্থান কোথায়? এখানে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সমস্যা এসে পড়ে। হিন্দু সমাজের জাত (caste)-বিভাগ একেবারে লোপ ক'রে ব্রাহ্মণ হ'তে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল বর্ণকে এক কর্‌তে পার্‌লে তবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বাইরের লোক আনা সম্ভব হ'তে পারে। তাতে কিন্তু হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ জাত-ভেদই হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন; কাযেই সেরূপ আশা করা একেবারেই বৃথা। জাত (caste)-প্রথা বর্ত্তমান থাকৃতে হিন্দুধর্ম্মকে গ্রহণশীল কর্‌লে নতুন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের একটি এমন জাতে (caste) পরিণত হ'তে হয় যে, সে জাত এক দেশে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাস ক'রে নিরন্তর হিন্দুর দ্বারা, সব চেয়ে নিম্নস্তরের পতিত হিন্দু ব'লে, যেমন সকরুণভাবে ঘৃণিত হ'তে থাক্‌বে, মুসলমানদের দ্বারাও সেইরূপ নিদারুণ-ভাবে নির্য্যাতিত ও ঘৃণিত হ'তে বাধ্য হবে।

ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিহার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব কর্‌তে হ'লে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে যুক্তিবাদের ওপর প্রাধান্য দিতে হয়, আর দেশাত্মবোধকে ধর্ম্মের স্থানে বসিয়ে, ধর্ম্মকে অন্দরমহলে পাঠাতে হয়। কারণ, যুক্তির তাপালোকে ধর্ম্মের কুজ্ঝটিকা আপনা হ'তেই উধাও হ'য়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু তা' আমাদের নেতাদের প্রাণে ত সইবে না! কারণ, তাঁ'রা তথা-কথিত অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে মনে করেন, আর আভিজাত্য ধর্ম্মের দ্বারা সংরক্ষিত। এই জন্য অভিজাত-সম্প্রদায়-সুলভ মনোভাববিশিষ্ট নেতাদের দ্বারা দেশ উদ্ধার ব্যাপারটা "বিড়াল মেকুর" প্রহসনের অভিনয় মাত্র।

পরন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য পূর্ব্বকালে ধর্ম্মই একমাত্র উপায় ব'লে গৃহীত হ'ত; অর্থাৎ ধর্ম্মকে লোকশাসনের যন্ত্রস্বরূপ ক'রে একধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের (ইতর জনসাধারণের) মনুষ্যত্ব নাশের দ্বারা ক্ষুদ্রতর অভিজাত-শাসক-সম্প্রদায়ের এক প্রকার তথা-কথিত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় ত বা হ'ত। শুধু ভারতের নয়, সকল দেশের তথা-কথিত প্রাচীন সভ্যতা-বিকাশের মূল রহস্যই এই। কিন্তু আজকাল দুনিয়ায় অপেক্ষাকৃত উন্নত রাষ্ট্রে দেখা যায়, ধর্ম্ম ইতর জনসাধারণের মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায় ব'লে বিবেচিত, আর nationality তা'র পরিপোষক ব'লে স্থিরীকৃত ও গৃহীত। এই দু'টি জিনিষের মধ্যে অন্য দেশে মধ্যযুগ থেকে বহুকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের ও মিলনের আন্তরিক চেষ্টার ফলে অবশেষে মিলন অসম্ভব জেনে সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন nationalityকেই সাধনীয় করা হ'য়েছে। যে জাতি (nation) বা যে দেশবাসী এই সত্য যতটুকু মেনে নিয়েছে, সে দেশ-বাসী ততটুকু জাতীয়তা লাভ ক'রে সকল রকম স্বাধীনতা তত অধিক ভোগ কর্‌ছে।

তার ওপর হিন্দু-মুসলমানের মত দুটি ধর্ম্মের যেখানে আদা-কাঁচকলার সম্বন্ধ, আর যেখানে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বংশানুক্রমে (গুণানুক্রমে নহে) নিতান্ত অল্প সংখ্যা অতি বৃহৎ সংখ্যাকে, যে ধর্ম্মের সাহায্যে হীন ক'রে রাখ্‌বার অধিকার চিরস্থায়ী ক'রে নিয়েছে এবং ঐ বৃহত্তর সংখ্যা যেখানে ঐ ক্ষুদ্র সংখ্যার উল্লিখিত অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়ে ধন্য হ'য়ে আছে, সেই ভারতে সেই হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক nationalityর সৃষ্টি, এক অত্যদ্ভুত রহস্য কি না, তা' আমাদের নেতারা তখন ভেবে নিশ্চয় দেখেন নি।

অন্ধকার আর আলোর মত সম্পূর্ণ বিপরীত সম্বন্ধ বিশিষ্ট দু'রকম

স্বাধীনতা এখন আমাদের সুমুখে বর্ত্তমান। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ক্রমোন্নতির অভাব বোধ কর্‌বার শক্তিনাশ দ্বারা, অভাবের জ্বালা হ'তে যে নিষ্কৃতি, সে একপ্রকার স্বাধীনতা (মুক্তি), যার মানে সত্যযুগে বা আদিম অসভ্য অবস্থায় ফিরে যাওয়া ; আর উত্তরোত্তর অভাব বোধ কর্‌বার এবং সেই অভাব পূরণ জন্য শক্তিলাভ কর্‌বার পথে যে অন্তরায়, তা' থেকে উদ্ধারের ফলে যা' দাঁড়ায়, তা' আর একপ্রকার স্বাধীনতা—যা' নাকি পাশ্চাত্য। প্রথম প্রকার স্বাধীনতাই আমাদের নেতাদের 'ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধারের লক্ষ্য, অর্থাৎ ধর্ম্মকে শাসনযন্ত্ররূপে প্রয়োগ ক'রে যাঁরা জনসাধারণকে শাসন করতে বদ্ধপরিকর, তাঁ'রা দেশ থেকে ইংরেজ-প্রভুকে তাড়িয়ে নিজেরা সেই প্রভুত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হ'তে চান। তা'র প্রমাণস্বরূপ এখন তাঁ'দের সে মতলবের আভাষ আমরা পেয়েছি, জনসাধারণের অধিকারবৃদ্ধির জন্য councilএ উপস্থাপিত কয়েকটি বিলের * প্রত্যাহার থেকে, অস্পৃশ্য জাতের (caste) উন্নতি-কল্পে কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে, আর পেয়েছি সেদিনকার হিন্দুসভা ও সনাতন ধর্ম্মসভার লীলা-প্রকট থেকে।

* Tenancy Act amendment Bill, Inter-caste-marriage Bill etc.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্গ-বিভাগ প্রত্যাহার জন্য আন্দোলন।

পূর্ব্বে লিখেছি, বাইরের উত্তেজনা ব্যতীত কি রকম ক'রে বিপ্লববাদের কায মিইয়ে যেত। বঙ্গ-বিভাগ ব্যবস্থা রদ কর্‌বার জন্য যে আন্দোলন হ'য়েছিল, তার আগেও ঠিক তাই ঘটেছিল। দু'এক বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন ক'রে ফেলব, আর আমরা দেশ-উদ্ধারকারী ব'লে পূজা ইত্যাদি পা'ব, এ রকমের জল্পনা-কল্পনায় এখন আমাদের আর একটুও বিশ্বাস ছিল না। 'ক'-বাবু যদিও বাংলা দেশ ছেড়ে চ'লে গেছলেন, অন্যান্য নেতাদের চেষ্টায় কলকাতায়, আর 'অ'-বাবু ও সত্যেনের চেষ্টায় মেদিনী-পুরে গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব মরে-হেজে যা হোক এক রকম ক'রে বজায় ছিল।

রুষ-জাপান যুদ্ধের প্রভাব

বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব উথাপিত হয়েছিল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে; কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ থেকেই উক্ত আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয়। আর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রুস-জাপান যুদ্ধ সুরু হ'য়েছিল; এর প্রভাবও ঐ সালের শেষ ভাগে আমাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে অনুভূত হ'য়েছিল। প্রবল পরাক্রান্ত ভীষণকায় রুস জাতির ওপর ক্ষুদ্রকায় জাপানীদের এই চূড়ন্ত বিজয়, মরণোন্মুখ এসিয়া বাসীর পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী রসায়নের কায ক'রেছিল। জাপানীদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও অচিন্তনীয় শক্তি শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত ক'রেছিল। গোরালোকের দ্বারা কালা আদমির চির-পরাজয় সম্বন্ধে যে সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হ'য়েছিল, তা' আবার তখনকার মত একটু অপসারিত হ'য়ে আমাদের মনকে নতুন আশায় পুনরুদ্দীপিত

ক'রেছিল। জাপানীরা আমাদের এসিয়াবাসী, আমাদের বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী, আমাদের মতই ভাত খায়, আমাদের মতই ছোটো-খাট, রোগাপট্‌কা ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকাল অবশ্য তা'রা কালা ব'লে আর গৃহীত হয় না, স্বতন্ত্র এক পীতজাতি ব'লে স্বীকৃত। তখন কিন্তু তা'দের, শুধু আমাদের মত ব'লে নয়, আমাদের চেয়ে অসভ্য জাতি ব'লেই মনে করতাম।

এই সময় থেকে আমাদের মধ্যে অনেকে জাপানী জাতির প্রতি এক অদমনীয় প্রাণের টান অনুভব ক'রেছিলেন, কিন্তু নেতাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা ঢাকবার জন্য অন্য রকম মত প্রকাশ ক'রতেন, এখনও অনেকে করেন। তাঁ'রা সকল বিষয় নিজেদের বড় মনে করলেও জাপানীরা যা' করেছে, তার শত ভাগের এক ভাগও করবার মুরোদ তাঁদের নেই ব'লে ক্ষোভ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করা ত দূরের কথা, দুনিয়ার সাম্‌নে লজ্জার মাথা খেয়ে এই ব'লে সাফাই গাইতেন যে, "নিজস্ব হারিয়ে জাপান পাশ্চাত্যের অনুকরণ ক'রেছে মাত্র। পরের নিয়ে কেউ বড় হ'তে পারে না; এই দেখ না পতন হ'ল ব'লে।" বড়ই মজার কথা এই যে, জাপান নিজস্ব পূর্ব্বধর্ম্ম ছেড়ে আমাদের (?) বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সভ্যতা কবে নিয়েছিল ব'লে আমরা তাকে দোষ ত দিই না, অধিকন্তু তার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের ও গৌরবের কথা ব'লে মনে করি। এ রকম অনেক বিষয়ে আমরা নিজে যে কাযকে ভাল মনে করি, অন্যের পক্ষে তা অনুচিত ব'লে ঘৃণা করে থাকি। অবশ্য বচনে না হ'তে পারে, কিন্তু কাযে আমরা বিদেশীর যে রকম নিত্য একটু একটু ক'রে বেহুঁসে অনুকরণ করছি, জাপান অন্যের কাছে হুঁসে, সে রকম অনুকরণ নয়, প্রচণ্ড বেগে শিক্ষা করেছে, অথচ আমরা তা অনুকরণ ব'লে ঘৃণা করছি।

শিক্ষা ত অনেক দূরের কথা, সে রকম অনুকরণ করবারও শক্তি নাই ব'লেই না, আমাদের প্রভুরা 'দ্রাক্ষাফল টক', যে সপ্রতিভ জীবটি ব'লেছিল তারই অনুকরণ করছেন।

পরের নিয়েই যে, ব্যক্তি বা জাতি বড় হয়, আর যারা পরের নিতে পারেনা তারা যে আদিম অনুন্নত অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়, এই সত্যটা নিত্য প্রত্যক্ষ হ'লেও, তার উল্টোটাকে সত্য ব'লে ধরে রেখেছি। এই সংঘাতিক মিথ্যা তখনও যেমন আমাদের মুখস্থ ছিল এখনও তাই।

সে যাই হোক, য়ুরোপের এক অত বড় শক্তির ওপর জাপানের জয়-লাভ একটি অতীব গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনা। আর জাপান যে পথ দেখিয়েছে, সে পথ অনুসরণ করা ছাড়া কোন পতিত জাতির নিস্তার নেই। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, সজ্ঞানে জাপানের অনুসরণ করতে না পারলেও কাযে কিন্তু বেহুঁসে অনুসরণ করছি ব'লে, আমাদের দেশের সেই সময়কার রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ওপর জাপানের এই ঘটনাটির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

জাপানের এই ঘটনা বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের সমসাময়িক না হ'লে এবং যেমনই হোক পূর্ব্ব হ'তে বিপ্লববাদের যৎকিঞ্চিৎ বীজ ছড়ান হ'য়ে না থাকলে, চিরন্তন অভ্যাসানুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ আন্দোলন অকারণ হ'ত।

বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব নাকচ করবার তীব্র আন্দোলন সত্বেও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ঐ প্রস্তাব মঞ্জুর হ'ল। ঐ সালের ১৬ই অক্টোবর ঐ হুকুম কাযে পরিণত হ'ল। তার পরেও আবেদন-নিবেদনের চূড়ান্ত ক'রে যখন কোন ফল ফল্‌ল না, তখন প্রতিশোধস্বরূপ বিদেশী দ্রব্য বয়কট্ অর্থাৎ বর্জ্জন আর স্বদেশ-জাত দ্রব্য প্রচলনের চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। এই ব্যাপারটি "স্বদেশী আন্দোলন" নামে অভিহিত।

ইংরেজের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যবাসীরা

যখন যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছিল, তখন বৃটিশ পণ্যবর্জ্জন ব্যাপারটিকে বয়কট্ নামে অভিহিত করা হয়। বয়কট্ নামক একজন আইরিশ ক্যাপ্টেনকে প্রথমে একঘরে করা হ'য়েছিল, তাঁরই নাম অনুসারেই এর নামকরণ হ'য়ে গেছে। যাই হোক, তখন সেখানে বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে ছিল অস্ত্রশস্ত্র, অর্থাৎ কি না যুদ্ধ। আর আমরা যুদ্ধব্যাপারটি বাদ দিয়ে নিরাপদ বয়কট্ ব্যাপারটুকুর নিছক অনুকরণ করলাম।

অনুতাপের বিষয় এই যে, কে যে এ বয়কটের মতলব এখানে প্রথম দিয়েছিলেন, তাঁর নাম জানি না; তাই উল্লেখ করতে পারলাম না। বয়কটের সময় "বন্দে মাতরম্" কথাটিও প্রথম ব্যবহৃত হয়। কে যে এটি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরও নাম জানি না ব'লে আরও দুঃখিত হচ্ছি। আমাদের এই বিপ্লববাদে বঙ্কিমচন্দ্রের দান বিস্তর। তা'র মধ্যে অনেক মন্দ জিনিষ আমরা পেয়েছি, কিন্তু ভালর মধ্যে, ভাবে ও প্রভাবে "বন্দে মাতরম্" এর তুলনা নেই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকারের জাতীয় জয়োল্লাসব্যঞ্জক শব্দ প্রচলিত আছে, তার মধ্যে আমার মনে হয় কোনটাই ভাবে ও নাদের মাধুর্য্যে, আর অনুপ্রাণিত করবার শক্তির প্রভাবে এমন মহিমান্বিত নয়। সুদূর ভবিষ্যতে যে দিন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিত হ'বে, সে দিন বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' অনুকরণে অনুষ্ঠিত এই বিপ্লবচেষ্টা উল্লেখ-যোগ্য না-ও হ'তে পারে, অথবা যদি হয়, তবে সামান্য দু'চার কথায় নিতান্ত হাস্যজনক ব'লে বর্ণিত হ'তে পারে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই "বন্দে মাতরম্" কথাটি উজ্জ্বলতম অক্ষরে তা'তে প্রতিভাত হ'তে থাকবেই।

বয়কট ও দেশজাত দ্রব্য প্রচলন-চেষ্টার দ্বারা যখন ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগ্‌ল না, অধিকন্তু গুঁতোটা আশটা লাভ হ'তে লাগল, তখন প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি আরও বেড়ে গেল। তা' চরিতার্থ করবার

জন্য ক্রমে বোমা, রিভলবার প্রভৃতি জোগাড়ের চেষ্টা অনিবার্য্য হ'য়ে উঠল।

নিজ প্রাণ দিয়েও নিজ দেশবাসীর প্রতি আচরিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবৃত্তি, আমাদের দেশে বিশেষতঃ হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে নিতান্ত অভিনব, এর পরোক্ষ কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আপাত কারণ যে দু'টি, আগেই আমরা তা' উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি যে, গোড়াতে ইংরেজ সরকারের ওপর সাধারণ লোকের যে ভয় ও ভক্তি ছিল, তা ক্রমশঃ কি ক'রে সন্দেহে, তা'র পর বিদ্বেষে পরিণত হ'য়ে আস্‌ছিল। সেই জন্য বিধবা-বিবাহ বিল, সহবাস-সম্মতি বিল প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনও ক্রমে প্রবল আকার ধ'রে আস্‌ছিল। এই সকল আন্দোলন ব্যর্থ করাতে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতাও ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ছিল। সেই অনুপাতে বঙ্গবিচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তার ব্যর্থতা-জনিত প্রতিহিংসাপরায়ণতা যতটুকু বাড়ার সম্ভাবনা ছিল, উপরি-উক্ত কারণ দু'টির যোগাযোগে তার চেয়ে এমন প্রবল হ'য়ে উঠেছিল যে, যদিও নিজেদের হাত ইংরেজের গায়ে তুল্‌বার দুঃসাহস তখনও কারও গজায়নি, তথাপি অন্য কেউ ইংরেজের গায়ে হাত তুল্‌লে, বোধ হয়, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকে আশীর্ব্বাদ কেউ না ক'রে পারত না। বৈপ্লবিক কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভের পূর্ব্বে আমরা এই রকম মনোভাবেরই পরিচয় পেয়েছিলাম। তা'তে আমরা এই ভুল বুঝেছিলাম যে, দেশ ভীষণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে ; সুরু ক'রে দিলেই সমস্ত দেশ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে। এ ভুল শুধু আমরাই করিনি, য়ুরোপের, বিশেষতঃ জার্ম্মাণীর ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞেরাও ক'রে ছিলেন ব'লে শুনেছি। স্বদেশী-আন্দোলনের বক্তৃতা ও লেখার ভঙ্গী থেকে তাঁ'রা বোধ হয়, বুঝে নিয়েছিলেন যে, ভারতবাসী এমনই বিপ্লবোন্মুখ হ'য়ে

আছে যে, উপলক্ষ মাত্র পেলেই, অর্থাৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণী যুদ্ধ-ঘোষণা কর্‌লেই ইংরেজের রক্তে এ দেশ ভাসিয়ে দেবে। পরে এই ভুল বশতঃই আমরা 'একৃসন' (action) সুরু কর্‌বার জন্য অস্থির হ'য়ে প'ড়েছিলাম, বিপ্লববাদের মারামারি কাটাকাটি অর্থাৎ ইংরেজ-বধ, ডাকাতি ও লুঠ ইত্যাদিকে তখন এক কথায় একৃসন্ (action) বলা হ'ত। এই একৃসনের বিফল চেষ্টা আরম্ভ হ'য়েছিল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে। তা' আমরা পরের পরিচ্ছেদে লিখব। ঠিক ঐ সময়ে দেশে যে সকল উদ্যোগ-আয়োজন চল্‌ছিল, তাই লিখে এই পরিচ্ছেদ শেষ কর্‌ব।

বিপ্লব-বাদ প্রচার

প্রথমে আমাদের কায হ'য়েছিল, এই স্বদেশী আন্দোলনকে বিপ্লব-বাদ প্রচারের কাযে লাগান। প্রতিবাদ মিটিংএর আয়োজন ক'রে, তাতে আমাদের মতাবলম্বী বক্তা যোগাড় করা আর রুসো-জাপানি যুদ্ধের খবর, টিকাটিপ্পনী দিয়ে এমন ক'রে বাড়িয়ে সাড়িয়ে বলা—যেন জাপানের মত প্রাণপণ যুদ্ধ ক'রে ইংরেজের হাত থেকে ভারত উদ্ধার করা লোকে অবশ্যকর্ত্তব্য ও সহজসাধ্য ব'লে মনে করে।

ভূতপূর্ব্ব 'যুগান্তর'-সম্পাদক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তখন বিপ্লববাদের এক জন প্রচারক ছিলেন। তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। দেবব্রতবাবুর নিজের কোন দল ছিল না বটে, কিন্তু তিনি সকল দলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং আরও দু'এক জনের নেতৃত্বে কল্‌কাতার সমিতিগুলির মৃতপ্রায় উদ্যম ও বিপ্লববাদে বিশ্বাস, আবার সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল।

মেদিনীপুরে 'অ'-বাবু ও সত্যেনের চেষ্টা তীব্রবেগে চল্‌ছিল। সেখানকার স্কুলকলেজের অনেকগুলি ছেলে নিয়ে সত্যেন যে গুপ্ত সমিতির কর্ম্মীর

দল গঠন ক'রেছিল, তাতে এই সময় প্রসিদ্ধ ক্ষুদিরাম প্রবেশ করে। তার বিবরণ বিশেষ ক'রে পরে দেবার চেষ্টা করব।

মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্‌ন দেখিয়ে বিপ্লববাদ প্রচার আর সমিতির তরফ থেকে কয়েকটি হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারখানা খুলে প্রচারকদের আড্ডার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। এই সময় শ্রীযুক্ত 'চ'-কে আমরা প্রথমে স্বদেশী মিটিংএ বক্তৃতা দেবার জন্য পেয়েছিলাম। ক্রমে তিনি আমাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে একজন শক্তিশালী প্রচারকের কাষ কর্‌ছিলেন। নদীয়ার নিরাপদ রায় ওরফে নির্ম্মল ও শ্রীমান্ বিভূতি-ভূষণ সরকার এই সময় মেদিনীপুরের বিপ্লবসমিতিতে গৃহীত হ'য়েছিল। নিরাপদ বোধ হয় ইহলোকে নেই। বিপ্লবসমিতির যোগ্য কর্ম্মী হ'তে হ'লে যে সকল গুণ প্রয়োজন, তা'র সে সকল গুণ যে পরিমাণে ছিল, তেমন আর কারোও ছিল কি না সন্দেহ।

তাঁতশালা নাম দিয়ে এই সময় মেদিনীপুরে একটা গুপ্তসমিতির আড্ডা খোলা হ'য়েছিল। মা-বাপ, বাড়ীঘর-দোর ছেড়ে যে সকল ছেলেরা গুপ্ত-সমিতির কাযে আত্মসমর্পণ করত, তারা এই আড্ডা-ঘরে থাকত। এই আড্ডায় একটি তাঁত ছিল। বিভূতি ছিল গুরুতাঁতী।

জামালপুরে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুপ্রতিমা ভাঙ্গা ও হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, বোধ হয়, এই সময়ের কিছু পরে ঘ'টেছিল। এই ঘটনা থেকে ঢাকা অনুশীলন-সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী নাকি পরিবর্ত্তিত হ'য়েছিল। মুসলমানের অত্যাচার থেকে হিন্দুকে রক্ষা করবার জন্য শক্তির অনুশীলনই হ'য়েছিল প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। এই অনুশীলন শব্দটি বঙ্কিমবাবুর 'অনুশীলনতত্ত্ব' থেকে গৃহীত ব'লে আমার মনে হয়।

স্বদেশী প্রতিষ্ঠান

এই আন্দোলনের সুযোগে, ক্রমে বাংলা দেশে প্রায় সর্ব্বত্র স্বদেশী

দ্রব্য প্রচলনের ও বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের বিরাট আয়োজন চলতে লাগল, সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে স্কুল-কলেজের বালক ও যুবকদের নিয়ে তাঁতশালা, ছাত্রভাণ্ডার, আখ্ড়া ইত্যাদি নানা প্রকার নামের, স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় ও প্রস্তুতের সমিতি, দোকান ও কারখানা, এবং বিলেতী দ্রব্য প্রচলনে বাধা দেবার জন্য অনুষ্ঠান গ'ড়ে উঠ্‌তে লাগল ; কত মাল বোঝাই গাড়ী লুঠ হ'ল, বিলেতী দ্রব্যের কত দোকান পুড়ে ছাই হ'ল, মারামারি, মাথা ফাটা-ফাটী চল্‌ল, প্রচণ্ড বেগে পুলিসের শাসনদণ্ড স্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠল, গ্রেপ্তার এবং কারাবাসও অনেকের ভাগ্যে জুটল। 'পিটুনী' পুলিস অনেক স্থানে বস্‌ল। এই প্রকারে বাংলাদেশে হুলস্থূল প'ড়ে গেল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাংলার অনুকরণে স্বদেশী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'তে লাগল।

বিপ্লববাদীদের চেষ্টায় কলকাতায় ছাত্রভাণ্ডার নামে স্বদেশী দ্রব্যের একটি দোকান খোলা হ'য়েছিল। তার শাখারূপে মেদিনীপুরেও ছাত্রভাণ্ডার খোলা হ'ল। প্রত্যেক জিলায় স্বদেশী অনুষ্ঠানগুলি বিপ্লববাদীদের অধীনে এনে অথবা তা'র চালকদের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে সেগুলিকে গুপ্ত সমিতির কেন্দ্রে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা করা হ'য়েছিল। এই প্রকার চেষ্টার ফলে কয়েকটি জিলায় কেন্দ্রও স্থাপিত হ'ল।

সাহিত্য

স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের দৈনিক 'সন্ধ্যা' জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হ'য়েছিল। ইংরেজের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য, ঘৃণা-বিদ্রূপ প্রভৃতির ভাব প্রচারে 'সন্ধ্যা' ছিল অদ্বিতীয় ; কিন্তু 'সন্ধ্যা' বিপ্লব-বাদীদের নিজেদের কাগজ ছিল না। দেশীয় লোকদের দ্বারা চালিত অন্য অনেক সংবাদপত্রের তখন সুর বদলে গেছল।

স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' এই সময় প্রকাশিত হ'য়েছিল। সখারাম বাবুর নিজের কোন বিশেষ দল না থাকলেও

ইনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিপ্লববাদ প্রচারের সাহিত্য কেবল সখারাম বাবুই এই সময় লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দেশাত্মবোধ (sense of nationality) জাগাবার মত যদিও কিছুই ছিল না, তথাপি তাঁর 'দেশের কথা' বইখানা একবার যাঁরা প'ড়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ঘোর ইংরেজবিদ্বেষী না হ'য়ে পারেন নি। অকাট্য প্রমাণ সহ ইংরেজের অনাচারের বাংলা ভাষায় লিখিত এমন সব জলন্ত নজীরের বই, বোধ হয়, আর নেই, আর হবেও না।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য এ ছাড়া যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য কয়েকখানা বইর নাম পূর্ব্বে করেছি; সেগুলি আরও বেশী ক'রে পঠিত হ'তে লাগ্‌ল। আমরা যত পেরেছি, এ সব বই বেচেছি, অনেক স্থলে বিনামূল্যে দিয়েছি।

কোন আদর্শ বা ভাবপ্রচারের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। সে সময় বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য যে সকল সাহিত্য প্রকাশিত হ'য়েছিল, অথবা যে সকল পূর্ব্ব প্রকাশিত সাহিত্য পুনঃ প্রচারিত হ'য়েছিল, তার কোন খানিতে দেশের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়, দেশ কাকে বলে, দেশের স্বাধীনতাতে দেশবাসী সাধারণ লোকের কি স্বার্থ, তাদের সমষ্টিগত স্বার্থের (national interest) জন্য কেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে, এ সকল প্রাথমিক তথ্য বিশেষরূপে দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য সহজে বোধগম্য বাংলা ভাষায় কোন কিছু লিখিত হয়নি; এমন কিছু এখনও লিখিত হ'য়েছে কি না, জানি না; লেখবার প্রয়াস কখনও কখনও দেখতে পাই, কিন্তু তা' এক প্রকারের প্রলাপ ব'লে মনে হয়। তার কারণ, তা' অনেক স্থলে লোকে বুঝতে পারে না, আর বুঝলেও তা মনের ওপর বিশেষ কোন কায করে না।

সেকালের সাহিত্যে এবং বিপ্লববাদ প্রচারকালে বচনে স্বাধীনতার

আবশ্যকতা যা' প্রতিপন্ন করা হ'ত, মোটামুটি তা' ছিল এই—হিন্দু রাজত্বের আমলে দেশে দারিদ্র্য একেবারে ছিল না; এমন কি, মুসলমান রাজত্বকালেও তেমন দারিদ্র্য ছিল না, এখন ইংরেজের অধীনতার ফলে তা' যেমন তীব্রবেগ বেড়ে চলেছে। দারিদ্র্যই সকল অকল্যাণের কারণ; ইংরেজের অধীনতা থেকে দেশ উদ্ধার করতে পারলেই দেশের সকল কল্যাণ আবার ফিরে আস্‌বে। এত খাজনা দিতে হবে না, নুণের টেক্স, চৌকিদারী টেক্স, পণ্য দ্রব্যের টেক্স, প্রভৃতি কিছুই দিতে হবে না। ধান, চাল, মাছ, দুধ, কাপড়চোপড় আদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের দাম একেবারে কমে যাবে; লোকে প্রাণ ভ'রে খাবে, আর সাধ মিটিয়ে পর্‌তে পাবে, তা হ'লেই আর রোগ, শোক প্রভৃতি অকল্যাণ কিছুই থাকবে না। বিদেশী চালচলন অনুকরণ ক'রে, এমন কি, বিদেশী শিক্ষাপ্রণালীর ভেতর দিয়ে, বিদেশী জ্ঞান লাভ ক'রে, আমরা আমাদের সনাতন সভ্যতা আর ধর্ম্ম হারাতে বসেছি। ধর্ম্মানুমোদিত নীতি ভুলে বিদেশীর অনুকরণে দুর্নীতিপরায়ণ হ'য়ে উঠ্‌ছি; বিদেশীর চাকরী ক'রে আমরা আত্মসম্মান হারিয়েছি ইত্যাদি। এ রকম মিথ্যা দিয়ে কোন কায সিদ্ধ হয় না অথবা সে কাযে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। সে মিথ্যার উদ্দেশ্য সৎ (pious fraud) ব'লে নেতারা দাবী কর্‌তে পারেন এবং তা' সদ্য দেখতে শুনতে মঙ্গলজনক ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু তা'র পরিণাম কখনও মঙ্গলজনক হ'তে পারে না।

এই সকল কথা যে কতদূর অসত্য ও ভ্রান্তিমূলক, তা' আমরা ত জানতাম না, অনেক নেতাও জানতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, সকল নেতাই এই সকল তথ্য সত্য ব'লেই সমর্থন ক'রে এসেছেন, কখনও এর প্রতিবাদ বা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন নি। এখনও তাই।

অন্য অনেক দেশবাসীর তুলনায় এ দেশের লোক নিশ্চয় নেহাৎ

দরিদ্র, অথবা এ দেশবাসী যদি উন্নতচরিত্র হ'য়ে সর্ব্বসাধারণের হিতকরী শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করতে পারত, তবে নিশ্চয় আপনাদের দারিদ্র্য তখন অনেক লাঘব করতে পারত। এই ভবিষ্যৎ অবস্থার তুলনায় এখন আমরা দরিদ্র ব'লে দুঃখ করতে পারি; কিন্তু বর্ত্তমান দারিদ্র্য অপেক্ষা সেকালের দারিদ্র্য যে কি রকম নিদারুণ ছিল, তার বিশেষ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, হিন্দু কিংবা মুসলমান আমলে দারিদ্র্যের চরম ছিল, অথচ সে দারিদ্র্য-জনিত ক্লেশ-বোধ একেবারে কিছুই ছিল না। তখন প্রায় সবই অভাব ছিল, কিন্তু সে অভাবের বোধ একটুও ছিল না, এ প্রকারের অবস্থাকে নেতারা দেশবাসী জনসাধারণের বড় সম্পদের বা প্রাচুর্য্যের অবস্থা ব'লে ব্যাখ্যা করেন। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচিত হ'য়েছে।

অভাব-বোধের অভাব অথবা দারিদ্র্য-দুঃখ অনুভূতির অভাবই আমাদের সকল অকল্যাণের আদি কারণ। নইলে যাদের আমরা অসভ্য আদিম নিবাসী ব'লে ঘৃণা করি, তাদের ঐ দু'টি জিনিষ নেই ব'লেই ত তারা ভারতবাসীর বাঞ্ছিত তথাকথিত শান্তিতে ও সুখে, কোন টেক্স্ বা খাজনার ধার না ধেরে, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে তাদের অবস্থানুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ ক'রে, অপেক্ষাকৃত সবল ও সুস্থ্য দেহে হাজার হাজার বছর এক ভাবে কাটাচ্ছে। দেশ স্বাধীন ক'রে দেশবাসীকে কি নেতারা এই রকমের সুখ ও শান্তি দিতে চেয়েছিলেন বা এখনও দিতে চান?

তার পর এ অকল্যাণের কারণ যতটা ইংরেজের অধীনতা বা বিদেশীর অনুকরণ, তার চেয়ে ঢের বেশী প্রবল কারণ যে আমাদের সনাতনধর্ম্ম, তাও পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখান হ'য়েছে। যে লোকমত দ্বারা মানুষ সর্ব্ববিষয়ে চালিত হ'তে বাধ্য হয়, আমাদের দেশের সেই লোকমত এই

ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত, কাযেই সমাজের শাসকসম্প্রদায়ের অর্থাৎ ভদ্র-শ্রেণীর স্বার্থের তা' পোষক। শূদ্র নামে অভিহিত, সমাজের পনের আনা অংশকে চিরদাসে পরিণত ক'রে রাখাই হচ্ছে ভদ্রশ্রেণীর আপাত স্বার্থ। সাহিত্য-সৃষ্টির কায এই ভদ্রশ্রেণীর হাতে অথবা যাঁরা সাহিত্যিকের আসন পরিগ্রহ করেন, তাঁরা নিজেরা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত ব'লেই অনুভব করেন, তাঁদের কারুর মধ্যে শূদ্রের বা ইতরসাধারণের অবস্থার অনুভূতি সম্ভব হয় না। কাযেই জনসাধারণের মধ্যে একটুখানিও স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয় দিলে না জানি কি ভাষণ অঘটন ঘটবে, এই ভেবে তাঁরা শিউরে ওঠেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অর্থাৎ নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা সাব্যস্ত সত্যকে যাতে গ্রহণীয় ক'রে জনসাধারণ নিতে পারে, সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা তাই আমাদের সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায় না। তাই বল্‌ছিলাম, যাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার পথ বন্ধ, তাদের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক কেন, কোন রকম স্বাধীনতা লাভ করা বন্ধ্যার সন্তানলাভের মত অসম্ভব। এ হেন বিরাট অসম্ভব ব্যাপার সাধনের জন্য বিপ্লববাদ প্রচারের উপায়-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত নগণ্য সাহিত্যকেই নেতারা যথেষ্ট মনে ক'রেছিলেন।

স্বদেশী গান

ঐ সময় অসংখ্য স্বদেশী গান রচিত হ'য়েছিল। পূর্ব্বে যে সকল গান বহুকাল হ'তে চ'লে আস্‌ছিল, প্রায় সকল রকমের গায়করা তা'র বদলে অনেক স্থলে স্বদেশী গান গাইতে সুরু করেছিলেন।

ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে কয়েকটি স্বদেশী সঙ্গীত রচিত হয়েছিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। গোবিন্দ রায়ের—"কত কাল পরে বল ভারত রে, দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে", হেমচন্দ্রের—"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়", বোধ হয়, কাব্যবিশারদের—"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখো রেখো

হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান" এবং আরও দু'একটি গানের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রচিত গানগুলির তুলনা হয় না। যে গানগুলি তখন রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় সবই স্বদেশের সৌন্দর্য্য আর মহত্ব বর্ণন অথবা বৃথা গৌরব সূচক; বাকী বিদেশীর অন্যায় অত্যাচারের কীর্ত্তন। তাতে ক'রে ভারতে জন্মেছি ব'লে গৌরব অনুভব করা যেত; বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হ'তে পারতাম; আর তাতে বেশ একপ্রকার তৃপ্তির অনুভূতি হ'ত। তাই ভারতের জনসাধারণ চিরক্রীতদাস ব'লে, অথবা যখন জগতে প্রায় সকল জাতি এত উন্নত, তখন আমরা এত অবনত অবস্থায় প'ড়ে আছি ব'লে, লজ্জা-ঘৃণাদির জ্বালা অর্থাৎ দুঃখানুভূতি আমাদের মনে আস্‌তে দিত না। আমাদের মাতৃভূমির মত সুন্দর, উর্ব্বর, রত্নপ্রসবিনী, পুণ্যদা এবং জ্ঞানদা দেশ আর কোথাও নেই; তাই আমরা দেশকে ভালবেসে ধন্য; আর যাকে ভালবাসি, তার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ বা প্রাণ দিয়েও ধন্য হব, এই মুখ্য বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে বোধ হয় গান রচিত হ'য়েছিল।

কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি যদি সর্ব্ববিষয়ে সুন্দর ও অন্য দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হন তা হ'লে কি আমরা তাঁকে ভালবাসব না? তবে কি স্বদেশের প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নেই? অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত হবার মত কোন কিছু যদি এ দেশে না থাকৃত, তবে কি আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসতে পারতাম না? যে দেশে এই রকম অতীত গৌরবের কিছুই নেই, সে রকম দেশবাসী উন্নত হ'তে পারেনি ব'লে কি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়? সেই অতীত কালে প্রথম যে গৌরবময়-কীর্ত্তি-অর্জ্জিত হ'য়েছিল, তা কি বহুকাল ব্যাপী অগৌরবের অবস্থার পর, বহু চেষ্টায় অর্জ্জিত হয় নি? এক দিন সুপ্রভাতে হঠাৎ ঐ আর্য্য নামধারী মানুষগুলি কি অতীত গৌরবের পতাকা হাতে ধ'রে তথা-কথিত ব্রহ্মার মুখ আর বাহু থেকে বেরিয়ে এসে ছিল? সকল জাতির সকল দেশের

বহুকাল ব্যাপী অগৌরব যুগের পর যে, গৌরবের যুগ এসে ছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় আছে কি ? যে জাতির অতীত গৌরবকাহিনী নেই, সে জাতি নতুন ক'রে গৌরব অর্জ্জন করতে পারে না, আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ের এই অদ্ভুত থিওরী যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তা' কি ইতিহাস প্রমাণ করে নি ? ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, রাসিয়ান, চীনা, জাপানী, সকলেই কি ব্রহ্মার মুখ আর বাহু থেকে অতীত গৌরবের নিশান উড়িয়ে ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়েছিল ? অতীতের এই বৃথা গৌরব কীর্ত্তনই কি আমাদের দেশে নেতৃত্ব অর্জ্জনের, জগত পূজ্য হবার অথবা দেশে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে যাবার প্রধানতম উপায় হ'য়ে দাঁড়ায় নি ? এই ভীষণ অনিষ্টকর মিথ্যা যেদিন দেশের লোকের চোখে ধরা পড়বে, সেদিন এই নেতাদের স্থান কোথায় হ'বে, তাকি তাঁদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত নয় ? নেতারা কি চিরকাল জনসাধারণকে বৃথা গৌরবের নেশায় এই রকম মৃতপ্রায় ক'রে রাখতে পারবেন ? কোন দেশবাসী অতীত গৌরবে যত দিন গৌরব অনুভূতির তৃপ্তি উপভোগ করে, তত দিন যে তা'দের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকে, এ সত্য কি ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে না ? পৃথিবীর অন্য সকল দেশের তুলনায় কোন্ বিষয়ে আমাদের দেশ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? আমাদের দেশের তুলনায় কোন্ উন্নত দেশে এত রকম ঘৃণিত মারাত্মক ব্যাধি নিত্য বিরাজমান ? এত রকমারী দৈব-দুর্ব্বিপাক নিয়ত কোন্ উন্নত দেশে ঘটে ? এমন দারিদ্র্য কোন্ সভ্যদেশে এত অধিক ? এমন অজ্ঞানতা, পাপপরায়ণতা আর ধর্ম্মের নামে মানুষের ওপর মানুষের এমন পৈশাচিক অত্যাচার আর কোন্ দেশের সভ্যতাতে ছিল ! এক কথায় এমন মনুষ্যত্বহীনতা, কোথাও আছে কি ? যারা চোক থাকতে অন্ধ অর্থাৎ নিজ প্রত্যক্ষ অস্বীকার ক'রে প্রবঞ্চকের (demagogueদের) বর্ণিত অবোধ্য কল্পনাকে যারা সত্য ব'লে

গ্রহণ করে, তারা ভিন্ন অন্য কেউ কি এ সকল তথ্য অস্বীকার করতে পারে? যদি না পারে, তবে কি মনুষ্যত্বহীন আমরা আমাদের এই দেশ-মাতাকে ভালবাসব না? মা, সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, আর প্রাণজুড়োন রূপকথা শুনিয়ে আমাদের ঘুম পাড়ান ব'লেই কি আমরা মাকে ভক্তি করব, অথবা মা'র প্রতি কর্ত্তব্যপালন করব? আর মা রোগগ্রস্তা দরিদ্রা হ'লে তখন মা'র প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য থাকবে না? উক্ত স্বদেশী গানগুলির রচয়িতাদের সকলে না হোন, অনেকে এ সকল কথা জানেন, ভাবেন, অতি ভয়ে ভয়ে হেঁয়ালীর ভাবে গানে ও সাহিত্যে তা' প্রকাশ করেন। কিন্তু লোকমতের যারা কর্ণধার, সেই তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর নিকট তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত popularity হারাবার ভয়েই স্পষ্ট কথা বলতে পারেন না।

এই কারণে ঐ সকল গান ও সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে যারা বিপ্লববাদের কাযে ঝাঁপিয়ে এসেছিল, যত দিন এ কাযে যশ, মান, আদর, গৌরব ছিল বা এ সকলের আশা ছিল, ততদিন তাদের মধ্যে স্বদেশ-হিতৈষণার খুব বহর দেখতে পাওয়া যেত। তারপর যখনই বিপদ এসেছে বা দুঃখ ভোগের পালা আরম্ভ হ'য়েছে, তখনই দেখেছি, এপ্রুভার (approver), ইন্‌ফরমার (informer) হবার জন্য সাধাসাধি, আর রাতারাতি মতটি বদলে যাবার হুড়োহুড়ি প'ড়ে গিয়েছে।

সে সময়কার স্বদেশসঙ্গীতে অনেক স্থলে ভাবের উন্মাদনা ছিল, কিন্তু কর্ম্মের প্রেরণা বড় একটা ছিল না। তাই আমাদের মধ্যে ভাবপ্রবণতার এত বাড়াবাড়ি, আর কাযের বেলায় ঠুঁটো জগন্নাথ। কথা জোড়াতাড়া দিয়ে ভাবের পাঁয়তাড়া দিলে স্বাধীনতা, স্বরাজ অথবা ভগবান্‌লাভের নামে পরমবাঞ্ছিত লোকপূজা (popularity) যদি লভ্য হয়, তবে লোকচক্ষুর আড়ালে কষ্ট-দায়ক কঠোর কর্ম্মের জাঁতায় আর কে পিষ্ট হ'তে চায়?

তাই ত এ দেশে কেবল বচনে স্বদেশ উদ্ধার করবার জন্য লোকের অভাব নেই।

যাই হোক্, অন্ততঃ একটি গান উক্ত প্রকারের স্বদেশসঙ্গীতের পর্য্যায়-ভুক্ত ছিলনা ব'লে মনে করি। যখন আলিপুর জেলে "কুঠ্রীবদ্ধ" ছিলাম, তখন একদিন একটা কুঠ্রী থেকে বদলি হ'য়ে আর একটাতে ঢুকে দেখি, মেজেতে তার চারটি লাইন খোদাই ক'রে লেখা রয়েছে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত সেই নাকটেপার দলে এ গান কে লিখ্তে গেল, তাই ভেবে তখন আকুল হ'য়েছিলাম। পরে কিন্তু সে রত্নকে চিন্তে পেরেছিলাম। সে শ্রীমান বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, আমাদের সুশীলের দাদা। সে লেখাটি কবিতা ব'লেই এখন মনে হচ্ছে। খুঁজে পেতে যতটুকু তার পেলাম, তা এই :—

* * *

তুমি যদি হ'তে ব্যর্থ মরুভূ ঊষর,
অথবা বিকট রুক্ষ কঠিন কঙ্কর,
হ'তে যদি আলোহীন তুহিনের দেশ,
নাহি যেথা শ্যাম-শোভা গীত-গন্ধ লেশ,
হতে যদি বর্ব্বরের বিহারের ভূমি,
তবু এই জীবনের তীর্থ হ'তে তুমি।
আফ্রিকার মরুভূমি সুইস্ পাষাণ
হতে যদি, তবে মাতঃ তোমার সন্তান,
হইত না এইরূপ ক্ষীণ কলেবর,
হইত না এইরূপ নারী সুকুমার

* * *

এইমত ভক্তিভরে প্রদোষ প্রভাতে
তোমার চরণ-ধূলি লইতাম মাথে।

তোমার অতীত মোরে করেনি পাগল,
ভাবী আশা করিছে না আমারে চঞ্চল,
জন্মক্ষণে শিশু চিনে যেমন মাতায়,
আমিও তেমনি মাগো, চিনেছি তোমায়,
আমি জানি ভাগ্য মোর তব সনে গাথা
জন্মজন্মান্তর হ'তে, অয়ি চির মাতা।

শিক্ষা

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন্ নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা হ'য়েছিল। বাংলার নানা স্থানে ন্যাশনাল স্কুল অর্থাৎ জাতীয় বিদ্যালয় এবং কলকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হ'ল। দেশের লোক বড় আশায় উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে ভাবতে লাগল, "এই একটা কাযের মত কায হ'ল ; এই বিদ্যালয়ে দৈনিক চার পাঁচ ঘণ্টা পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে এক আধ ঘণ্টাও ত ছেলেরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র মুখস্থ কর্‌বে ; আর যা হোক্ বা না হোক্, নিদেন ধর্ম্মটা ত রক্ষা হ'বে!" অধিকন্তু যখন সেই সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, তখন সেই পরম আশাপ্রদ জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাদাতা নেতা ও অর্থসাহায্যকারীদের প্রতি গদ্‌গদ ভক্তি জানাবার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গেল।

ঠিক এই সময় দেশমান্য অরবিন্দবাবু বরোদায় মাসিক ৭০০৲ টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে মাত্র ১০০৲ টাকা মাইনেতে কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপনা কর্‌তে এলেন।

যখনই আমাদের অবনতির কথা ওঠে, তখনই শোনা যায়, 'শিক্ষাই এই অবনতির একমাত্র প্রতীকার। কিন্তু ইংরেজ সরকারের

প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা কেবল দাস মনোভাবই (slave mentality) তয়ের হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা দিতে পার্‌লে তবেই উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হবে'। তাই জাতীয় শিক্ষা দেবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে জাতীয় স্কুল-কলেজ খোলা হ'য়েছিল, আর অনেক স্কুল-কলেজ সরকারী সম্পর্কচ্যুত কর্‌বার সঙ্কল্প মাত্র হ'য়েছিল।

সরকারী স্কুল-কলেজে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত, জাতীয় বিদ্যালয়েও প্রায় সেই সকল বিষয় একটু এদিক ওদিক ক'রে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'ল। অধিকন্তু সেই সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ আর শিল্প বা কারুকরী শিক্ষার নামমাত্র ব্যবস্থাও ছিল। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যে সকল ইতিহাসে ভারতের ভূত গৌরবকীর্ত্তন আছে, আর নিন্দাজনক কিছুই নেই, ভারতের সেই রকম ইতিহাস পড়াবার চেষ্টা হ'য়েছিল।

এখন স্থূলদর্শী বিদেশীর জড়বিজ্ঞান আর ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎ-সম্বন্ধীয় ঋষিবাক্য একসঙ্গে পড়াবার ফল কি হ'তে পারে—দেখা যা'ক্। এক দিকে জড়বিজ্ঞান, স্থূলদর্শী ভ্রান্ত মানবের ভ্রান্ত বিষয়-বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত—কাযেই ভ্রান্ত। অন্য পক্ষে ঋষিরা ছিলেন অভ্রান্ত সূক্ষ্মদর্শী ও ত্রিকালজ্ঞ। তাঁদের intuition থেকে চির-সত্যের ভাণ্ডাররূপ শাস্ত্রের উদ্ভব, কাযেই শাস্ত্রোক্ত ঋষি-বাক্য সকল যদিও স্ববিরোধী বা পরস্পর-বিরোধী তবুও অকাট্য সত্য ব'লে ধ'রে নেয়া হয়।

মানবজ্ঞানের বিষয়ীভূত যাবতীয় বিষয়ে অনেক স্থলে বিজ্ঞান যা' সত্য ব'লে প্রতিপন্ন করে, ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে তা' মিথ্যা; আর শাস্ত্র যা' সত্য ব'লে দাবী করে, তা'র অধিকাংশ, বিজ্ঞান মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করেছে। এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয়ের বিস্তর বৃথা চেষ্টা দেশবিদেশে হ'য়েছে; এখনও সে চেষ্টা খুবই চল্‌ছে। তা'র ফলে "এটাও সত্য,

ওটাও সত্য" এইরূপ মনোভাব অর্থাৎ মানুষের মন কতক জ্ঞাতসারে, কিন্তুর অজ্ঞাতসারে সত্য-মিথ্যার খিচুড়ী বা ভণ্ডামীতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, এই সত্য-মিথ্যার এমন খিচুড়ীকে জাতীয় শিক্ষা বলা হ'য়েছিল কেন ?

সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যাসাগরের যুগে আরম্ভ হ'য়েছিল। তা'র উদ্দেশ্য ছিল, কোন পূর্ব্ব-সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে, নিরপেক্ষভাবে নিজে বিচার ক'রে ভালমন্দ নিরূপণ করবার শক্তি যা'তে বালকেরা অর্জ্জন করতে পারে, তা'র ব্যবস্থা করা। সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্যক্ সুফলও তখন ফলেছিল। গোঁড়াদের মতে কিন্তু তা' কুফল ব'লে পরে বিবেচিত হ'ল। কারণ হিন্দু ধর্ম্মের নৃশংস বাঁধন নাকি একটু শিথিল হতে সুরু করেছিল।

বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানের সত্য ধারণা করা মানব-মনের পক্ষে সহজে সম্ভব হয়। শাস্ত্রোক্ত সত্য বিচারের অতীত ; তা' কেবল ভক্তি বা অন্ধ বিশ্বাস দ্বারাই স্বীকৃত হয়ে থাকে। বুদ্ধির দ্বারা তা' আয়ত্ত করা অসম্ভব। তা'র ফল এই দাঁড়ায় যে, আশৈশব শাস্ত্র অথবা ঋষিবাক্য সকল, সত্যের একমাত্র আধার ব'লে লোকের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তা' পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা লব্ধ বিচার-বুদ্ধিতে নিতান্ত হেয় ব'লে প্রতীত হয়। কাজেই মহামান্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাপূজ্য ঋষিদের ওপর তা'দের অভক্তি জন্মে। আমাদের প্রধানতম গৌরবভাজন ঋষিগণ যখন ছেলেদের দৃষ্টিতে এত তুচ্ছ হয়ে যান, তখন বেদ হ'তে আরম্ভ ক'রে, ধর্ম্মের নামে প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থা, লোকাচার ইত্যাদি আমাদের সকল চরম গৌরবের বস্তু, বৈজ্ঞানিক সত্যের তুলনায় নিতান্ত হেয় ব'লে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রকারে গঠিত মনোভাবকেই, বোধ হয়, দাসসুলভ মনোভাব (slave mentality)

ব'লে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে। এই দাস-মনোভাবের আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে শিক্ষা-প্রণালীর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তা'কেই জাতীয় শিক্ষা বলা হ'ত, এখনও হয়। বিপ্লববাদের নেতারাও বিশেষ ক'রে এ রকম জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এ থেকে তাঁ'দের মনোভাবের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

এও বলা যেতে পারে, শাস্ত্রোক্ত সত্যের সঙ্গে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মিথ্যা, শিক্ষা দেবার বিধান হয়েছিল বোধ হয় এই জন্য যে, বিজাতীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য অর্থ উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, টুলো পণ্ডিতদের কেবল বেদ-উজ্জ্বলা বুদ্ধি দিয়ে যে একালে অন্নসংস্থানের বিষম গোলযোগ ঘটে, তা' কর্ত্তারা যথেষ্ট হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

সে যা'ই হোক্, এ রকম জাতীয় বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী থেকে এর প্রকৃত পক্ষে যা কিছু পার্থক্য, তা' হচ্ছে, সরকারী বিদ্যালয়ে পাশ করলে চাকরী জোটে, ব্যবসায় শিক্ষা করবার জন্য অন্য কলেজে ভর্ত্তি হওয়া যায়, আর অনেক স্থলে বেশ খাতির জমে। অন্ততঃ এটা আত্মপ্রসাদ লাভের পক্ষে যথেষ্ট ব'লে লোকে মনে ক'রে থাকে। কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে উপাধি নেই, বা থাক্‌লেও তা'র দ্বারা বিশেষ কোন চাকরীও জোটে না, খাতিরও জমে না।

তা'র পর তথা-কথিত দাস-মনোভাবের প্রতিষেধকরূপেও এর প্রয়োজন ছিল না। কারণ, অন্য একটা যে প্রতিষেধক আছে, তা'র কাছে এ কিছুই নয়। সরকারী স্কুলকলেজে ছেলেদের বিজ্ঞান বা পাশ্চাত্য বিদ্যা যা' সত্য ব'লে শিখিয়ে দেয়, বিদ্যালয়ের বাইরে তা'রা

এলেই, সেকালের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের আম্‌মোক্তার ঠাকুরমা'রা এক ধম্‌কিতে তা'দের এই সম্বলব্ধ সত্যকে চিরকালের জন্য মিথ্যাতে পরিণত ক'রে দেন। আমাদের দেশের অশিক্ষিত, শিক্ষিত, অতি-শিক্ষিত, এমন কি, পাশ্চাত্য দেশের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রায় সকলেই অল্পাধিক ঠাকুরমাপন্থী। এক কথায় আমাদের দেশের লোকমত আর ঠাকুরমা'র মত একই।

আমাদের দেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রায় সকলেরই এমন স্বভাব যে, যে সত্য নিজে প্রত্যক্ষ করা যায়, নিজ বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায় বা যা' স্বাভাবিক ব'লে সহজে ধারণা হয়, তা'কে সত্যের মর্য্যাদা দিতে তা'দের মন ওঠে না। তা'রা সত্যের মর্য্যাদা দেয় তা'কেই, যা' তাদের অবোধ্য, যা' অলৌকিক অস্বাভাবিক ব'লে তাদের মনে হয়, অথবা যা আধ্যাত্মিক ব'লে শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের তথাকথিত গুরু ব্যাখ্যা করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য জাতির মধ্যে সচরাচর এই ভাবটা বেশী দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আগে অশিক্ষিতদের মধ্যে এ রকম মনোভাবের আধিক্য দেখা যেত। প্রথম স্বদেশী অন্দোলনের সময় থেকে শিক্ষিতদের মধ্যেই যেন এই স্বভাবটার বাড়াবাড়ি বেশী দেখা দিয়েছে। বিশেষ ছাত্রমহলে শতকরা ৯৯ জন কিছু না কিছু এই ব্যাধিগ্রস্ত। এ যদি দাসমনোভাব না হয়, তবে অগত্যা এটা "ঠাকুরমা'র মনোভাব" (grandmother's mentality) ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে। দাসমনোভাবের প্রভাব থেকে ছেলেদের রক্ষা কর্‌বার জন্য ঐ ঠাকুরমা-বিনিন্দিত মনোভাবই ছিল যথেষ্ট, তা'র ওপর তথা-কথিত জাতীয় শিক্ষার ব্যাপারটা নেহাৎ অকারণ কষ্ট।

আর একটা কথা এই যে, সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠ্যের মধ্যে ইংরেজ

জাতির প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতি ছেলেদের মনে জাগাবার চেষ্টা বিলক্ষণ আছে; এবং এ দেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা বাড়াবারও অনেক প্রকার উপায় নাকি অবলম্বিত হয়েছে। সে চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কারণ সহজে বালকেরা সরকারের এ চেষ্টাটা এখন ধ'রে ফেল্‌তে পারে; তাই ইদানীং এ চেষ্টা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে পুরোহিতসম্প্রদায় ও তাঁ'দের সহায় যাঁ'রা, তাঁ'দের প্রতি অন্ধভক্তি, তাঁ'দের অভিসম্পাতের ভয়, এবং চিরদাসত্বের ভাব জনসাধারণের মনে চিরস্থায়ী কর্‌বার চেষ্টা যে কত রকমে করা হয়েছে, তা'র প্রমাণ শাস্ত্রের পাতায় পাতায় বিরাজ করছে। অথচ এই অন্যায় ঘৃণিত চেষ্টার কথা কেউ বুঝেও বোঝে না। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি শত শত মহাপুরুষের বোঝাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমরা এই ব্যাপারটা গৌরবের বিষয় ব'লে মনে কর্‌ছি। তাই পূর্ব্বোল্লিখিত দাসমনোভাবের চেয়ে এই ঠাকুরমা-মনোভাব শতগুণে আত্মার (যদি সেটা থাকে) এবং মনুষ্যত্বের অনিষ্টকারী।

অন্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সরকারী শিক্ষাপ্রণালীর ভেতর ভূরি ভূরি দোষ থাক্‌লেও এটা, যে পরিমাণে ছেলেদের মনকে যুক্তিপরায়ণ ও সত্যদর্শনক্ষম করবার পক্ষে মালমসলা যোগায়, তেমনটি শাস্ত্র ত দূরের কথা, আমাদের দেশে সনাতন কোন শিক্ষার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই ঠাকুরমা'র মনোভাব শুধু রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সকল প্রকার উন্নতিলাভের পক্ষে ঘোর অন্তরায়, সেটা নেতারা না হয় নাও জান্‌তেন। কিন্তু সেটা যে আমাদের স্বভাবের ঘোর দুর্ব্বলতা তা' নিশ্চয় জান্‌তেন। তাই জাতীয় শিক্ষার নামে তাঁ'রা যে শিক্ষা দেবার বিধান দিয়েছিলেন, তা'র সঙ্গে বিজ্ঞানের কোড়নেরও ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।

যে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই নেতারা নেতৃত্ব করছিলেন, এখনও কর্‌ছেন, কিংবা যে শিক্ষার অভাবে এঁদের নেতৃত্ব করা অসম্ভব হ'ত, যা'দের নেতা হয়েছেন, তা'দের পক্ষে সেই শিক্ষা যাতে ব্যর্থ হয়, তথা-কথিত জাতীয় শিক্ষাদ্বারা তা'র চেষ্টা হয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষাকে সার্থক কর্‌তে হ'লে যা' করা নিতান্ত উচিত ছিল, তা'র ধার দিয়েও কর্ত্তারা যান নি। সমস্ত বিষয় দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল। চাঁদার দ্বারা প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ টাকার কতক অংশ দিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নতিবিধায়ক, বিদেশীয় ভাষায় লিখিত যাবতীয় বিশেষ বিশেষ পুস্তক, বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর্‌তে পার্‌লেও একটা কাযের মত কায হ'ত। দেশের ভাবী উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন কর্‌তে হ'লে তা সুদূর অতীত হ'তে অনুসৃত ধর্ম্ম, শাস্ত্র, লোকাচার, কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের সংস্কার-বিরুদ্ধ হ'বেই। কারণ, আমাদের অতীতের পরিণামই বর্ত্তমানের এই শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থা হ'তে উদ্ধার হ'তে হ'লে অতীতের প্রভাব থেকেও আগে উদ্ধার হওয়া চাই-ই। সে স্থলে লোকমতের আমূল সংস্কার জন্য বিদ্যালয়ের লব্ধ বৈজ্ঞানিক এবং ধর্ম্মের ঐতিহাসিক সত্যকেই দৃঢ়ভাবে ছেলেরা যাতে গ্রহণ করে ও তা' সাধারণে নির্ম্মমভাবে যাতে প্রচার করে তার বিধান সুদৃঢ় করা উচিত ছিল। তা' হ'লেই এ রকম শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা (national education) বলা যেতে পার্‌ত।

বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ

এই সময় আর একটি মহৎ অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়েছিল। বিদেশে শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক শিক্ষা লাভের জন্য বিস্তর বাঙ্গালী ছাত্রকে অর্থ সাহায্য দিয়ে য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠান

হ'য়েছিল। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় লোকের নিকট বিস্তর দান সংগ্রহ করা হ'য়েছিল। দেশবাসীকে জাতীয়তার পথে অগ্রসর কর্‌বার এ একটি অমোঘ উপায়। কিন্তু তা হলে কি হয়, আমরা কিছুই অন্যের কাছে শিখতে ত' পারি না, ঠিক মত অনুকরণ করবার শক্তিও আমাদের নেই, অথচ পারি কেবল অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে কায ভণ্ডুল কর্‌তে।

বিদেশে শিক্ষার জন্য হাজার হাজার ছেলে পাঠিয়ে তবে জাপান শক্তিশালী হ'তে পেরেছে ব'লে আমাদের নেতারা ব্যবস্থা দিলেন, "তবে দাও আমাদের দেশের জনকয়েক ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে"। কিন্তু যে বিষয় তা'রা শিখতে যাচ্ছিল, সে বিষয় শেখবার শক্তি তা'দের ছিল কি না, তা' প্রায় দেখা হ'ত না। দেখা হ'ত কা'র সুপারিশ-জোর কত। জাপানের কিন্তু বিদেশে ছেলে পাঠাবার একটা ধারা ছিল। সেখানে যে ছাত্র যে বিষয় বিদেশে শিখতে যাবার উপযুক্ত ব'লে তা'র কায দেখিয়ে নির্ব্বাচিত হ'ত, তা'কে দেশে বিদেশী শিক্ষকের সাহায্যে, নিজে সে বিষয়ে কতদূর কি ক'র্‌তে পারে, তা বিশেষভাবে চেষ্টা করবার সব রকম সুবিধা দেওয়া হ'ত। এই প্রকার বহু ছাত্রের মধ্যে যা'দের চেষ্টা সম্যক্ সফল হ'ত, তাদেরই বিদেশে পাঠান হ'ত। বিদেশে তা'দের সাহায্য করবার ও তা'দের কাযের তত্ত্বাবধান করবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে আশানুরূপ শিক্ষালাভের পর শত শত ছেলে জাপানে ফিরে এসে জাপানকে সর্ব্ববিষয়ে এত শক্তিশালী কর্‌তে পেরেছিল।

আর আমাদের দেশ থেকে যাদের বিদেশে কোন বিষয় শিখতে পাঠান হ'ত, তারা বিদেশে যাবার আগে সে বিষয় প্রায় কিছুই জানত না; কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেখিয়ে আর অধিকাংশ স্থলে সুপারিশের জোরেই নির্ব্বাচিত হত। যে বিষয় শেখবার জন্য তা'দের পাঠান হ'ত, তার চেয়ে পরের টাকায় বিলেত দেখা আর সাহেবিয়ানা শেখাটাই ছিল

তা'দের একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিদেশে তা'দের বিশেষভাবে সাহায্য এবং তত্ত্বাবধান করবার জন্ম বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। তা'দের সফলতার ওপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে, এ কথা খুব কম ছাত্রই জান্ত। কাযেই তা'দের দায়িত্ববোধের তেমন দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতা ছিলনা। তা'দের দেশাত্মবোধ ছিল সখের। এই সব কারণে যতগুলি ছেলেকে বিজ্ঞান সমিতির সাহায্যে বিদেশে পাঠান হয়েছিল, তা'র মধ্যে কেউ দেশে ফিরে এসে উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন কায করতে পেরেছে বলে বোধ হয় কেউ জানে না। তা'দের মধ্যে অনেকেই বিদেশের দু' একটা কারখানা বাইর থেকে দেখে, বিদেশের বড় বড় পুস্তকালয়ে সে বিষয়ের বড় বড় বইএর দু'এক পাতা প'ড়ে, আর ক্যাটলগে নানা প্রকার নাম আর তা'র গুণাগুণ সম্বন্ধে কতকগুলি শব্দ মুখস্থ ক'রে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল; তা'দের অধিকাংশের মন এমন ঠাকুরমা-ভাবাপন্ন ছিল যে, স্বাধীনতার লীলাভূমিতে থেকেও স্বাধীনতারূপ আলোর জ্যোতি তা'রা চোখে সইতে পারত না। আর কিছু না হোক্ তা'রা যদি সে দেশ থেকে একটুও স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আস্তে পার্ত, তা' হ'লে তা'দের সংসর্গে এসে এ দেশের কোন না কোন লোক একটু স্বাধীনতার পক্ষপাতী হ'তেও পার্ত; তা' হ'লে সাধারণের প্রদত্ত বিপুল অর্থের ব্যয় কিছুমাত্রও সার্থক হ'য়েছে ব'লে আমরা ধন্ম হ'তে পারতাম।

আর যা' হোক্ বা না হোক্, স্বদেশী আন্দোলনে সব চেয়ে বড় কাজ হ'য়েছিল এই যে, স্বদেশী আন্দোলনের আগে এ দেশের লোক রাষ্ট্রনীতির হিসাবে সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল,—এক দল যাঁরা রাষ্ট্রনীতির কোন ধার ধারতেন না; তাঁ'দের মধ্যে কতক শিক্ষিত আর বাকী সবই অশিক্ষিত জন সাধারণ। আর একদল ছিলেন, তাঁ'রা সংখ্যায় প্রথম দলের

তুলনায় খুবই নগণ্য। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন করা তাঁ'দেরই ছিল কায। স্বদেশী আন্দোলনের সময় শেষোক্ত দল দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে মডারেট অর্থাৎ মধ্যপন্থী আর এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট্ অর্থাৎ চরমপন্থী নামে অভিহিত হ'লেন।

আবেদন-নিবেদন দ্বারা ভাঙ্গা বাংলা যখন জোড়া লাগল না, তখন আবেদন-নিবেদন নীতির ওপর যাঁদের বিশ্বাস আর থাক্‌লনা, তাঁরা চরম-পন্থীনামে অভিহিত হ'লেন ; আর যাঁরা তখনও আবেদন-নিবেদনের ওপর ভর ক'রে রইলেন, তাঁরা হলেন মডারেট্।

লোকমতের যাঁ'রা ধামাধরা, তাঁ'রা লোকমতের এ রকম পরিবর্ত্তন অনুসারে চরমপন্থী হ'তে বাধ্য হ'লেন। তা' ছাড়া কতকগুলি শিক্ষিত লোক এ কাল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তেন না, তাঁ'রাও এই আন্দোলনের বেগে টানা হ'য়ে চরমপন্থীর দলে মিশলেন। তখনকার চরমপন্থীদের পলিসি হ'য়ে দাঁড়াল—আবেদন-নিবেদন দ্বারা ইংরেজরাজের কাছে যখন কিছু আদায় করা অসম্ভব, তখন ইংরেজজাতির আঁতে ঘা দিতে হবে। অর্থাৎ কি না, তাঁ'দের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঘাত দিয়েই আমাদের কিছু কিছু অধিকার আদায় কর্‌তে হ'বে। এঁদের লক্ষ্যের দৌড় ছিল মাত্র কিছু অধিকার আদায় করা।

এই চরমপন্থীদের ভেতর থেকে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির চেষ্টায় আর একটি ক্ষুদ্র দল বেড়ে উঠ্‌তে লাগল। এই তৃতীয় দলের নাম বিপ্লবপন্থী অর্থাৎ ভারতীয় বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর উচ্ছেদ-প্রয়াসী। এঁদের অধিকাংশই গুপ্ত সমিতির কোন ধার ধারতেন না। আর অনেকে ধার ধারতে চাইতেন না। অনেকে আবার বাইরে মডারেট্ বা এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট আর ভেতরে বিপ্লবপন্থী ছিলেন। কিন্তু গুপ্ত-সমিতির লক্ষ্যের সঙ্গে এঁদের লক্ষ্যের বিশেষ কিছু তফাৎ ছিল না। অর্থাৎ ইংরেজকে এ দেশ

থেকে তাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় কোন বিশেষ লোকের হাতে এ দেশের শাসনভার তুলে দেয়াই ছিল উভয়ের লক্ষ্য।

জনকত খুব শক্তিশালী সেকেলে নেতা এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে মতদ্বন্দ্বিতার ফলে ছোটবড় বিস্তর বক্তা ও লেখকের আবির্ভাব হ'য়েছিল। তাঁ'দের বক্তৃতা ও লেখার চোটে দেশের আপামর সাধারণ স্বদেশী কথাটির মানে না বুঝেই স্বদেশী হবার জন্য সাড়া দিয়েছিল। বিদেশীকে দোষ দেওয়া, কর্কচ নুণ আর ময়লা চিনি খাওয়া, তাঁতের বা দেশী মিলের কাপড় পরা এবং এই রকম আরও কিছু করাকে তাঁ'রা স্বদেশী হওয়া ব'লে বুঝেছিলেন।

এই তথা-কথিত স্বদেশী ভাবটা কেবল হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মুসলমানগণ সরকারের পক্ষ নিয়েছিলেন, আর অনেক স্থলে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণও ক'রেছিলেন। কাযেই মুসলমানবিদ্বেষ হিন্দুদের মধ্যে আরও বেড়ে উঠেছিল। এ দেখেও হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার প্রতি নেতাদের চিন্তা আকৃষ্ট হয়নি। তখন এর সমাধানের চেষ্টা ত অনেক দূরের কথা ছিল, বরং ক্রমে এই সমস্ত আন্দোলনটা এ দেশে হিন্দুয়ানীর প্রাধান্য বিস্তারের আন্দোলনে পরিণত হ'তে যাচ্ছিল। মুসলমানগণও এর প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির ওপর অত্যাচার সুরু ক'রেছিলেন।

বৈপ্লবিক তাণ্ডব ব্যাপার আরম্ভ হবার ঠিক আগে দেশের এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বৈপ্লবিক-কার্য্যানুষ্ঠান

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে 'ক'-বাবু কলকাতায় আবার ফিরে এলেন। 'ক'-বাবুর সহযোগী আর একজন নেতাও এই সময় বাংলা দেশে এসেছিলেন। পূর্ব্বে তাঁ'কে 'গ'-বাবু ব'লে পরিচয় দিয়েছি। এঁরা দু'জন এবং আরও তিন চার জন নেতা ও অনেক সহকারী নেতা মিলে কলকাতায় এই সময় গুপ্তসভার একটি অধিবেশন ক'রেছিলেন। তা'তে তখনকার গুপ্তসমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি মতলব আঁটা হ'য়েছিল। তা'র মধ্যে এই ক'টি উল্লেখযোগ্য ;—'একৃসন' (action) সুরু করা, স্থানে স্থানে ভবানীমন্দির স্থাপন করা এবং বিপ্লববাদের মুখপত্র স্বরূপ একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করা।

তখন 'একৃসন্' (action) বল্‌তে প্রধানতঃ আমরা এই বুঝতাম যে, ইংরেজ কর্ম্মচারীকে গুপ্তহত্যা এবং সরকার বা কোন ইংরেজের টাকাকড়ি লুট করা। (প্রথমে কিন্তু "বিধবার ঘটী চুরির" বিধান মঞ্জুর হয়নি)। ঐ "একৃসনের" উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের তখনকার ধারণা এই ছিল যে, উল্লিখিত রকমের একটা ঘটনা ঘটাতে পার্‌লে, সে সংবাদ দেশময় তীব্রবেগে রাষ্ট্র হ'য়ে, আলোচনার জন্য সর্ব্বসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করবে। আর সে ঘটনার উদ্দেশ্য যে তা'রা আপনারাই সহজে ধ'রে নিতে পার্‌বে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না। তা'তে ক'রে আপামরসাধারণের মধ্যে বিপ্লববাদের আদর্শ প্রচার সহজসাধ্য হ'বে, এইটেই নাকি ছিল বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির আদর্শ প্রচারের প্রধানতম

পন্থা। দেশের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণতা পূর্ব্ব হ'তে ক্রমে বেড়ে ওঠার ফলে দেশের লোক মনে মনে এতে বেশ তৃপ্তি অনুভব করবে। এই প্রকারে বিপ্লববাদের প্রতি উত্তরোত্তর তা'দের সহানুভূতি গজিয়ে উঠবে। এ হেন সহানুভূতিই নাকি বিপ্লবকে সফল করবার ভিত্তিস্বরূপ।

অন্য উদ্দেশ্য ছিল—ইংরেজবধ বা ডাকাতির দ্বারা নরহত্যা, বলপ্রয়োগ এবং নিষ্ঠুরতার প্রতি আমাদের স্বভাবসুলভ বিমুখতা, ভয় বা আতঙ্ক দূরীভূত করা; ডাকাতি করতে গিয়ে মারামারি কাটাকাটি ব্যাপারে যুদ্ধের উপযোগী সাহস, শক্তি ও অভ্যাস অর্জ্জন করা; আর এর দ্বারা গুপ্তসমিতির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, বিশেষ ক'রে ধনীদের কাছ থেকে মোটামুটি রকমের অর্থ-সাহায্য লাভ করা। কারণ তখন অনেকে দু'পাঁচ হাজার টাকা, যে কোন একটা বড় ইংরেজের মুণ্ডপাতের জন্য পুরস্কার বা মজুরীস্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

এই তথাকথিত "এক্‌সনের" উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে কি বিষম অন্তরায় বা দোষ থাকতে পারে, তা' আমাদের নেতাদের মাথায় আসেইনি। নেতারা যদিও অন্যদেশের বিপ্লবের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা প্রভৃতি পূরোদস্তুর অধ্যয়ন ক'রেছিলেন, এবং নিজেরাও গবেষণাপূর্ণ মতামত প্রকাশ করতেন, তথাপি তার অভিজ্ঞতা তাঁরা কেন যে কাযে না লাগিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অভিনয় করতে গেলেন, তা' বোঝা মুস্কিল।

মনে হয়, একটা মারাত্মক রোগে আমরা—ভারতবাসী প্রায় সকলে —প্রবলরূপে আক্রান্ত। সেটা হচ্ছে অনুকরণ-আতঙ্ক, বৈদেশিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত না হবার হয় ত এও ছিল কতকটা কারণ। এ দেশের লোকের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাও হয় ত বা এর

আর একটা কারণ। অথবা নেতাদের মানসিক দুর্ব্বলতা বা মস্তিষ্কের আলস্যও অন্যতম কারণ ব'লে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

যাই হোক, একটা অন্তরায় সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈপ্লবিক খুন বা ডাকাতির ফলে, সকল দেশেই সরকারের পক্ষ হ'তে শান্তিশৃঙ্খলা অর্থাৎ দেশে তাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য, বৈপ্লবিকদের কৃত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ দেশের লোকের ওপর অনেক প্রকার অন্যায়-অত্যাচার সাধিত হ'য়ে থাকে ; এটা অতিশয় মামুলী কথা। অবস্থাভেদে বিপ্লববাদীদের পক্ষে এর ফল ভালও হয়, আবার মন্দও হ'তে পারে।

দুনিয়ার অনেক জাতির পক্ষে অন্যায়-অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করা তা'দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তা'রা অন্যায়ের প্রতিশোধ দিতে গিয়ে মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ ব'লে মনে করে, তথাপি অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে থাক্‌বার প্রবৃত্তি তা'দের হয় না। এ স্থলে বৈপ্লবিক "এক্‌সন্" সুরু করার পর গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে উৎপীড়ন আরম্ভ হয়, তা'তে "এক্‌সনের" পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সফল হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ক্বচিৎ কোন জাতি অন্যায় অত্যাচারে এমনই অভ্যস্ত যে, অন্যায়কারীকে দণ্ড দেবার বা অন্যায়ের প্রতীকার কর্‌বার প্রবৃত্তি তা'দের মনে জাগে না ; (অথবা ক্বচিৎ জাগলেও তা' ঘরে ব'সে কান্নাতে পর্য্যবসিত হয়) বরং যা'রা এ রকম অন্যায় অত্যাচার করে, তা'দের প্রতি গৃহপালিত পশুর মত ভয় বা ভক্তিপরায়ণ হওয়াটা তা'দের স্বভাবে পরিণত হ'য়েছে। তা'দের এই রকম সহনশীল ও ভয় বা ভক্তিপরায়ণ স্বভাবের পরিবর্ত্তন না করিয়ে উল্লিখিত "এক্‌সন্" সুরু কর্‌লে তা'র ফল অতি শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়ানই সম্ভব। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হ'তে ভীষণ উৎপীড়নের ফলে সমস্ত জাতিটা এমন ভীরু কাপুরুষ হ'য়ে পড়ে যে, তা' থেকে তা'দের উদ্ধার করা দুষ্কর ও সুদূরপরাহত হ'য়ে যায়। আমাদের ভারতের পক্ষেও কি

এই কথাটা খাটেনা? আমাদের দেশটা যে এখন সেই উদার তাঁতির দেশে পরিণত হ'য়েছে, আর আমরা যে এই ক'বছরে এত রকমারি "কিছুমিছু" খাচ্ছি, এটা কিসের পরিণাম?

বিপ্লব মানে কি?

Revolution শব্দের বাংলা অর্থ আমরা ক'রে নিয়েছি, বিপ্লব। দেখা যায়, ইতিহাসে revolution শব্দটা একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে। কোন দেশের শাসন-প্রণালী যদি হঠাৎ কোন ভীষণ (violent) উপায়ে আমূল পরিবর্ত্তিত হয়, যদি সেই পরিবর্ত্তন সে দেশের জনসাধারণের সাহায্যে বা চেষ্টায় সাধিত হয়, যদি পরিবর্ত্তিত শাসনকার্য্যে সে দেশের সর্ব্বসাধারণের সম্যক্ অধিকার লাভ হয়, তবে সেই পরিবর্ত্তনকে রেভলিউসন্ বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু বিপ্লবের চেষ্টাজনিত সংঘর্ষের পরিণামে যদি ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, তবে কেবল পরিবর্ত্তন আন্‌বার চেষ্টাকে পরে "রেভলিউসন্' বলা হয়নি। আর এই চেষ্টার ফলে শাসনপ্রণালীর উক্ত প্রকার আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটে, যেখানে খালি শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সেখানেও তা' "রেভলিউসন্" ব'লে অভিহিত হয়নি।

রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে যখন ঐ উপায়ে গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, তখনই সেই পরিবর্ত্তনকে "রেভলিউসন্" বলা হ'য়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির বদলে যখন রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হ'য়েছে, তখন সে পরিবর্ত্তনকে বিশেষ ক'রে "রেভলিউসন্" বলা হয় নি।

বিপ্লব শব্দটি আমাদের দেশে ঐ রকম অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছিল কিনা সন্দেহ। যদি হ'ত, তবে যে জনসাধারণের জন্য তথাকথিত বিপ্লব সংঘটন কর্‌বার চেষ্টা হচ্ছিল, সেই জনসাধারণের অন্ততঃ কাউকেও

জানতে দেওয়া হ'ত যে, ইংরেজের শাসনপ্রণালীর বদলে কি প্রকার নতুন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হ'বে। এইটি স্পষ্ট ক'রে জানান হচ্ছে বিপ্লববাদ প্রচারের গোড়ার কথা।

অধিকন্তু জনসাধারণ ত' অনেক দূরের কথা, আমাদের গুপ্তসমিতির শতকরা ৯৯ জনের মনে এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই আসে নি। আমরা জানতাম, ইংরেজ রাজের বদলে দেশের কোন লোক রাজা হ'লে সেই রাজাটি রামচন্দ্র প্যাটার্ণ হবেই। আর সেই সঙ্গে এও জানতাম, রামরাজ্য হচ্ছে আদর্শের চরম। রামরাজ্যের পূর্ণ পত্তন হ'লেও ইংরেজ রাজের পরিবর্ত্তে স্বদেশী রাজার আমদানীকে বিপ্লব বলা যেতে পারে না, কারণ, ইংরেজের বেলায় যে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী আছে, স্বদেশী হবু রাজার বেলায় ও তাই হ'বে। অর্থাৎ এতে কেবল রাজার পরিবর্ত্তন,— শাসন-প্রণালীরপরিবর্ত্তন নয়। কাজেই একে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত।

তা'র পর ইতিহাসে এ-ও দেখতে পাওয়া যায় যে, বিপ্লবের কায বা "একসন্" আরম্ভ কর্‌বার পূর্ব্বে দেশবাসীর চরিত্রে কতকগুলি সদ্‌গুণ ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা হ'য়ে থাকে। এটা বহুকালব্যাপী শিক্ষা সাপেক্ষ। কিন্তু এইটি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য এবং এইটিই বিপ্লববাদ প্রচারের ভিত্তিস্বরূপ। সেই গুণগুলি যত দিন না জাতীয় চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, তত দিন বিপ্লবকার্য্য অর্থাৎ "একসন্" আরম্ভ করা সম্ভব হয় না, অথবা আরম্ভ কর্‌লে বিপ্লবচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনবার ফরাসী-বিপ্লবের মধ্যে আগের দু'বার তাই ব্যর্থ হ'য়েছিল।

যাই হোক্, বিপ্লবোপযোগী জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ হচ্ছে যুক্তিপ্রবণতা, অর্থাৎ শাস্ত্র, লোকাচার বা পূর্ব্ববর্ণিত ঠাকুরমা'র সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের অপেক্ষা নিজের যুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের ওপর অধিক নির্ভর করতে, শুধু শেখা নয়, তা'তে অভ্যস্ত হওয়া। "পরের

বুদ্ধিতে রাজা হবার চেয়ে নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল' এই নীতিতে অভ্যস্ত হওয়া।

তা'র পর অতীতে বীতশ্রদ্ধা, বর্ত্তমানে অতিষ্ঠতা, ভবিষ্যত উন্নতির জন্য অসহিষ্ণুতা, পরিবর্ত্তনে আগ্রহ, নতুনত্বে স্পৃহা ইত্যাদি গুণ সকলও জাতীয় চরিত্রে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা সম্যক্ সফল না হ'লে, এবং উন্নতির পথরোধক বা অবনতির কারণ—কত যুগের অভ্যস্ত জাতীয় চরিত্রের বদ্‌গুণগুলা, অন্ততঃ পরিহারের যোগ্যতা সম্যক্ অর্জ্জন কর্‌বার পূর্ব্বে বৈপ্লবিক কায আরম্ভ ক'রে কোন দেশে কোন বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে কখনও সাধিত হ'য়েছে ব'লে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। শুধু বিফলতা নয়, বরং পুনরায় বিপ্লবসংঘটনের আশা পর্য্যন্ত সুদূরপরাহত হ'য়েছে ব'লেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পক্ষেও কি এটা সত্য নয়? এর জন্য দায়ী কে?

গোড়াতে আমাদের যে "এক্‌সন্" আরম্ভ হ'য়েছিল, তা'র নমুনা হচ্ছে দু' একটা ফিরিঙ্গী ঠেঙ্গান আর তা'দের ছড়িটা কিম্বা টুপীটা কেড়ে নেওয়া; তাও সত্যি ক'রে ঘ'টেছিল কি না সন্দেহ। এই কাযের জন্য বাহাদুরী দিতে ও নিতে শুনেছি মাত্র।

ভবানী-মন্দির

এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হ'তে 'আনন্দ-মঠের' অনুকরণে ভবানী-মন্দিরের খেয়াল দেবব্রত বাবুর মাথায় এসেছিল। শুনেছিলাম, তা'র মতলব ছিল, লোকচক্ষুর আড়ালে, পাহাড়ে বা জঙ্গলে এক একটি কুটীর তয়ের ক'রে তাতে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করা। ভক্তদের ভয় ও ভক্তি উদ্রেকের জন্য যত রকম আড়ম্বর ও উপসর্গ হ'তে পারে তা'তে তা' থাক্‌বে। একজন সত্যানন্দের মত গেরুয়াধারী পূজারী সেখানে থেকে ভবানীর নানা রূপের নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়ে ভক্তদিগকে ভবানীরূপী

দেশ উদ্ধারের জন্য সম্মোহিত করবে। খরচ সঙ্কুলনের এবং পুলিসের চোখে ধূলো দেবার জন্য সেখানে হবে চাষ-আবাদের চেষ্টা। শক্তি অনুশীলনের জন্য লাঠী, তলোয়ার, বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি ব্যবহার শিক্ষার ব্যবস্থা থাক্‌বে। আর সেখানে থাক্‌বে সংগৃহীত বন্দুক, গোলাগুলী প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লুকিয়ে রাখবার স্থবিধা। যখন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে উঠবে, তখন ঐ ভবানী মন্দির দুর্ভেদ্য কেল্লায় পরিণত হবে। দুর্ভেদ্য, কারণ মন্দিরে প্রবেশ ক'রে ধর্ম্মের পবিত্রতা নাশ করা ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ যে!

এই সকল মতলবের আভাষ ও আনন্দ-মঠের অনুকরণে গুপ্তসমিতি পরিচালনের কায়দা-কানুনের ইঙ্গিত দিয়ে 'ভবানী-মন্দির' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত ও বিলান হ'য়েছিল।

এই সময় হ'তে ইংরেজ-বিদ্বেষমূলক পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তিপত্র ডাকে স্কুল-কলেজে, উকীল ও মোক্তার বার প্রভৃতিতে প্রেরিত হ'তে স্থরু হয়েছিল। কিছু দিন পরে ভবানী-মন্দির স্থাপনার জন্য মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার সীমানায় ফলকুসমা বা ছেঁদাপাথর নামক স্থানে কয়েক বিঘা জমী বন্দোবস্ত নিয়ে, স্বদেশের কাযে সমর্পিতপ্রাণ কয়েকজন ছেলেকে আবাদ করতে পাঠান হ'য়েছিল। দারুণ গ্রীষ্মকাল, পাহাড়ে যায়গা, দু' তিন মাইল দূর থেকে জল ব'য়ে এনে রান্না, মাজা, ধোয়া প্রভৃতি সারতে হ'ত। খাদ্যের মধ্যে মিলত মোটা চাল, মসুর ডাল, আর চিড়ে-গুড়। বলা বাহুল্য যে, ছেলেরা নিজেরাই বামুন-চাকরের কায করত তা'র ওপর পাহাড়ে যায়গায় শুক্‌নো মাটী কেটে বাঁধ দিতে হ'ত। এ রকম হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও চেষ্টার পরেও আবাদের কোন সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে এবং অসুস্থ হ'য়ে ছেলেরা একে একে সরে প'ড়তে বাধ্য হ'য়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত যে ছেলেটি "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" পণ

ক'রে প'ড়ে ছিল, সেই দুর্গাকে এক দিন বৈশাখের দুপুর রোদে, খালি মাথায় (মনে হয় খালি পায়েও) ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে পাথুরে রাস্তায় প্রায় ৪০ মাইল হেঁটে মেদিনীপুরে ফিরে আসতে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছলাম। তার মত দেশের জন্য এতদূর কর্ত্তে পারি নি ব'লে অন্ততঃ তখনকার মত আমার মনে আত্মগ্লানি এসেছিল। এ হেন ছেলেরা ক্রমে নেতাদের বেগতিক দেখে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হ'য়েছিল। এতকাল এরা যে রকম দৈন্যক্লেশ আদি স্ব-ইচ্ছায় ভোগ ক'রেছিল, সুশ্রম কারাদণ্ডের সঙ্গেও তার তুলনা হয় না।

যাই হোক্, মতলব অনুযায়ী ভবানী-মন্দির আর কোথাও তখন গড়ে ওঠে নি। তবে ভবানী-মন্দির স্থাপনের চেষ্টা বিফল হ'লেও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা অন্য রকমে হ'য়েছিল।

তখন আমরা শুনেছিলাম, 'ক'-বাবু অলৌকিক শক্তিলাভের জন্য কোন এক সিদ্ধপুরুষের কাছে মন্ত্র নিয়ে এসেছেন এবং সাধনা করছেন। তিনি প্রাতঃস্নানের পর চণ্ডীপাঠ ও পূজা সমাধা ক'রে তবে বাইরে আসতেন। গুজরাটী বা মারাঠী গুরু চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা কেমন করে দিয়েছিলেন, তখন তা' ভেবে পাইনি, কারণ, আমার ধারণা ছিল, দুর্গাপূজা ও চণ্ডীপাঠের চলন বাংলাদেশের বাইরে কোথাও নেই। এখন মনে হয়, চণ্ডীর অসুরবধ ব্যাপারের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের ইংরেজবধ ব্যাপারটার উপমা বেশ খাপ খায়। তাতে আবার আমাদের মনটা এমনই যুক্তি-বিমুখ যে, যুক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের মন সত্য ধরতে অভ্যস্ত নয়। আমরা উপমা দ্বারাই সহজে সত্য দেখতে পাই, আর অন্ধবিশ্বাস এবং ভক্তি দ্বারাই তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করি। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনায় লিখেছি। চণ্ডীর দ্বারা সে উদ্দেশ্য-সাধনের অধিক সম্ভাবনা ছিল। তা'

বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দমঠে' ভবানী ও দশমহাবিদ্যার অভাব ছিল না, কিন্তু তা'তে গীতাপাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। সে যাই হোক্, 'ক'-বাবু অল্পদিন পরে, মনে হয়, বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলাদেশে দুর্গাপূজার ও চণ্ডীর প্রচলন সত্ত্বেও গীতার প্রভাব অপেক্ষাকৃত ঢের বেশী। অথচ চণ্ডীর সুবিধামত হরেক রকম গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা বোধ হয় চলে না। কিন্তু গীতার দার্শনিক ব্যাখ্যার অন্ত হয় না, তাই বোধ হয়, 'ক'-বাবু চণ্ডী ছেড়ে অবশেষে গীতা ধরেছিলেন।

বস্তুতঃ ধ্যান ধারণাদির দ্বারা তথাকথিত অলৌকিক শক্তি লাভ ক'রে ভক্তকে তাক্ লাগান ছাড়া, সাধারণের হিতজনক কোন বড় রকম বাস্তব কায (সে কালে নাকি সাধিত হ'ত) কিন্তু এ কালে সত্যি ক'রে সাধিত হয়নি; আপাততঃ হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কে ধারণা করাও যায় না। তবে এর দ্বারা যে বিপুল লৌকিক শক্তি লাভ করা যায়, অর্থাৎ এই উপায়ে লোকমত (popularity) সংগ্রহ যে চূড়ান্ত মাত্রায় হ'য়ে থাকে, বিশেষতঃ আমাদের ভক্তির দেশে, আর সেই পপুলারিটী যে লৌকিক ব্যাপারে অতুলনীয় শক্তি, সে বিষয়ে অন্ততঃ এখন কারও সন্দেহ করবার বোধ হয় কিছু নেই।

'যুগান্তর'

আমাদের বারীনও এই সময় বাংলায় ফিরে এসেছিল। আবার সে গুপ্ত সমিতি গঠনে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। তা'র প্রধান কায হ'য়েছিল উল্লিখিত সংবাদপত্র বে'র করা। প্রথমে অতি সামান্যভাবে 'যুগান্তর' নাম দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হ'ল। ভাষা ও ভাবের নতুনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে অনেকে 'যুগান্তরের' পক্ষপাতী হ'তে লাগলেন। কলকাতায় চাঁপাতলা কানাই ধরের লেনে একটি বাড়ী

ভাড়া নিয়ে সেখানে 'যুগান্তর' আফিস খোলা হ'ল। প্রথমে 'যুগান্তরে' যাঁরা লিখতেন, তাঁরা বিলেতী শিক্ষায় ও স্বাধীন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, কিন্তু বোধ হয়, বাংলা খবরের কাগজ পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন না। কাযেই সে কালে এ দেশের বাংলা কাগজে যে ধরণে প্রবন্ধাদি লিখিত হ'ত, তা থেকে 'যুগান্তরের' লেখ্‌বার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তাঁ'দের লিখিত যে সকল বাংলা প্রবন্ধ 'যুগান্তরের' জন্য দিতেন, তা' প্রায়ই ইংরেজী বাংলা শব্দ মিশিয়ে লেখা হ'ত। দেবব্রত বাবু, সখারাম বাবু, ভূপেন বাবু ও অন্য দু এক জন ইংরেজী শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ দিয়ে ঐ প্রবন্ধগুলির ভাষাকে প্রাঞ্জল কর্‌তেন। দেবব্রত বাবু ও সখারাম বাবু নিজেরাও সুন্দর লিখ্‌তেন। অন্যান্য লেখকদের ওপরও তাঁ'দের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে লেখকও অনেক বাড়তে লাগল।

প্রথম প্রথম 'যুগান্তরের' লেখার মধ্যে হিন্দুয়ানীর ভাব খুব বেশী না থাকলেও, একবারে secular অর্থাৎ ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন ছিল না। প্রথমেই সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপর গীতার একটি শ্লোক থাকত, তা'র পর ক্রমে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র হ'তে মাঝে মাঝে উপমা, quotation, allusion, প্রবন্ধ প্রভৃতি থাকত। প্রচ্ছদে একটি পতাকা, তা'তে খড়্গধারিণী কালীর হাতের ছবি ছিল। এতে মনে হয়, এর পরিচালক নেতারা মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করেন নি।

বিপ্লববাদ সমর্থন ক'রে যে সকল প্রবন্ধাদি বের হ'ত, তা' খুব মনোজ্ঞ হ'ত এবং সে জন্য লোককে বিপ্লবপন্থীর দলে টেনে আনার সুবিধা হ'ত। দেশের লোক ধারণাই কর্ত্তে পারত না যে, এই নির্জ্জীব শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী, যা'রা যুদ্ধের নামে মূর্চ্ছা যায়, তা'রা কি রকম ক'রে হঠাৎ দলে দলে ইংরেজ পল্টনের বন্দুক-কামানের সামনে লড়বে।

বন্দুক, গোলাগুলী, বারুদই বা কোথা হ'তে আসবে? এত টাকাই বা কে দেবে? এই রকম সকল অসম্ভব কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে, নানাভাবে 'যুগান্তরে' তাই লিখে দেশের লোকের ধারণা বদ্‌লে দেবার চেষ্টা হ'ত।

'যুগান্তরে' স্বদেশপ্রীতির চাইতে ইংরেজ-বিদ্বেষ বাড়াবার চেষ্টা বেশী হ'ত। 'আনন্দ-মঠের' যুদ্ধবিগ্রহের লক্ষ্য ছিল কেবল সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার। ইংরেজ তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্য যে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ছাড়া আরও কিছু এবং সে কিছু যে কি, তা' কোন রকমে স্পষ্ট ক'রে দেশকে বোঝাবার চেষ্টা 'যুগান্তরে' হ'য়েছিল ব'লে মনে হয় না। তবে দেশ স্বাধীন হ'লে যে নুণের ট্যাক্স, চৌকিদারী ট্যাক্স বা আরও অনেক ট্যাক্সের মধ্যে কোনটা বা একেবারে দিতে হ'বে না, আর কোনটা অনেক কম দিতে হবে, বড় বড় চাকরীগুলো সব আমরাই পা'ব, আবশ্যক দ্রব্যের মূল্য ইচ্ছামত কমিয়ে দিতে পার্‌ব ইত্যাদি মামুলী স্তোকবাক্যগুলি 'যুগান্তরে'ও স্থান পেত।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ কিংবা এপ্রিল মাসের প্রথমে 'যুগান্তর' বেরিয়েছিল। সে সময় প্রায় অন্য সকল গুপ্তসমিতি 'ক'বাবুর দলে অস্ত্র-বিস্তর যোগ দিয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই ঐ সকল দলে নেতারা বারীনের আধিপত্যপ্রিয়তার জ্বালায় ও বারীনের প্রতি 'ক'বাবুর পক্ষপাতিতায় স'রে পড়তে বাধ্য হ'য়েছিলেন। প্রায় এক বছর পরে 'যুগান্তরের' যখন বেশ আয় হচ্ছিল, তখন 'ক'বাবুর দলের হাত থেকে 'যুগান্তরের' ভার ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন অন্য এক দলের হাতে গেছল। তখন 'যুগান্তরের' প্রথম সম্পাদক ভূপেন বাবু জেলে।

ঐ 'যুগান্তর' আফিসেই তখনকার গুপ্তসমিতির আড্ডা ছিল। এইটেই বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের বা দেবব্রত বাবুর ভবানী-মন্দিরের স্থানীয় ছিল

বল্‌লেও হয়। কিন্তু ভবানী-মূর্ত্তি এতে ছিল না। নীচের তলায় ছিল প্রেস। ওপরের তলায় আফিস, শোবার ঘর আর একটি ছোট্ট কুঠ্‌রীতে একটা কাঠের সিন্দুক ছিল। তা'তে থাক্‌তো নাকি অস্ত্র-শস্ত্র। তা'র সারান ও পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল একটি অজাতশ্মশ্রু বালক নেতার ওপর। এঁর কাছে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের একটু বেশী রকম লম্বা-চওড়া বচন শুনে, এক দিন গোটাকতক রিভলবার কিন্‌তে গেছলাম! দেবব্রত বাবু সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অস্ত্রাগারে তিনি আমায় খুব ভারী চালে, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা অনেক রকম বচন দিলেন। আমি রিভলবারের কথা তুল্‌তে, তিনি সেই বালক নেতাকে ডেকে রিভলবার দেখাতে আদেশ দিলেন। একটা সেকেলে রিভলবার আমায় দেখান হ'ল। আমি নগদ মূল্যস্বরূপ কয়েকখানা নোট বার ক'রে তিনটে কি চারটে রিভলবার চেয়ে বস্‌লাম। তা'তে বুঝলাম, সেই একটি মাত্র সম্বল। আর বুঝলাম, অস্ত্রাগারের শূন্যতা পূরণের জন্য ছিল এত বচন। শীঘ্র পাঠিয়ে দেবার করারে মূল্য জমা নিলেন। তা'র পর অনেক তাগাদা ক'রে দু' মাস পরে একটামাত্র ভাঙ্গা পুরোন রিভলবার আদায় কর্‌তে পেরেছিলাম। তা'ও সারাবার জন্য পাঠিয়ে আর ফেরত পাইনি।

এই চাঁপাতলার আড্ডাতেই প্রথম নরেন গোসাইঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল। তা'র সুন্দর সুঠাম দেহে গৈরিক ছিল। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম, তখন সে যোগসাধনা কচ্ছিল। তা'দের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হ'তেই জান্‌তাম। তা'র স্ত্রী ছেলেপিলেও ছিল। এ অবস্থায় সে আগে গৃহত্যাগী বৈরাগী হ'য়েছে, তা'র ওপর গুপ্তসমিতির মরণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচে, ভেবে যেমন অবাক্ হ'য়েছিলাম, তেমনই তা'র প্রতি আমার শ্রদ্ধাও গজিয়ে উঠেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্ষুদিরাম

ঐ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুরে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এই সময় ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও গালাগালিপুর্ণ 'সোনার-বাংলা' নামক বে-নামী বাংলা "পাম্পলেট্" একটা নাকি প্রচারিত হ'য়েছিল। তা'র ইংরেজী অনুবাদ 'পাইওনিয়ার' পত্রে প্রকাশিত হ'লে ইংরেজমহলে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সত্যেন তা'র আবার বাংলা অনুবাদ ক'রে হাজারখানেক ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারের কাছে ক্ষুদিরাম নির্বিচারে সকলকে ঐ পাম্পলেটগুলি বিলি কর্‌ছিল; এমন সময় এক জন হেড কনেষ্টবল এসে তা'কে গ্রেপ্তার করাতে সে নাকি বক্সিংএর খুব কেরামতি দেখিয়েছিল। ইত্যবসরে সত্যেন সেখানে এ'সে প'ড়ে ব'লে উঠল, "উও ডিপ্‌টীকা লেড়কা হ্যায়, উস্‌কো কেঁও পাক্‌ড়ায়া।" সত্যেন ছিল প্রদর্শনীর সহকারী সম্পাদক এবং তখন কালেক্টারীতে এক জন ডেপুটী বাবুর এজলাসে কেরাণীর কায কর্‌ত। জমাদার সত্যেনকে চিনত, সে ডেপুটীর নাম শুনে, নাকে রক্তপাত সত্ত্বেও ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দিয়েছিল। পরক্ষণে যখন তা'র ভুল ভাঙ্গল, তখন আর ক্ষুদিরামকে খুঁজে পাওয়া গেলনা।

পুলিসকে ধোঁকা দেবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে সত্যেনকে কৈফিয়ৎ দিতে হ'য়েছিল। তা'তে বোধ হয়, তা'কে দোষী সাব্যস্ত করবার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে সে নাকি বে-পরোয়াভাবে হেসে হেসে জবাব দিয়েছিল; তাই সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীগিরি হ'তে তা'কে

বরখাস্ত করা হ'য়েছিল। ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে কিন্তু রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হ'ল। বাংলাদেশে বিপ্লব-বাদীর বিরুদ্ধে, বোধ হয়, এই প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগ।

ফেরারী অবস্থায় কিছুকাল থাকবার পর ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর এসে ধরা দিল। মোকর্দ্দমা দায়রায় গেল। অনেক উকীল ব্যারিষ্টার দয়া ক'রে আদালতে ক্ষুদিরামের পক্ষসমর্থনের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর কি জানি কি মনে ক'রে মোকর্দ্দমা তুলে নিয়েছিলেন।

পুলিসের হাতে ধরা দেবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষুদিরামকে দণ্ডবিধির ১২১, ১২৪ প্রভৃতি ধারা পড়ে শোনান হ'য়েছিল। একরার করাবার জন্য পুলিস তা'কে কি রকম যন্ত্রণা দিতে পারে, যত দূর সম্ভব অতিরঞ্জিত ক'রে তা' তা'কে শোনান হ'য়েছিল এবং দোষী সাব্যস্ত হ'লে পরিণামে যে রকম ভীষণ দণ্ড হ'তে পারে, তাও অনেক বাড়িয়ে-সাড়িয়ে তা'কে বলা হ'য়েছিল; আমাদের ভয় হ'য়েছিল, সে পাছে মোকর্দ্দমার পরিণাম চিন্তা ক'রে পুলিসের অত্যাচার ও পট্টিতে সব হালচাল ব'লে দেয়। কিন্তু এত সব শোনবার পরও সে, যে রকম অম্লানবদনে পুলিসের হাতে ধরা দিতে রাজী হ'য়েছিল, তা'তে আর আমাদের কোন দ্বিধা থাকেনি। আর ধরা দেবার পর পুলিসের অনেক চেষ্টা সত্বেও সে কোন কথা প্রকাশ করেনি।

এখানে ক্ষুদিরামের অল্প একটু পরিচয় দেওয়া উচিত। ক্ষুদিরামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ওপরে লিখিত ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে। এক দিন সন্ধ্যেবেলা আমি মেদিনীপুরের কোন নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে একটু দূরে কয়েকজন ছেলে ব'সে ছিল। তা'র মধ্যে থেকে ক্ষুদিরাম দৌড়ে এসে আমার বাইক আটকে, অত্যন্ত সহজভাবে ব'লেছিল, তা'কে একটি রিভলবার দিতে হবে।

তখন তা'র বয়স আন্দাজ ১৪ বছর, কিন্তু তা'কে দেখে তখন আমার মনে হয়ে'ছিল মাত্র বার কি তের বছর। দেখতে ছোট খাট পাতলা হ'লেও শক্ত ও দৃঢ় ছিল।

আমার কাছে যে রিভলবার থাকত বা রিভলবার ব্যবহার যে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, এত কচি ছেলে যখন তা' জান্‌তে পেরেছে, তখন অনেকের মধ্যে কথাটা জানাজানি হ'য়েছে, এই সন্দেহে ভারি বিরক্ত হ'য়ে তা'কে এক চোট বেশ ব'কে দিলাম। কিন্তু তা'তে সে কিছু-মাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে, তা'কে যে একটা রিভলবার দিতেই হবে, তা' এমন অকুণ্ঠিত আগ্রহের সহিত জেদ ধ'রেছিল যে, আমি তা'কে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হয়েছিলাম, রিভলবার নিয়ে সে কি করবে। উত্তরে সে ব'লেছিল, সে একটা "সাহেব" মারবে। "সাহেব" মারবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুব উত্তেজিত হয়ে যা' বলেছিল, তা' শুনে আমি অবাক্ হ'য়ে গেছলাম। এক কথায় তা'র ভাবটা ছিল এই যে, ভারতের ওপর ইংরেজ যে অন্যায় অত্যাচার করেছে, তা'র প্রতিশোধ তা'কে দিতেই হবে। তা'র প্রতি আমার তখনকার হঠাৎ উদ্দীপিত মনের ভাবটা চেপে, রাগ ও বিরক্তির ভাণ ক'রে তা'কে বেশ ধমকে দিয়েছিলাম।

পরে সত্যেনের কাছে খোঁজ ক'রে তা'র সব খবর পাই। সেই হ'তে তা'র ছোটখাট কাযের ভেতর থেকে তা'র কয়েকটি অনন্যসাধারণ গুণের পরিচয় পেয়েছিলাম। একটি হচ্ছে নিজের বা অন্যের প্রতি আচরিত কারও অন্যায় অত্যাচার সে সহ্য করতে পার্‌ত না।

আমাদের হিন্দু-চরিত্রে এই গুণটির একান্ত অভাব। অন্যায়ের দণ্ড নিজ হাতে বিধান কর্‌বার অথবা তা'তে অক্ষম হ'লে অন্যায়কারীর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষপরায়ণ হবার পরিবর্তে, আমরা তথাকথিত অযাচিত ক্ষমা বা প্রেম দেবার ভাণ করি। আর এ হেন দেয়াটা নাকি

হিন্দুরই বৈশিষ্ট্য। আমরা শুধু এই মনে ক'রেই ক্ষান্ত হইলে, তা'র ওপর আবার এই আত্মপ্রবঞ্চনাতে পরম গৌরব অনুভব করি; কারণ, এ নাকি সাত্ত্বিক ভাব।

আবার চিরটি কাল আমরা কার্য্যতঃ অত্যাচারীকে তা'র কৃত অত্যাচারের মাত্রা অনুযায়ী ভয় এবং ভক্তি ক'রে আস্‌ছি। তার ওপর নিত্য ঘরে-বাইরে চোখের সামনে, নিজের ওপর বা যা'কে আমরা আপন জন বলি, তা'দের ওপর কত রকম অন্যায় অত্যাচার সাধিত হ'তে নির্ব্বিকারে দেখছি, অথচ সে ক্ষেত্রে আমাদের বাচনিক কর্ত্তব্য ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তব্য যে আছে, তা' মনে করতেও শিখি নি। আমাদের সেই পূর্ব্বকথিত ঠাকুরমাও তা' শিখিয়ে দেন নি। শুধু নিজের ওপর নয়, শুধু আপন জনের ওপর নয়, এমন কি, কোন জীব-জন্তুর ওপর আচরিত অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকারকল্পে অন্যায়কারীকে দণ্ড দেবার চেষ্টা যে মানুষ না করে, সে দেবতা বা আর কিছু হ'তে পারে, কিন্তু সে মানুষ নয়, তা'র মানে সে মনুষ্যত্বহীন; যে সমাজ ঘরের বা বাইরের কোন প্রকার অন্যায়-অত্যাচারে বিচলিত না হয়, সে সমাজ মৃত; যে সমাজনীতির প্রবর্ত্তক বা নেতা এরূপ অবস্থায় বিপরীত বিধান দেয়, সে অবতার হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু সে জনসাধারণের শত্রু।

লোক-শত্রু ব'লে কোন অপবাদ, পাছে ক্ষমার অবতার যীশুর ওপর আরোপিত হয়, সেই ভয়ে বুঝি বা, যে অনুজ্ঞা তাঁ'র ধর্ম্মের সার—অন্যায় অত্যাচারকারীর প্রতি ক্ষমা, তা তাঁ'র ধর্ম্মাবলম্বীরা কার্য্যতঃ কখনও কোথাও পালন করেন নি।

যা'ই হোক, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যক্রমে জানি না, হিন্দুর এই প্রকৃষ্ট গুণটি ক্ষুদিরামের চরিত্রে বিকাশলাভ করতে পারে নি। নিজে

হিন্দু ব'লে গৌরব অনুভব করলেও, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত সে ছিল হিন্দুকুলে প্রতিহিংসার প্রতিমূর্ত্তি।

সে শৈশবে মা বাপ হারিয়ে আত্মীয়ের সংসারে আশ্রয় লাভ করতে বাধ্য হয়। যা' সচরাচর ঘটে থাকে, ক্ষুদিরামের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। এ হেন অনাথ আশ্রিতের কোন সম্পত্তি না থাকলে ত কথাই নেই, আর যদিই বা থাকে, তা' যত অধিকই হোক, আর তা'তে আশ্রয়দাতার যত সুবিধাই হোক না কেন, আশ্রয়ের মূল্যস্বরূপ পনের আনা তিন পাই স্থলে কিছু না কিছু লাঞ্ছনাভোগ, আর একেবারে ভৃত্য নামে অভিহিত না করলেও ভৃত্যের কায করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। ক্ষুদিরাম পনের আনা তিন পাইর দলেই পড়ে' ছিল। তা'র ওপর নাকি পিতৃদেনা শুধতে আর তা'র এক দিদির বিবাহ দিতে, তা'র সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেচে ফেলতে হ'য়েছিল। তা'তেও যথেষ্ট হয় নি; উক্ত আত্মীয়গণকে নিজস্ব কিছু নাকি দিতে হ'য়েছিল; কাযেই এ হেন অনাথ ক্ষুদিরামের প্রতি তা'র আশ্রয়দাতা আত্মীয়-স্বজন আশ্রয় বা উপকারের মূল্য আদায় করবার জন্য চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থাই ক'রেছিলেন—যা' মন্দলোকে অন্যায় অত্যাচার ব'লে আরোপ ক'রে থাকে। তা' হ'লেও যেমন প্রায় সকল আশ্রিতেরা ক'রে থাকে, তেমনই কৃতজ্ঞতার সহিত ক্ষুদিরামের তা' সহ্য করা উচিত ছিল; তা' হ'লেই সুশীল সুবোধ বালকের মত কায করা হ'ত। কিন্তু ক্ষুদিরামের ছিল বিদ্রোহীর স্বভাব। আশ্রয়দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার বদলে অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ স্বভাবতঃ যে ব্যবহার সে করত, তা' দুরন্তপনা, অশিষ্টতা, অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা, বদ্‌মায়েসী ইত্যাদি ইত্যাদি। তার ফলে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা তা'র ভাগ্যে প্রায়ই জুটত। অবশ্য সেই সঙ্গে অনুপানস্বরূপ

হরেক রকম বাক্যবাণ আর লাঞ্ছনারও ত্রুট হ'ত না। কিন্তু এজন্ত তা'র আত্মীয়স্বজনকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সমাজই এর জন্ত দোষী। যা'ই হোক, আশৈশব এ রকম ঘটনাচক্রে প'ড়েই যে ক্ষুদিরাম বিদ্রোহীর স্বভাব পেয়েছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

যে অন্যায়কারীকে যত অধিক ঘৃণা করে, স্বভাবতঃ সে উৎপীড়িতের প্রতিও তত অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। ক্ষুদিরামেরও তাই হ'য়েছিল।

নিতান্ত অন্যায় উৎপীড়নের দ্বারা নেহাৎ নিরুপায় অবস্থায় একটি কুলবালা, প্রথম যৌবনে তথাকথিত এক বড়লোকের রক্ষিতা হ'তে বাধ্য হ'য়ে, ক্ষুদিরামের আশ্রয়দাতা ভগিনীপতির ঠিক পাশের বাড়ীতে অনেক কাল যাবৎ ছিল। ক্ষুদিরামের দিদির বাড়ীতে তা'র অবাধ যাতায়াত থাকাতে, নিত্য দু'বেলাই ক্ষুদিরামের প্রতি অন্যায় অত্যাচার প্রত্যক্ষ ক'রে তা'র প্রাণে বোধ হয় খুব লাগ্‌ত। তা'র বয়স তখন ২২ কি ২৩ বছর, দেখতে কালো ও খুব মোটা। প্রতিবাদের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে এই রকম উৎপীড়নের কোন প্রতীকারের আশা নেই দেখে, অগত্যা এক দিন ভগিনীর বাড়ী হ'তে অভুক্ত অবস্থায় লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, স্নেহমমতার কাঙ্গাল সেই অনাথাকে, তা'র এক সমবয়েসী ভাগ্‌নের দ্বারা নিজ বাড়ীতে ডেকে এনে, সেই অভাগিনী গোপনে যত্ন সহকারে তা'কে খাইয়েছিল, এবং সে দিন থেকে পরেও খাওয়াত ও তা'র নিতান্ত আবশ্যক যা' তা' তা'কে দিত। এইরূপে এই উৎপীড়িতা কুলটার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া ক্ষুদিরামের পক্ষে সম্ভব হ'য়েছিল।

ক্রমে জানাজানি হওয়ার পর বালক ক্ষুদিরামকে এই ব্যাপারের জন্ত আমাদের মধ্যে অনেকে দোষ দিতে লাগ্‌ল। পরিতাপের বিষয়, সেই

অনেকের মধ্যে এই লেখকও একজন। আমরা কিন্তু যে সন্দেহে তা'কে দোষী করেছিলাম, সে সন্দেহ ক্ষুদিরামের ভগিনীর বাড়ীর কারও মনে জাগে নি। অনেক অনুসন্ধানের ফলে আমাদেরও সে সন্দেহ পরে দূর হয়েছিল। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, পরকীয়াসাধনরূপ লীলা বা "রোমান্স" যেন কোন কোন মহাপুরুষদের জীবনে একটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। অবশ্য ক্ষুদিরামের বেলায় মহাপুরুষত্বের দাবী করা চলে না। তা'র ছিল শুধু পুরুষত্ব অর্থাৎ মনুষ্যত্ব। যে সমাজের নৃশংস ব্যবহার আশৈশব তা'র মনকে এমন বিদ্রোহী ক'রে তুলেছিল, সে সমাজের লোকাচার বা লোকমতের এ হেন বিরুদ্ধাচরণ করাটাই যেন তা'র পক্ষে স্বাভাবিক হ'ত ব'লে মনে হয়। পারিপার্শ্বিক লোকনিন্দা বা স্তুতির দ্বারা চালিত হ'য়ে মন্দ কাযে বিরতি ও ভাল কাযে প্রবৃত্তির ভাবটা, ক্ষুদিরামের মধ্যে যতটা ছিল, তা'র চেয়ে ঢের অধিক ছিল মন্দকাযকরণ জনিত আত্মগ্লানির ভয় ও ভাল কায ক'রে আত্মপ্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্যই সে যে অবস্থার মধ্যে পালিত হয়েছিল, সে অবস্থায় পড়ে সাধারণতঃ লোক যে হীন প্রকৃতি পায়, সে তা' না পেয়ে এক অনন্য-সাধারণ প্রকৃতি পেয়েছিল।

সকল রকম বিপদ, এমন কি, প্রাণনাশের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ ক'রে যে কায করলে লোকে ধন্যবাদ দেয়, এমন দুঃসাধ্য কায করবার সহজ (spontaneous) প্রবৃত্তি, যা'কে সৎসাহস বলে, ক্ষুদিরামের স্বভাবে তা' অত্যন্ত প্রবল ছিল; তা'র পক্ষে এটা নেশার মত ছিল। এ রকমের সৎসাহস তখনই প্রকৃতরূপে সার্থক হয়—যখন এর সঙ্গে প্রধানতঃ আরও দু'টি গুণের সমাবেশ হয়। হঠাৎ আগত সঙ্কটে তড়িঘড়ি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার ক্ষমতা যদিও ক্ষুদিরামের গুরু সত্যেনের অসাধারণ-ভাবে ছিল, ক্ষুদিরামের প্রকৃতিতে তা' বিশেষ রূপ ছিল ব'লে মনে

হয় না। অন্য গুণটি tenacity of purpose, ক্ষুদিরামের স্বভাবে বিশেষরূপে ছিল। যা' করতে হ'বে ব'লে একবার সে স্থির করত' তা' সাধনকালে যত কঠিন ব'লে অনুভূত হোক্ না কেন, বা তা' সম্পন্ন করতে মৃত্যু আসন্ন হ'লেও সে কায সে অসম্পূর্ণ রেখে ছেড়ে দিত না; নেহাৎ ছোটখাট কাযও না। হাডুডু খেলবার সময় ছোট্টখাট রোগা ক্ষুদিরাম সাংঘাতিকরূপে ক্ষতবিক্ষত হওয়া অবশ্যম্ভাবী জেনেও এমন মোরিয়া হ'য়ে প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে ধর্‌ত যে, অপেক্ষাকৃত অনেক বলবান্ ছেলেও তা'র হাত থেকে ছাড়ান পেত না। এত অল্পবয়সে ছাত থেকে লাফিয়ে নীচে পড়া, নদীর ভীষণ স্রোতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়া, ইত্যাদি তা'র অনেক কায থেকে তা'র বৈশিষ্টের পরিচয় পাওয়া যেত।

যা'হোক, পূর্ব্বেই ব'লেছি, ক্ষুদিরাম মহাপুরুষ ছিল না অথবা মানব আকারে শাপভ্রষ্ট দেবতাও ছিল না। সে ছিল বাংলার হাজার হাজার ছেলের মতই একটি ছেলে। তা'রও দোষ ছিল অনেক; আর সে যে জন্য স্বনামধন্য হয়েছে, আমরা এখানে তা'র সেই সহিদ্‌পনার (martyrdom) কথাও ধর্‌ছি না। আমরা দেখ্‌ছি তা'র অন্যায় অত্যাচারের তীব্র অনুভূতি। সে অনুভূতির পরিণতি বক্তৃতায় নয়, বৃথা আস্ফালনে নয়; অসহ্য দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, এমন কি, মৃত্যুকে বরণ ক'রে, প্রতীকার অসম্ভব জেনেও শুধু সেই অনুভূতির জ্বালা নিবারণের জন্য, নিজ হাতে অন্যায়ের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রতিবিধানের চেষ্টা কর্‌বার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি ও সৎসাহস ক্ষুদিরাম-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

নবম পরিচ্ছেদ

বৈপ্লবিক হত্যার প্রথম উত্তম

বাংলা প্রদেশকে দু'ভাগ কর্‌বার পর পূর্ব্ববঙ্গের লাট্ হ'য়েছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সাহেব। তিনি ভারি খোস্‌মেজাজী লোক ছিলেন। লোকে তাঁকে পথে-ঘাটে সেলাম না কর্‌লে তিনি ভারি চ'টে যেতেন। কোন কোন স্থানে 'বন্দে মাতরম্' বলা দণ্ডনীয় হ'য়েছিল। স্কুল-কলেজের অনেক ছেলে এই জন্য অনেক প্রকার দণ্ডভোগ ক'রেছিল। কোথাও কোথাও ছাত্রদের কোন প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ হ'য়েছিল। এই রকম ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে হরেক রকম অত্যাচার চল্‌ছিল।

সেই সময় (১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল) 'পুণ্যে-বিশাল-বরিশালে'র প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যে স্মরণীয় দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তাতে বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের আদিগুরু সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার, বিপিনচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ, উপাধ্যায়, কাব্যবিশারদ ও অন্য অনেক নেতা এবং ডেলি-গেটদের না কি সিপাহীর রেগুলেসন্ ডাণ্ডার—কাউকে কাউকে স্বাদ আর কাউকে বা স্বাদের বিভীষিকা—উপভোগ করতে হ'য়েছিল। শুধু তাই নয়, পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার জন্য থানায় পড়তে, প্রাচীর ডিঙ্গোতে আর পগার পার হ'তেও হ'য়েছিল। অধিকন্তু বহু কালের জন্য সেখানে 'পিটুনী পুলিসও' বসান হ'য়েছিল। এর ফলে এই ঘটনার ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্রগুলো লোকের কানে সহজে ঢুক্‌ত; এমন কি, অনেক হোমরা-চোমরা মডারেটও বিপ্লবের খেয়ালে সই দিতেন।

এই সকল কারণে দেশের অনেক লোকের জাতক্রোধটা ফুলার সাহেবের ওপর ঘনিয়ে উঠেছিল। ফুলার সাহেবকে কেউ বধ করেছে, ঘরের দরজা ভেজিয়ে আরাম-খুরসিতে ব'সে এই খোস্ খবরটা শোন্‌বার জন্য তখন অনেক গণ্যমান্য লোক কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করছিলেন। এমন কি, ঘাতককে দু' পাঁচ হাজার বকসিস্ দেয়ার অঙ্গীকারও দু'চার জন ক'রে ফেলেছিলেন।

আমাদের বারীন এ সুযোগ ছাড়বার পাত্রই ছিল না। কে এক জন বারীনের হাতে নগদ ১ হাজার বায়নাস্বরূপ অগ্রিম দিয়ে ফেলেছিলেন। টাকা বের করবার নেতৃসুলভ শক্তিলাভের সাধনা সে তখন সবে সুরু করেছে।

নেপালের মহারাজার অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানায় না কি এক জন বাঙ্গালী প্রধান মিস্ত্রী ছিল। তাকে দলভুক্ত ক'রে তার সব বিদ্যে মেরে নিয়েছে, বারীন সুবিধামত লোকের কাছে এই রকম বল্‌ত। বিদ্যে মেরে নেওয়া কথাটা বারীনের মুখে অনেকবার শুনেছি। আসলে একটি তখনকার কলেজ ক্লাসের কেমিষ্ট্রী জানা ছেলের সাহায্যে "কলেরিয়া" পটাশের এক রকম বিস্ফোরক তৈরী করেছিল। তাই দুটো প্রকাণ্ড লোহার ফাঁপা গোলার মধ্যে পূরে বোমা ব'লে জাহির কর্‌তো। বিশেষ দরকার হ'লে তার মধ্যে থেকে, একটু গুঁড়ো বের ক'রে দেশ্‌লাই ধরিয়ে দিত, আর অম্‌নি ফোঁস্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ত। এই দেখে, আর খানিক বচনের তুবড়ী শুনেই, অতি সন্তর্পণে ধনীরা মনে করতেন, ইংরেজের দফা এইবার রফা। দেখেছি, এই বোমা জিনিষটার একটা যাদুকরী শক্তি আছে। অতি বড় বুদ্ধিজীবী লোকও বোমা দেখলেই কেমন ঘেব্‌ড়ে যেতেন। যুক্তি-তর্ক সব ঘুচে গিয়ে মুখখানা কেমন মুস্‌ড়ে যেত। বিপ্লবীদের প্রকৃত মুরোদ কতটুকু,

বিশেষ ক'রে বোমাটার শক্তি কতটুকু, সে সন্দেহের আর স্থান থাকত না। যাই হোক, ফুলার লাটকে মারতে না পারলে যে ঐ ১ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে, এ সর্ত্তটা করিয়ে নিতে কিন্তু ভুল হয়নি।

এই হাজার টাকা পেয়ে দুটো তথাকথিত বোমা আর দুটো রিভলবার নিয়ে, বারীন Reconoiter (অর্থাৎ বধ্যকে আক্রমণের স্থান ও সুযোগাদি অনুসন্ধান) করবার জন্য ফুলার লাটের গ্রীষ্মাবাস শিলংএ যাত্রা করল। বন্দোবস্ত ক'রে গেল, সেখান থেকে টেলিগ্রাম করলে কলকাতা থেকে একজন হত্যাকারী পাঠান হবে।

অনেকের ধারণা আছে যে, লটারী ক'রে হত্যাকারী নির্ব্বাচিত হ'ত। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তখন নেতা উপনেতার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু কাযের লোক ছিল না বল্লেই সত্য কথা বলা হয়। বাংলা দেশের নানা স্থানে, বিশেষ ক'রে বম্বে, সেন্ট্রাল প্রভিন্সে, উড়িষ্যায়, বিহারে ও মাদ্রাজে গুপ্ত সমিতির বড় বড় কেন্দ্র ছিল ব'লে বলা হ'ত। পরে জানতে পেরেছিলাম ও নিজেও অনেক স্থানে পরে গিয়ে দেখেছি, বোধ হয়, বম্বে ছাড়া অন্য কোথাও উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই তখন ছিল না। বিপ্লববাদে একটু আধটু সহানুভূতিবিশিষ্ট দু'এক জন মাত্র লোকের যেখানে সন্ধান পেয়েছিলেন, কর্ত্তারা সেই স্থানটাকে মস্ত কেন্দ্র ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন।

দুঃসাহসের কায করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনেকের মধ্যে আছেই। বিশেষতঃ স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়ারূপ বীরত্ব দেখাবার ঝোঁক সদ্য নতুন ক'রে তখন বিদেশ থেকে আমদানী হ'য়েছিল। উত্তেজনার মুখে স্বদেশপ্রেমের দুচার জন নেতার সামনে এই বীরত্ব দেখাবার আন্তরিক প্রবৃত্তি খড়ের আগুনের মত দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠতে পারে সত্য; এবং সেই মুহূর্ত্তে হাতে একটা বোমা বা পিস্তল দিয়ে,

তক্ষুনি স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাতে দিলে যত সহজে তা' সুসম্পন্ন হ'তে পারে, একটু সময় দিলে আর তা' হয় না। তখন এই ধাতের বীরত্ব দেখাবার প্রবৃত্তির বদলে প্রাণের মায়া অন্য কোন নিরাপদ (non-violent) প্রবৃত্তির বেশ ধ'রে মহত্তর হ'য়ে দেখ দেয়। যে দেশে এই বীরত্ব খুব সস্তা, অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশের লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে এই ভাবটা ধরা পড়ে; আমাদের দেশের ত কথাই নেই। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডের তফাৎ বিস্তর; তথাপি যুদ্ধের সময় নিয়ত উত্তেজনাটা জাগিয়ে রাখবার জন্য কত চেষ্টাই না করা হয়!

সে কথা থাক্, এখন আসল কথা বলি। প্রথমে না কি মেদিনীপুরের এক জন বিপ্লবপন্থী যেতে রাজী হ'য়েছিলেন; পরে কি কারণে তিনি যেতে পার্‌লেন না। তখন ক্ষুদিরামের নাম করা হ'ল। পূর্ব্বোল্লিখিত পতিতার সহিত তার সংশ্রবের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে কোন নেতার কাছে বলেছিলাম। সে জন্য হোক্ বা ছেলেমানুষ বলেই হোক্, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক্, তাকে তখন পাঠান কারও মত হ'ল না।

তার পর মেদিনীপুর সমিতির অন্য এক জন যেতে রাজি হ'ল। তখন স্থির হ'ল, বারীনের 'তার' এলেই তাকে শিলং যেতে হবে।

সে ছিল সংসারী মানুষ, তার ছেলেপিলেও কয়েকটি ছিল। পুরোপুরি নিজেকে বিপ্লবের কাযে লাগাবার জন্য সে চাকরী থেকে লম্বা ছুটী নিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় তার ছেলের চিকিৎসার জন্য কল্‌কাতায় অনেক দিন যাবৎ সপরিবারে থাকৃতে হ'য়েছিল। তাই কলকাতার নেতাদের বৈঠকে যাওয়া-আসা করৃত। সেখানে তখন ফুলার-বধের মন্ত্রণা চল্‌ছিল। তার ফলে সে ফুলার-বধের ভার পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে

ছেলেপুলেদের দেশে রেখে এল। চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করবার পর তাকে পাঠাবার জন্য শিলং থেকে 'তার' এল।

সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেণে সে গোয়ালন্দ যাত্রা করল। সেটা বোধ হয়, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। সঙ্গে নিয়েছিল ২টি রিভলবার, এক সুট সাহেবী পোষাক আর পথের আবশ্যকীয় অন্য দু'একটা জিনিষ। সন্ধ্যেবেলা তাকে শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে গেছলেন পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভূপেন বাবু সেদিন সারা বিকেলবেলাটা তা'র সঙ্গে ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে একটা অনাবিল শ্রদ্ধার ভাব ছিল; তথাপি উভয়ের মধ্যে চিরবিদায়সূচক কাঁদুনির অভিনয় হয়নি বটে, কিন্তু ষ্টেশনের গাড়ী ছাড়বার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূপেন বাবু সেই মৃত্যুপথের যাত্রীকে একটা ভারী অদ্ভুত রহস্যজনক অনুরোধ ক'রেছিলেন। খুব গম্ভীরভাবে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তিনি তাকে ব'লেছিলেন, "দেখ ভাই, তুমি ত শীগ্‌গির মরবেই, মৃত্যুর পর যদি কিছু থাকে, তবে কোন গতিকে আমাকে একটিবার জানাবে, এই প্রতিজ্ঞা কর।" যদিও আত্মা, পরকাল, স্বর্গ আদি সম্বন্ধে তার তেমন বিশ্বাস ছিল না, তথাপি সে বিষয়ে ভূপেন বাবুর সঙ্গে ঝগড়া না ক'রে অসঙ্কোচে ব'লেছিল—পরকালে যদি কিছু থাকে, আর তা মর্ত্ত্যলোকে জানালে যদি তার অনন্ত কুম্ভীপাকেও চিরকাল বাস করতে হয়, তা সত্ত্বেও সে ভূপেন বাবুকে এ তথ্য নিশ্চয় জানাবে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে এখনও পালন করতে পারেনি। কারণ, সে এখনও মরেনি। ভূপেন বাবুকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এখনও সে তা ভোলেনি; মৃত্যু পর্য্যন্ত ভুলবেও না। তার মৃত্যুর পর যদি ভুপেন বাবু কিংবা মর্ত্ত্যলোকের কেউ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রমাণযোগ্য

পরলোকের কোন তথ্য না পান, তবে নিশ্চয় জানবেন যে মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই—মৃত্যুই শেষ।

তার পর ট্রেণ ত ছেড়ে দিল, কিন্তু ভূপেন বাবুর সেই পরকাল-সমস্যা তার মনকে এমনই পেয়ে বস্‌ল যে ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর হরেক রকম বিড়ম্বনা তাকে একটুও জ্বালাতন কর্‌তে পারেনি। পরে শিলং পৌঁছতে আরও পাঁচ দিন লেগেছিল।

শিলং পৌঁছবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যে তাকে মর্‌তে হবে অথবা ফাঁসীর আসামী হ'তে হ'বে, এটা সে একেবারে স্থির ক'রে ফেলেছিল। বারীন সেখানে সমস্ত ঠিক ক'রে রাখবে। নির্দ্দিষ্ট হত্যাকারী গেলেই তাকে স্থানটা দেখিয়ে দেবে, সময়টা ব'লে দেবে, লাট সাহেবকে চিনিয়ে দেবে, শেষে বোমাটি তার হাতে তুলে দেবে। বড় জোর এক ঘণ্টা অপেক্ষার পর লাটসাহেব দর্শন দেবেন, পরক্ষণেই দুড়ুম্।

তার পর দুটো রিভল্‌বারের বারোটা গুলী শেষ হবার আগেই হয় ত অনুধাবনকারীর গুলীতে মৃত্যু অথবা পরে ধৃত হয়ে ফাঁসীর প্রতীক্ষা। ফুলার-বধের ভার নিয়ে অবধি, সে দিন পর্য্যন্ত কতবার যে এই দৃশ্যটা সে মানসিক দৃষ্টিতে দেখেছিল, তার ইয়ত্তা নেই। আরও অনেক রকম তার ভাব্‌বার বস্তু ছিল। পরকাল সম্বন্ধেও তার ভাসা ভাসা চিন্তা এসেছিল, কিন্তু ভূপেন বাবুর সেই তাজ্জব অনুরোধের পর পরকালের চিন্তাটা এক নতুন ভাব নিয়ে এল অর্থাৎ যদি পরকাল থাকে, তবে সেখানেও তাকে সহিদ্ (martyr) হ'তেই হবে।

যাই হোক্, তার এই রকম চিন্তার অনুসরণ করবার আগে আমার বলা উচিত, সে এমন দার্শনিক বা অধ্যাত্মবাদিসুলভ তত্ত্বানুসন্ধান কর্‌বার শক্তি কেমন ক'রে পেয়েছিল। কোনও কালে তার মধ্যে দার্শনিকতার বা আধ্যাত্মিকতার বিন্দুবিসর্গও ছিল না। তবে না কি

মৃত্যু আসন্ন জান্‌লে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে নেহাৎ গোঁয়ার বা অতি পণ্ডিতও পরকাল-চিন্তারূপ বাতিকগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। কারণ, আ-গোঁয়ার-পণ্ডিতও মনে কর্‌তে আঁৎকে ওঠে যে, মৃত্যুতেই নিজ অস্তিত্বের খতম। আমাদের সেই হত্যাকারীর পক্ষে অধ্যাত্মচিন্তার এও কারণ হ'তে পারে। কিন্তু আমরা জানি, তার হঠাৎ দার্শনিক হ'য়ে উঠবার আরও অনেক সাত্ত্বিক কারণ ঘটেছিল!

পরদিন সকালে সে গোয়ালন্দ পৌঁছে এক হোটেলে গিয়ে উঠেছিল, এর আগে সে কখনও পূর্ব্ববঙ্গে যায়নি। হোটেলস্বামীর প্রাঞ্জল অভ্যর্থনার পরে খেতে বস্‌ল। এক দিকে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা, অন্য দিকে লঙ্কার ভীষণ ঝাল, সহ্য কর্‌তে না পেরে, হোটেলওয়ালাকে লঙ্কাবিহীন কোন খাদ্য পাওয়া যেতে পারে কি না জিজ্ঞেস করায়, দাঁত-মুখ খিচিয়ে যে বক্তিমে সে দিয়েছিল, তার কিছু এই—"মরিচ যদি না কাইবার পার্‌লা, তয় এহানে আইচ কিয়ত্তি? গ্যাখছস্ না এহানে এত্তউলা লোক পত্তিদিন কাইচে, কৈ, কেউ ত কহনও মরিচা কাইয়া মইর‍্যা যায় না" ইত্যাদি। এহেন ন্যায়ের বিধান তখন তার পক্ষে বেশ সঙ্গত ব'লে মনে হ'য়েছিল। একটুখানির জন্য এই সামান্য লঙ্কার জ্বালা যদি সহ্য কর্‌তে না পার্‌বে, তবে সে যে ভীষণ কাযে যাচ্ছিল, তা' সম্পন্ন কর্‌বে কেমন ক'রে? কাযেই যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বার শক্তি তার কতটুকু আছে, তা' পরীক্ষা কর্‌বার জন্য, নাকে চোখে ঝর্ ঝর্ ক'রে জলপড়া সত্ত্বেও টপা টপ্ গিলে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে পেটের ভেতরটা দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল। অগত্যা খাওয়া শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি গৌহাটী যাবার ষ্টীমারে গিয়ে উঠ্‌ল। আলাপ কর্‌বার মত সঙ্গী কেউ জুট্‌ল না বা আলাপের প্রবৃত্তিও হ'ল না। সন্ধ্যের পর তাকে ভীষণ পেটের অসুখে পেয়ে বস্‌ল, অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণীতে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। সঙ্গে

ক্লোরোডিন ছিল, পুরোমাত্রায় তা' চালান সত্বেও, পরদিন সকাল থেকে তা রক্তামাশয়ে পরিণত হ'ল। আরও অধিক মাত্রায় ক্লোরোডিন চালাতে রোগের বাড়াবাড়ি একটু কম্‌লেও রক্ত বন্ধ হ'ল না।

এখন বলি, সেই লোকটি কেমন ক'রে এমন উদ্ভট রকমের আধ্যাত্মিকতা লাভ ক'রেছিল। এক জন অসাধারণ পণ্ডিতজীর কাছে লীলা শব্দের সটীক সঠিক ব্যাখ্যা শুনেছিলাম, এ কথা পূর্ব্বে উল্লেখ ক'রেছি! তিনি বহুকাল ধ'রে বহু চেষ্টায় দার্শনিক (metaphysician) বা অধ্যাত্মবাদী হবার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রেছিলেন। তাঁর কাছে শোন্‌বার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে, পূর্ব্বপুরুষের কারও উন্মাদ রোগ থাক্‌লে তার বংশধরদের ঐ রকম অধ্যাত্মবাদী বা দার্শনিক হওয়া সহজে সম্ভব হয়। আর গাঁজা, সিদ্ধি, আফিম অথবা ঐ জাতীয় কোন সাত্বিক নেশাও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। তৃতীয়তঃ অম্ল, অজীর্ণ, শূল অথবা উদরের পুরোন পীড়াগ্রস্তের পক্ষেও এই শক্তি সহজলভ্য হয়। যার এহেন রোগভোগের সৌভাগ্য হয়নি, তার পক্ষে নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ঐ সকল সাত্বিক রোগের আক্রমণ যোগ্য ক'রে শরীরটাকে অগত্যা তৈরী কর্‌তে হয়। বুদ্ধদেব শেষকালে এর উল্টো ব্যবস্থা ক'রেছিলেন ব'লে না কি অধ্যাত্মদর্শনের শূন্যবাদী হ'য়েছিলেন।

আমাদের এই হত্যাকারীর এক মামা না কি ঘোরতররূপে উন্মাদ ও সাধক ছিলেন। আর সত্ত্ব হ'লেও ক্লোরোডিনের মারফৎ অহিফেনের সাত্বিক নেশাটা বেশ মসগুল্ হ'য়েছিল। তারপর শিলং পৌছন পর্য্যন্ত কোনরূপে শরীরটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য ষ্টীমারে হিন্দু খাবারের দোকানে বাসি অখাদ্য না খেয়ে চট্টগ্রামবাসী মুসলমান ভায়াদের হোটেলের ভাত আর তরকারীর (rice and curry) তর-

কারীটা বাদ দিয়ে, নুণ মেখে খালি ভাতই দুটিখানি কোন রকমে গিলে ফেল্‌ত। কারণ, সেই নিষিদ্ধ পক্ষীর তরকারীটা লঙ্কায় ভরপুর। সুতরাং কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা শরীরের যে অবস্থা ঘটতে পারত, তারও তাই ঘটেছিল। অধিকন্তু ষ্টীমারে যে চার পাঁচ দিন তাকে থাক্‌তে হ'য়েছিল, দিনে আর রেতে শবাসন করেই থাকত। উদরের-পীড়া ত' হ'য়েই ছিল।

একটাতেই যখন যথেষ্ট, তখন দার্শনিকত্বলাভের সব ক'টা কারণের যোগাযোগে সে অতি দারুণ দার্শনিক হ'তে বাধ্য হ'য়েছিল।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখা নেহাৎ অসঙ্গত হবে না। রাষ্ট্র-নৈতিক হত্যাকারীদের হত্যা করতে যাবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তার মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা' লিখে হুবহু বর্ণনা করা অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভব ব'লে মনে হয় না। কারণ এ হেন ব্যাপার ভাষায় প্রকাশ করাই কঠিন। অথচ এ কথা যতখানি পারি, তা' না লিখলে, এ রকম প্রবন্ধ লেখার অঙ্গহানি হয়। অধিকন্তু আঠার উনিশ বছর আগে হত্যাকারীর মনের তখনকার ঠিক যে ভাবটা জান্‌তে পেরেছিলাম, এখন লিখ্‌তে গিয়ে তখনকার সেই রকম আবহাওয়ার মধ্যে না প'ড়ে লিখ্‌লে তা'র সতেজতাটুকু বজায় রাখা যায় না। সেই সময়ে দু'বছরের মধ্যে তিনবার সেই লোকটি এই রকম নরহত্যা করতে গেছল (সে কথা বিশেষ ক'রে পরে বল্‌ব)। প্রথমবার সম্ভাবিত হত্যাকাণ্ডের প্রায় ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে জেনেছিল যে, আপাততঃ হত্যা করা হ'ল না। দ্বিতীয়বার পাঁচ কি ছ' মিনিট এবং তৃতীয়বার প্রায় পাঁচ ছ' সেকেণ্ড আগে তা' জেনেছিল। হত্যা করা হ'ল না, এটা জানবার পরক্ষণে সমস্ত শক্তি দিয়ে সংযমিত মনের হঠাৎ এমনি প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় যে, পূর্ব্বক্ষণের অনুভূতি পরক্ষণে ঠিক ঠিক আবার ধারণা করা

একেবারে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। তাই বল্‌ছিলাম, এতগুলি সুদীর্ঘ বছরের কত শত তাণ্ডব ঘটনার পর, এ রকম বিষয় লিখ্‌তে গেলে, তা যে একটুও পরিবর্ত্তিত হবে না এবং পরবর্ত্তী নানা রকমের অনুভূতির ছায়া পূর্ব্বের আসল ঘটনা বা ভাবের ওপর যে পড়বে না এ কথা কোন লেখকই বল্‌তে পারেন না।—কারণ এটা অনিবার্য্য। তাই এ রকম কথা লিখতে গিয়ে এখনকার ভাবের ছাঁচে তা' বাধ্য হয়ে ঢালাই কর্‌লেও, আশা করি, লেখার আর পাঠের উদ্দেশ্য এতে ব্যর্থ হবে না। তা ছাড়া বৈপ্লবিক হত্যা কর্‌বার পূর্ব্বে, হত্যার পরে ধরা প'ড়লে, কোন বৈপ্লবিক কাযে পুলিসের হাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা হ'লে বা ধরা প'ড়লে এবং ফাঁসীর হুকুম হবার পূর্ব্বে, এমন কি, পরেও স্বদেশ-প্রেমিকদের মধ্যে অতি বড় নেতা হ'তে সুরু ক'রে সামান্য বিপ্লবকর্ম্মী পর্য্যন্ত, কি রকম মনোভাবের বশবর্ত্তী হ'য়ে, মতটা বদ্‌লে ফেলেন ও কত অনর্থ ঘটান, তা' জেনে রাখা সকলের উচিত; বিশেষ ক'রে অধ্যাত্ম-বাদী নেতাদের।

এখন আসল কথা বলি। উক্ত ফুলারবধকারীর আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে এবং ইহকালের কর্ম্মফলে, পরকালে আত্মার সুখ-দুঃখভোগ সম্বন্ধে যেমন বিশ্বাস ছিল না, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে বারে বারে পরকাল মেনে নেয়ার ঝোঁক সে সামলাতে পারল না। কারণ, পরকালের তথাকথিত সুখের উজ্জ্বল আশার (সন্দেহজনক হ'লেও) একটা বিশাল মোহিনী শক্তি আছে। মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে এ আশার মোহ যে লোভনীয় সোয়াস্তি দেয়, তা সে তখন বেহুঁসে অনুভব ক'রেছিল। বিশেষতঃ যে কায সে করতে যাচ্ছিল, তা' অতীব পুণ্যকর্ম্ম বলেই তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল। সেই পুণ্যকর্ম্মের ফলটা ইহকালে ভোগের

সম্ভাবনা ত আর ছিল না! কাজেই যুক্তি-তর্কের দ্বারা বিশ্বাস না করতে পারলেও তবু পরকাল থাকাটাই যেন তার পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়ে প'ড়েছিল।

সে, যে অবস্থায় প'ড়েছিল, তাতে পরকালের এই প্রলোভনটা একেবারে ত্যাগ করা তার পক্ষে কঠিন হ'য়েছিল। মৃত্যু আসন্ন জেনে ইহকালের বিষয়ভোগ থেকে বঞ্চিত হ'বার আতঙ্কে যখন মন একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়ে তখন মৃত্যুর বিভীষিকা হ'তে অব্যাহতি লাভের জন্য পরকালের এই মিথ্যা প্রলোভনে নির্ভর করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকে না। পরকালের এই প্রলোভনে অন্ধভাবে বিশ্বাস করাতে পারলে, মানুষকে দিয়ে ইহকালে, যেকোন কায যে, করিয়ে নিতে পারা যায়, সে বিষয় সন্দেহ নেই। এই অন্ধবিশ্বাস মানুষকে যে পশুতে পরিণত করে, তা জেনেও তখনকার মত সেও যখন আত্মার পরকাল মেনে নিয়েছিল, তখন সেই প্রলোভনের শক্তি অনুভব ক'রেছিল।

অথচ আবার সংসারভোগের বাসনা অর্থাৎ জীবনের মায়া আর মৃত্যুর ভয়, এমনই প্রচণ্ডরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে, যারা পরকালে বিশ্বাসবান, তাদের কাছেও পরকালের এত বড় প্রলোভনটা কার্য্যতঃ তুচ্ছ হয়ে যায় যদি সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে এড়াবার কিছুমাত্র উপায় থাকে। এইরূপে মৃত্যু অহেতুক ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়ায়। এই হত্যাকারীর অবস্থাও অনেক ক্ষণের জন্য কতকটা তাই হয়েছিল।

সে, মৃত্যুর পরে যে স্বর্গে যাবে, এ বিশ্বাস কেমন ক'রে তখন তার মনে ক্রমে জেগে উঠেছিল, তা সে বুঝতে পারে নি। সে ভাবতে লাগল, স্বর্গে গিয়ে, প্রথমে সে কি দেখবে বা অনুভব করবে, কাদের দেখবে, ইত্যাদি। তারপর স্বর্গের সুখটা কেমন হ'তে পারে, আন্দাজ

করবার চেষ্টা করেছিল। স্বর্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ কি সম্ভব? ইন্দ্রিয় সব ত দেহের সঙ্গে ইহকালে থেকেই যাবে! নিশ্চয় ইন্দ্রিয়াতীত কোন রকমের সুখ স্বর্গে আছেই। যদি তাই হয়, তা বিচ্ছিন্ন কি অবিচ্ছিন্ন? বিচ্ছিন্ন হ'লে মর্ত্ত্য সুখের সঙ্গে তার তফাৎ কি রইল? তা হ'তেই পারে না। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ কি বেশী দিন ভাল লাগবে? দুঃখ না থাকলে সুখের ধারণা কি সম্ভব হ'তে পারে?

এই রকম খেয়ালের মধ্যে হঠাৎ তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, এবং সে জন্য একটু বিরক্তও হ'ল। তখন ভূপেন বাবুকে মনে পড়লো। ভূপেন বাবু, স্বামী বিবেকানন্দের আপন ভাই। স্বামীজী ছিলেন অধ্যাত্মবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠগুরু। পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজের ভাইয়ের যখন প্রত্যয় জন্মাতে বা সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারেন নি, তখন সাত সমুদ্র তের নদীপারের ইহকালসর্ব্বস্ব লোকগুলোকে, পরকালে প্রলোভন দেখাতে গেছলেন কেন? পরকাল 'আছে', এ কথা যেমন বিস্তর মহাপুরুষ বলেছেন, তেমনই 'নেই' এ কথা বলা সত্ত্বেও অনেকে মহাপুরুষ ব'লে গণ্য। তা ছাড়া পরকাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কোন্‌টা সত্য? পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'হাঁ' বলাতে স্বার্থ আছে। 'নেই' যাঁরা বলেছেন, তাঁদের বরং স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়েছে—অর্থাৎ পরকালের সুখভোগের মোহিনী আশারূপ প্রভূত স্বার্থ ত্যাগ করতে হ'য়েছে; লোকপূজার বদলে লোকনিন্দার ভাজন হ'তে হয়েছে। স্বার্থের সঙ্গেই মিথ্যার সম্বন্ধ অধিক। অতএব 'হাঁ' যাঁরা বলেছেন, তাঁরা হয় ত কাল্পনিক স্বার্থের জন্যই মিথ্যা ব'লে থাকবেন।

আবার কারও কারও মতে না কি আত্মা সুখদুঃখের অতীত; তা যদি হয়, তবে এহেন আত্মা ও এহেন পরকাল নিয়ে মাথাব্যথা করা পাগলামী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অনেকে বলেন, পরজন্ম আছে অর্থাৎ ইহকালের কৃত 'সু' বা 'কু' কর্ম্মের ফলে মৃত্যুর পর আত্মা অধিক উন্নত বা হীনজীব হয়ে জন্মাতে পারে। যদি তাই হয়, তবে এই নরহত্যা স্বর্গীয় বিধাতা পুরুষের বিচারে যে কুকর্ম্ম ব'লে প্রতিপন্ন হবে না, তার প্রমাণ কি? নিজের স্বার্থের জন্য নরহত্যা যদি মানুষের বিচারে অপরাধ ব'লে গণ্য হয়, তবে নিজ দেশের স্বার্থের জন্য নরহত্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচারপতির বিচারে পুণ্য ব'লে গণ্য হবে কেমন ক'রে? পরকাল ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে এই নহরত্যার জন্য তা' যে একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

ঠিক এ রকম না হ'লেও এই ধরণের অধ্যাত্মচিন্তার গোলকধাঁধায় ঘূরপাক খেয়ে, স্বদেশের জন্য সমর্পিত-প্রাণ কত ছোট বড় বিপ্লববাদী যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কত কুকীর্ত্তি করেছে, তা' খুব অল্প লোকই জানেন। আবার অনেকে তা' জানলেও বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ নেতাদের মতিভ্রম হয় না ব'লেই আমাদের ধারণা। এই বৈপ্লবিক কায অত্যন্ত ভীষণ। হাতে কাযে এ কায করতে গেলে আকস্মিক ভীষণ বিপদে, জেলে, দ্বীপান্তরে, অন্তরীণে পচ্‌বার ও ফাঁসীতে ঝুলবার ভয় সদাই থাকে। এই রকম ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা যখন ঘনিয়ে আসে, তখন বিপ্লবের কাযকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে My mission is over ব'লে প্রাণটা বাঁচাবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তাতে লোকাপবাদ আছে। আর যার একটু কন্‌সেন্স ব'লে জিনিষটা আছে (প্রকৃতপক্ষে এ দেশে এ জিনিষটা নেই বল্‌লেই হয়), তার তখন সেই আপদটাকে ধামা চাপা দেয়ার ওজুহাত দরকার হয়ে পড়ে। ফল কথা, ঐ অবস্থায় এমন একটা ফাঁকি (subterfuge) দরকার হয়ে পড়ে—যার দ্বারা লোকনিন্দা বা আত্মগ্লানির বদলে লোক-

পূজ্য হওয়া ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা সহজসাধ্য হ'তে পারে। আমাদের দেশের লোকের পক্ষে এরূপ স্থলে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে সেই পরম গৌরবজনক পন্থা, যার দোহাই দিয়ে দেশদ্রোহিতার মত মনুষ্যসমাজের সব চেয়ে অনিষ্টকর—সব চেয়ে সাংঘাতিক হীন পাপ করেও লোক-সমাজে পূজা, গৌরব অর্জ্জন করা যায়। কারণ, আমাদের দেশে সমাজের অতীব অনিষ্টকর কাযও যেমন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অতীব পুণ্যকর্ম্ম ব'লে গণ্য হয়, তেমনই সমাজের অতি কল্যাণকর কাযও অতি পাপ ব'লে ঘৃণ্য হয়। পাশ্চাত্য দেশে সমাজের ঐহিক হিতাহিতের মাপ-কাঠিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ওজন করা চলে ; সেখানে গুপ্ত সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'তে হ'লে যে শপথ ক'রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তার মর্ম্ম তলিয়ে না বুঝে আমরা আমাদের গুপ্ত সমিতির দীক্ষার ব্যাপারটা, তাদের নিছক অনুকরণ করেছি মাত্র। সে দেশে শপথ ভঙ্গ ক'রে মহাত্মা পাদ্রী হ'লেও লোকাপবাদ, আত্মগ্লানি ও গুপ্ত সমিতির পক্ষ হ'তে দণ্ডবিধানের কিছুমাত্র ত্রুটী হয় না, কাযেই সেখানে শপথটা সার্থক হয়। আর আমাদের দেশে শপথের যে শুধু মূল্য নেই, তা নয়। এখানকার লোকমতই শপথ ভঙ্গ করাবার প্রশ্রয় দেয় ; যতদিন তথাকথিত ভারতীয় সভ্যতার মূলাধার এই সনাতন ধর্ম্মের প্রাধান্য অটুট থাকবে, ততদিন লোক-মতও ঐ রকম অন্যায় অসঙ্গতই থাকবে ; ততদিন আমাদের চরিত্রবল ব'লে কোন বস্তু সম্ভবই হবে না—ততদিন কোন প্রকারে স্বাধীনতা এ দেশে সম্ভব ত হবে না, বরং তর্কের খাতিরে হবে ব'লে ধ'রে নিলেও তা অনর্থের কারণ হ'বেই।

যাই হোক্, উল্লিখিত হত্যাকারীর পক্ষে এ অবস্থায় লাটবধের সঙ্কট থেকে সম্মানে ও গৌরবের সহিত অব্যাহতি লাভ করতে আমাদের যে সুবিধাজনক স্বদেশী পন্থার উল্লেখ করলাম, তাও তখন তার মনে

এসেছিল, অর্থাৎ আত্মগ্লানি ও লোকনিন্দা থেকে মুক্তির জন্য নিজের মনকে এবং যথাসময়ে অন্যকে এই ব'লে বোঝাতে পার্‌ত যে, স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত, পরকালের চিন্তা তা'র মনে এল কেমন করে? এই কথাটা পরক্ষণে আরও একটু পরিষ্কার হ'য়ে দাঁড়াত যে, ভগবানের বাণী সে যেন নিজের কানে স্পষ্ট শুন্‌তে পেয়েছে। পরে লোকের কাছে প্রচার-কালে সেই কথাটাই হ'য়ে দাঁড়াত,—সে, ভগবানের আদেশ পেয়েছে যে, তা'র দ্বারা ভগবান্ আরও মহত্তর কর্ম্মসাধন করাবেন ব'লে যন্ত্ররূপে তা'কে গ'ড়ে তুল্‌ছেন। সামান্য নরহত্যা তা'র কর্ম্ম নয়, এই প্রত্যাদেশ সে স্ব কর্ণে শুনেছে, ইত্যাদি। এ হেন প্রত্যাদেশ অনেকেই পালন করেছেন।

যাই হোক্, ভণ্ডামি তার ভাল লাগল না। কিন্তু পরকালের চিন্তা তাকে বারে বারে বেমালুম পেয়ে বসেছিল। শেষকালে এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, পূর্ব্বজন্মে কে কি ছিল, তা সেও যেমন জানে না, তেমনই অন্য কেউ জান্‌তে (অন্ততঃ একালে) পেরেছে ব'লে শোনেনি। পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এ জন্মে আত্মার সঙ্গে আস্‌তে যদি না পারে, তবে এ জন্মের স্মৃতি পরজন্মে যাবে কি ক'রে? যদি না যায়, তবে পরজন্ম বা পরকালে সুখ-দুঃখের মানে হয় না। ইহকালের সঙ্গে পরকালের তুলনা করতে না পারলে, দুই কালের মধ্যে সম্বন্ধ কিছু থাকতে পারে ব'লে ধারণা করা যায় না। কাজেই তার তখনকার দার্শনিক বুদ্ধিতে বুঝে ফেলেছিল, পরকালের সমস্ত ব্যাপারটা বোকা বোঝাবার জন্য ভণ্ডদের স্তোকবাক্য মাত্র। সুতরাং পরকালের চিন্তারূপ অকারণ কষ্ট আর সে করবে না।

তখন তার মনে হ'ল, কায করতে গিয়ে ফলাফল চিন্তা করা পাপ, নিষ্কামকর্ম্মই ঠিক। গীতার প্রতি তার ভক্তি উছ্‌লে উঠ্‌ল।

অনেকক্ষণ ধরে গীতার মহৎ উপদেশ সকল স্মরণ ক'রে সে বেশ একটু শান্তি পেল। কিন্তু এও আবার মনে পড়ল, গীতাতেও পরকালের হাঙ্গামা বিস্তর। বিশেষতঃ ভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনকে নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষা দিতে গিয়ে, প্রথমেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরূপ কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক স্তোকবাক্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যুদ্ধে জিত্‌লে ইহকালে রাজ্যলাভ, আর মরলে পরকালে স্বর্গভোগ। পরিণামে কিন্তু ভগবানের আশ্বাসবাণীও মিথ্যা হয়েছিল; কারণ, অর্জ্জুন ত যুদ্ধে মর্‌লেন না, কাযেই সত্ত স্বর্গ জুট্‌ল না। যুদ্ধে জয়লাভ করেও সুখে রাজ্যভোগ হ'ল না, অধিকন্তু আত্মগ্লানি আর লাঞ্ছনা ভোগটা যথেষ্টই হয়েছিল।

সে তখন একেবারে বুঝে ফেল্‌ল, নিষ্কাম ধর্ম্মটর্ম্ম সব ফাঁকি। বচনের প্যাঁচেও এটা সম্ভব হয় না। অর্জ্জুনের মত নিষ্কামকর্ম্ম করবার যারা ভাণ করে, অথবা ভগবান্ কৃষ্ণের মত নিষ্কামধর্ম্মের যারা বুক্‌নি দেয়, তারাও ইহকালে লোক-সমাজে নাম, যশ, পূজা পাবার জন্যই করে। কেউ বেঁচে থেকে তা ভোগ করবার কামনা করে, আর কেউ বা মৃত্যুর পর এক দিন, নিকট বা দূর-ভবিষ্যতে লোকের পূজা পাবে, এই কামনা ক'রেই তা করে। একমাত্র এই নাম-যশই মানুষকে অমর কর্‌তে পারে।

এই সিদ্ধান্তে আস্‌বার পর তার চিন্তার বিষয় হ'ল, ফুলার সাহেবকে হত্যা করতে পারলে তার সম্বন্ধে কে কি মনে করবে! যারা তাকে কেউকেটা ব'লে মনে করত, তারা না জানি তাকে কি চোখেই দেখবে! তার কথা খবরের কাগজে কত লেখালেখি করবে। শুধু ভারতে নয়, সারা দুনিয়ায় তার নাম ঘোষিত হবে, ইত্যাদি।

কল্পনায় ভাবী গৌরবের খেয়াল কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল, হত্যাব্যাপারে ধরা পড়লে পুলিস যাতে না তাকে সনাক্ত করতে পারে, তার যোগাড় সে আগেই করেছে; আর শেষ পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা করবে ব'লে স্থির করেছে। এখন তার গবেষণার বিষয় হ'ল, তবে কি ধরা পড়বার পর তার নামটা যাতে পুরোদস্তুর জাহির হয়, সেই ভাবে পুলিসের কাছে একরার করবে? তা'তে তার অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লাঞ্ছিত হ'তে পারে; গুপ্ত সমিতিই লুপ্ত হ'তে পারে। তবে কি নিজের নাম-যশের জন্য গুপ্ত সমিতির আপদ জেনে শুনে সে ডেকে আনবে? তাই বা কেন! যেমন এতে দু'দশ জন লোকের বিপদ ঘটতে পারে, তেমন তার এমন অনেক বন্ধু আছে, যারা তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আরও বৃহত্তর বৈপ্লবিক সমিতি গ'ড়ে তুলতে পারবে—আরও মহত্তম কায করতে পারবে। এই ভাবে সে greatest good to the greatest number থিওরীটা নিজের মনের মত ক'রে খাটিয়ে নিয়ে একটুখানি নিশ্চিন্ত হ'তে না হ'তেই আবার তার মনে এই 'কিন্তু' এল যে, কেবল নামের জন্যই কি ভাল কায করা আর মন্দ কায না করা উচিত? জগতে কেউ কি নাম যশের আকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে লোকহিতকর কোন কায করতে পেরেছে? তখন সে একে একে অনেক মহাপুরুষদের ঐ রকম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নাম-যশ কি না, খুঁজতে গিয়ে এমন একজনও পেল না—যাঁর একটু না একটু নাম-যশের কামনা ছিল না। বরং দেখ্‌ল, যাঁরা এর দ্বারা যত অধিক পরিচালিত হয়েছেন, তাঁরা তত অধিক মহৎ কায করতে পেরেছেন; আর তাঁরাই তত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

কিন্তু এও সে ভেবেছিল যে, জগতে এমন অনেক আদর্শবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, যার মূলে নিশ্চয় এমন সব পথপ্রবর্ত্তক এবং পথ-

প্রদর্শক কর্ম্মী ছিলেন—যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন বলেই সেই সকল বিপ্লব সফল হ'তে পেরেছিল; অথচ তাঁদের পবিত্র নাম লোকসমাজে অবিদিত। সেই অজ্ঞাতনামা মহাপ্রাণদের প্রতি শ্রদ্ধায়, আর সেই আত্মগোপনরূপ কাযের মহিমায় তার মন এমনই মুগ্ধ হয়ে উঠ্‌ল যে, greatest good to the greatest number থিওরীটি আবার অন্য-ভাবে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। তাতে সে আবার বুঝে ফেল্‌ল, আত্মগোপন করাটাই অবশ্য উচিত। অর্থাৎ আত্ম-গোপন করার ওপরেই বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির ভিত্তি স্থাপিত; আর গুপ্ত সমিতির ওপর বিপ্লবের সিদ্ধি অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করছে। আত্মপ্রকাশ করলে তার গুণমুগ্ধ ভক্তেরা তার প্রদর্শিত অন্য আদর্শের সঙ্গে, আত্মপ্রকাশরূপ এমন সুবিধাজনক আদর্শটাও, একই কারণে অনুকরণ করবে। তখন এক এক জন ধরা পড়বে, আর একরারের ঠেলায় এক একটি গুপ্ত সমিতি সমূলে লোপাট্ হয়ে যাবে।

তা যেন হ'ল, কিন্তু পরকালে আত্মার যদি স্বর্গ-ভোগ না-ই থাকে, আর ইহলোকেও মৃত্যুর পূর্ব্বে বা পরে নাম, যশ আদির আশা তাকে ত্যাগ করতে হয়, তবে দেশ স্বাধীন হ'ল বা না হ'ল, তাতে তার কি? তবে স্বদেশ-প্রীতিরূপ ভূতের বোঝা কেন সে বয়ে মরতে যাচ্ছে? এই প্রীতির ঠেলায় সে যাবে জেলে, সে প'চে মরবে দ্বীপান্তরে, সে ঝুল্‌বে ফাঁসীকাঠে, আর বাহাদুরী নেবেন সেই নেতারা—যাঁরা এ সব মাথা পেতে নিতে পারবেন না!

দেশের জন্য আত্মত্যাগ করবে কেন, এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমাদের নেতারা বড় মুস্কিলে পড়েন। কারণ, এ সমস্যার নামগন্ধ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে অর্থাৎ শাস্ত্রে

খুঁজে পান না; নতুন ক'রে এমন কিছু গড়েও তুল্‌তে পারেন না, অর্থাৎ স্বদেশ-প্রীতির এমন উচ্চ আদর্শও উদ্ভাবন করতে পারেন না, যার মহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধন, মান, প্রাণ আদি সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কর্‌তে পারলে মানুষ ধন্য হ'তে পারে। অন্য দেশে তা পেরেছে। অথচ এই আদর্শ যারা গ'ড়ে তুলেছে, যারা তা কাযে পরিণত করেছে, আর যারা তা নিত্য নতুন নতুন ভাব-ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ক'রে তুল্‌ছে, তারা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের লোক। তাদের সভ্যতার এই আদর্শ নিতে গেলে তাদের অনুকরণ করা হয়। অবার—এ দেশে অনুকরণ করা ঘৃণ্য ব'লে বিবেচিত। তাই স্পষ্ট ভাবে অনুকরণ করলে নেতাদের মর্য্যাদা থাকে না। যেহেতু, এই নেতারাই পাশ্চাত্য আদর্শকে ঘৃণা কর্‌তে আমাদের শিখিয়েছেন। কাযেই কিসের জন্য আত্ম-উৎসর্গ ক'রে আমরা স্বদেশ উদ্ধার করতে যাব, তার হেতু দেখাতে বাধ্য হয়ে, নেতারা পরকালে এমন একটা কাল্পনিক সুখের ঘোরাল আশার প্রলোভন সৃষ্টি করেছেন যার প্রচুর সমর্থন এ দেশের শাস্ত্র আর লোকমত সর্ব্বদা করে থাকে।

যাই হোক্, কেন দেশের জন্য আত্মবলি দেব, তার হেতু দেখাতে গিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে আদর্শের উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার; আর তার চেষ্টাতে আত্মদান করতে পারলে, পরকালে স্বর্গ-সুখলাভ। এটাকে একটু ঘষে-মেজে আজকালের নেতারা করেছেন, হিন্দুর সনাতন সভ্যতার পুনরুদ্ধার ও পাশ্চাত্য অন্য জাতিকে তা দান, যার জন্য আমাদের আত্মত্যাগ, আর ইংরেজের কবল থেকে দেশ উদ্ধার করতে হবে।

ঐ সমস্যার এ রকম সমাধান তার পক্ষে তখন সম্ভব হ'ল না। স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য বিপ্লববাদের ধারণা এবং তা প্রচারের

চেষ্টা, এ যাবৎ যতটুকু এ দেশে হয়েছে, যদিও তা সেই পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণমাত্র, তথাপি আমরা ভারতবাসী সেই আদর্শের অন্তর্নিহিত স্বরূপটির অনুসরণ করি না বা তার একেবারে খোঁজও রাখি না; নেতারাও তা খোঁজ করবার ও আমাদের তা শেখাবার মুস্কিল থেকে অব্যাহতিলাভের জন্য আমাদের অনুকরণাতঙ্কের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আমাদের হত্যাকারীও সেই পাশ্চাত্য আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। তথাপি স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়ে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" বাক্যটির মর্য্যাদা রক্ষার পথে এত দূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসার লজ্জা সে কোথায় রাখবে, তা খুঁজে পেল না। লাট সাহেবকে বধ করতে পারবে না ব'লে ফিরে এলে, কে কি মনে করবে, প্রথমে এইটেই হয়েছিল তার ভাবনার কথা। তার পর যত দিন সে বেঁচে থাকবে, তত দিন নিজের কাছে কত হীন হয়ে থাকতে হবে; আত্মগ্লানিতে তার বেঁচে থাকার সুখটুকু তেতো হয়ে যাবে; আর কত দিন বা বাঁচবে, তার নিশ্চয়তাও নেই। এক দিন ত রোগে ভুগে, আরও অনেক কিছু ক'রে মরতেই হবে। এই রক্তামাশা যে গ্রহণীতে পরিণত হয়ে একটু একটু ক'রে তাকে মৃত্যুর গ্রাসে সঁপে দেবে না, তাই বা কে বলতে পারে? ঘরে ফিরবার পূর্ব্বেই যে সেই বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশে পথের পাশে প'ড়ে থেকে শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য হ'তে হবে না, তার ঠিক কি?

এই রকম রোগে ভুগে মরার হরেক রকম চিন্তা করতে করতে তার বড় আদরের এক মেয়ের কথা মনে পড়ল। মাসাধিককাল তার টাইফয়েডের যাতনা ভোগ ও মৃত্যুর দৃশ্য প্রাণের ভেতর জেগে উঠল। তখন বেঁচে থেকে যে কোনও মুহূর্ত্তে হরেক রকম কুৎসিত

রোগের আক্রমণের জন্য প্রতিনিয়ত প্রতীক্ষা করার চাইতে ফাঁসীতে মৃত্যু তার কাছে কাম্য হয়ে উঠল।

এই কাম্য মৃত্যুর ফলাফল চিন্তা ক'রে সে দেখল, পরকাল যদি নেহাৎ না-ই থাকে, তবে মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্ব পর্য্যন্ত আত্মপ্রসাদ-রূপ আনন্দ ত থাকবেই। অধিকন্তু আত্মগোপন করা সত্ত্বেও অন্ততঃ চার পাঁচ জন, তার এই আত্ম-বলিদানের খবর রাখেন। এক দিন না এক দিন তাঁদের কেউ না কেউ নিশ্চয় তার নামটা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবেনই। তখন নিজ মুখে আপন কাযের কীর্ত্তন ক'রে যতটা নাম-যশ হ'ত, তার চাইতে আত্মগোপন করার জন্য ঢের বেশী লোকপূজা সে নিশ্চয় পাবে।

অবশেষে আত্মপ্রসাদলাভের কামনায় হোক বা নামের জন্যই হোক, সে ফুলার সাহেবকে বধ করতে নিজের মনকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করল। তার পর তার মনে অন্য যত কিছু চিন্তা এসেছিল, সব সে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু একটিমাত্র দুঃখ, থেকে থেকে তার মনে দেখা দিচ্ছিল। সেটি হচ্ছে, তার গুণমুগ্ধ আত্মীয়বন্ধুদের কাছ থেকে প্রাণ খুলে শেষ বিদায় নিতে পারল না; অর্থাৎ কি না, তাদের হাহুতাশ, কাঁদুনি, কাতরানি আদি থেকে মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে শেষ তুষ্টিটুকু পায়, সেটুকু তার ভাগ্যে জুটল না।

যাই হোক্, ষষ্ঠ দিন খুব সকালে তাদের ষ্টীমার গৌহাটীর ঘাটে গিয়ে লাগ্‌ল। পেটের অসুখটা একটু কমেছিল। ক্লোরোডিনের মারফৎ আফিমের মাত্রাও কমে এসেছিল। কাযেই তার দার্শনিক গবেষণারূপ ব্যাধিও প্রায় সেরে গেছল। তাই গৌহাটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। কয়েক দিনের পর স্নান এবং পেট ভ'রে জলযোগ সেরে প্রায় ৯টার সময় শিলংএর জন্য টোঙ্গা

চ'ড়ে বসল। ক্রমে যত এগুতে লাগল, ততই অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য তাকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌তে লাগল।

সৌন্দর্য্যের প্রতি তার মনের একটু স্বাভাবিক টান ছিল। একে ত সে অত সুন্দর দৃশ্য কখনও দেখেনি বা এমন মনোরম আবহাওয়া কখন উপভোগ করেনি, তার ওপর আর ঘণ্টা কতক পরে সব শেষ হয়ে যাবে, এই আপশোষে পৃথিবীটা বড়ই উপভোগ্য ব'লে তার মনে হ'তে লাগল। তখন চারিদিক্ হ'তে যেন কত রকমের সৌন্দর্য্য নানা ছন্দে তার চোখে বিকসিত হ'ল। পৃথিবীর ওপর এ রকম মায়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ওপর মায়াও বেমালুম আবার জেগে উঠতে লাগল।

এই মায়াটা এতই স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে, ষ্টীমারের এত সব দার্শনিক গবেষণা তখন তার মনে স্বপ্নের মত বোধ হ'তেও লাগল। তার পর ফুলারবধের সঙ্কল্পও তার মনে দেখা দিল। সৌন্দর্য্যের মোহে সে সঙ্কল্প শিথিল হওয়ার ভয়ে, সৌন্দর্য্য উপভোগে গা ঢেলে দেয়াটা অন্যায় হয়েছে ব'লে, জোর করে তার মনকে বুঝিয়ে ফেল্‌ল, সৌন্দর্য্য অনুভূতি মনের এক রকম সংস্কার মাত্র এবং তার পক্ষে তা পরিত্যজ্য। কিন্তু "কম্‌লি ছোড়্‌তা নেই" ; বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সৌন্দর্য্য তাকে ছাড়ল না। বৃথা চেষ্টার পর অগত্যা সে মনকে প্রবোধ দিতে লাগল যে, সে ত মরবেই, তবে যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ আত্মপ্রবঞ্চনা না ক'রে এই নির্দ্দোষ সুখটুকু সে কেন না ভোগ কর্‌বে ?

যাই হোক্, তার পর শিলংএর দিক থেকে একখানা টোঙ্গা আস্‌তে দেখা গেল। সেটা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে দেখল, টোঙ্গাতে একটি চেনা মুখ ব'সে ; সে বারীন। তড়াক্ ক'রে নেমে গিয়ে বারীনকে জিজ্ঞেস করল, শিলং থেকে তার ফিরে আস্‌বার কারণ কি ? উত্তরে

বারীন এই রকম বলেছিল, "শিলংএ হবে না, গৌহাটী ফিরে আস্‌তে হবে"। শিলং গিয়ে ওঠবার জন্য এক জন ভদ্রলোকের নাম ব'লে দিয়েছিল।

ছুটে গিয়ে সে শিলংএর টোঙ্গায় আবার চ'ড়ে বসেছিল। "শিলংএ হবে না, গৌহাটীতে চেষ্টা হবে" এই ক'টি কথার মধ্যে বুঝতে বেগ পাবার মত যদিও কিছুই ছিল না, তথাপি এই শুনেই তার মন হতভম্ব হয়ে গেল। ফুলার লাটকে বধ কর্‌বার ভার নিয়ে অবধি দশ বারো দিন যাবৎ এই নরহত্যারূপ ভীষণ কাযটা সম্পন্ন কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'তে গিয়ে জীবনের বা সংসারের মায়া কাটাতে তাকে কত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল, ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে তা অনুমান করা অসম্ভব। আবার জীবনের আশা, সংসারে মায়া বেহুঁসে হঠাৎ তার মনে গজিয়ে উঠল।

নরহত্যার প্রতি এমন দুর্দ্দমনীয় বিতৃষ্ণা আর জীবনের প্রতি এমন অসঙ্গত মায়া বা যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তার প্রতি অহেতুক এত ভয়ের কারণ কি?

ভারতবাসী, বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী আমরা সকলে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী না হ'লেও স্বভাবতঃ প্রায় সকলেই বোষ্টম। সে যদিও বোষ্টম ছিল না, তথাপি বাঙ্গালী ত বটে। জাল, জালিয়াতি, জুয়াচুরি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি হীন কায করতে, এমন কি, নরহত্যার পরামর্শ পর্য্যন্ত দিতে, ভদ্র ইতর নির্ব্বিশেষে আমরা কুণ্ঠিত হই না। অথচ যে পাঁঠার ঝোলের লোভে আমাদের রসনা সদাই ব্যাকুল, কোন বাঙ্গালীকে সেই পাঁঠা কাটতে দিয়ে তার মনের অবস্থাটা দেখলে, অথবা যে বানর, বিদেশী বণিক অপেক্ষাও আমাদের উৎপন্ন-জাত লভ্যের অধিক অন্তরায়, সেই বানরকে প্রাণে মেরে ফেল্‌তে ব'লে দেখলে,

আমাদের বাঙ্গালী চরিত্রের স্বভাবগত বিশেষত্ব যে বোষ্টমত্ব, তা ধরা পড়ে। এহেন বাঙ্গালীর পক্ষে বিনা উত্তেজনায় নরহত্যা, বিশেষতঃ লাট-হত্যা যে উৎকট রকমের স্বভাববিরুদ্ধ, আজকাল তা অনুমান করা তত সহজ হবে না। কারণ, এ রকম দুষ্কর্ম্ম দণ্ডনীয় হ'লেও পাশ্চাত্যের অনুকরণে ইদানীং এ দেশে অনেক সংঘটিত হওয়াতে, আর এটা তত স্বভাববিরুদ্ধ ব'লে মনে নাও হ'তে পারে; আর বর্ত্তমানের অহিংসনীতির কৃপায় অচিরে শুধু বাঙ্গালীচরিত্র নয়, ভারতীয় চরিত্রের স্বাভাবিক (instinctive) বৈশিষ্ট্য যে আবার খাঁটি বোষ্টমত্ব হবে, তাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ কর্‌বার কিছুই নেই।

কিন্তু কোন রকমে কেবল বেঁচে থাক্‌বার উদ্দেশ্যে—বেঁচে থাক্‌বার প্রবৃত্তি এ দেশে এত উৎকট কেন? জীবমাত্রেরই স্বভাবে যে এ প্রবৃত্তিটা অত্যন্ত প্রবল, তা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু মানুষের মত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে অন্য কথা। মানুষের বেঁচে থাক্‌বার প্রবৃত্তি যেমন স্বভাবগত, তেমনই অন্যের মঙ্গলের জন্য, কেবল আত্ম-প্রসাদলাভরূপ স্বার্থ ছাড়া, জেনে-শুনে নিজের ব্যক্তিগত যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করা, এমন কি, মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করার প্রবৃত্তি, মানুষমাত্রেরই মধ্যে হ্ঁসে বা বেহ্ঁসে একটু না একটু আছেই। এ দু'টি হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন প্রবৃত্তি। একটি যে পরিমাণে যেখানে বেশী থাকে, অন্যটি সেই পরিমাণে সেখানে কম হয়ে যায়। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে কিন্তু প্রথমটার যে রকম আধিক্য বা প্রাদুর্ভাব, আর দ্বিতীয়টির যতখানি অভাব, এমনটি নিশ্চয় আর কোথাও কেউ দেখাতে পার্‌বেন ব'লে মনে হয় না। এমন কি, অসভ্য আদিম নিবাসীদের বা অনেক জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যেও তা দেখা যায় না কেন?

আমাদের মধ্যে অপত্যস্নেহ জানাবার লোভনীয় রীতির সঙ্গে

আমাদের প্রাণটি বাঁচাবার এই বাড়াবাড়ী চেষ্টার বিশেষ সম্বন্ধ আছে ব'লে মনে হয়। অভিভাবকেরা শৈশব হ'তে শিশুদের প্রাণটা বাঁচাবার, বা যেখানে প্রাণহানির একটুও সম্ভাবনা আছে, এমন ব্যাপার থেকে তফাতে রাখবার জন্য, এত রকম অনুষ্ঠানের ও চেষ্টার এত আড়ম্বর দেখান, আর অতিরিক্ত স্নেহ জানাতে গিয়ে ছেলেদের মনে এই কথাটা অনর্থক এত ক'রে এঁকে দেন যে, অসৎ, চিরব্যাধিগ্রস্ত বা মনুষ্যনামের কলঙ্ক হয়েও, খালি বেঁচে থাকাটাই যেন জীবনের একমাত্র স্বার্থকতা।

শিশু সন্তানের খালি প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, কুসংস্কারবশে আমরা অকারণ এমন সব অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করি যে, তাতে করে সন্তানত স্বল্পায়ু এবং চিররুগ্ন হয়ই, অধিকন্তু তার এমন মানসিক অধঃপতন ঘটে যার ফলে জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত হয়। এ ত অনেক দূরের কথা, মোটামুটি শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ব'লে জিনিষটা আমরা করিও না, জানিও না। অন্য দেশের সঙ্গে এ দেশের শিশুমৃত্যুর তুলনা কর্‌লেই তা ধরা পড়ে। এ ছাড়া আঁতুড় ব'লে যে অমানুষিক ব্যাপারটা ঘরে ঘরে শিশুর বাঁচন-মরণের নিয়ন্তৃরূপে বিরাজ কর্‌ছে, সে কথা ভাব্‌লে সত্যই মনে হয় না যে, আমরা আমাদের অপত্যের শারীরিক বা মানসিক কোন রকম হিত কামনা করি। আমরা শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে স্নেহ করি না, করি শুধু স্নেহ করে সুখ পাই ব'লে।

অবশ্য, আজকাল কোন কোন স্থলে আঁতুড়ের একটু আধটু উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু আঁতুড়্ ব'লে জিনিষটা লোপ পায়নি। তার পর শিশুপালন ব'লে যে একটা বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা আছে, তাও আমরা স্বীকার করি না। আবার "যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে" এ সত্যের ওপরও নাকি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি। এ সত্ত্বেও ছেলের প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখবার কতকগুলা অকারণ চেষ্টার যে ঢং দেখাই, তাতে বেঁচে থাকার

জন্য বেঁচে থাকাটাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ব'লে একটা ধারণা ছেলেদের অস্থিমজ্জাগত হয়ে যায়।

লাট বধের জন্য প্রেরিত হত্যাকারী সে দিন অপরাহ্নে শিলংএ পৌঁছল। একটু খোঁজ কর্‌তে না কর্‌তেই বারীন যে লোকটির কথা ব'লে দিয়েছিল, পথে তাকে পে'ল। হত্যাকারীকে তিনি চিরপরিচিতের ন্যায় এত অধিক খাতির দেখালেন যে, তাকে টিক্‌টিকি ব'লেই প্রথমে তার সন্দেহ হ'ল। পথে যেতে যেতে কথাবার্ত্তায় সে বুঝল, তার শিলংএ যাবার মতলব আদি সবই ঐ ভদ্রলোকটি জানেন।

তিনি তাকে নিয়ে অন্য এক ভদ্রলোকের বাড়ী উঠলেন। সেখানে আরও দু তিন জন এসে জুটলেন। বারীন সেখানে কি কর্‌তে গেছল আর কি করেছিল, সবিস্তারে তাকে তাঁরা বল্‌লেন। ফুলার সাহেব রোজ সকালে ঘোড়া চ'ড়ে বেড়াতে যেতেন। বেড়াবার পথে কোন একটা রাস্তায় নাকি এমন সুবিধাজনক স্থান ছিল, যেখান থেকে বোমা ছুড়ে ফেল্‌লেই লাট সাহেব ত ঘোড়া সমেত কাত হতেনই, অধিকন্তু হত্যাকারী লম্বা দিলে ধর্‌তেও পারত না, দেখতেও কেউ পেত না। কিন্তু বারীন ও তার সঙ্গী এক দিন একটা গুলী-ভরা রিভল্‌বার ঘষে মেজে সাফ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ সেটা আওয়াজ হয়ে গেল। তাতে উক্ত সঙ্গীর হাতের তেলো ফুটো হয়ে গেছল। তাকে তখন নাকি অগত্যা হাঁসপাতালে যেতে হয়েছিল। তাই লোকজানাজানি হয়ে গেল। যেখানে বারীনরা ছিল, সেখানকার কেউ এ ষড়যন্ত্রের কথা কিছুতেই জান্‌ত না। কাযেই এ ব্যাপার সন্দেহজনক ব'লে সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত হ'তে হয়েছিল। আর ফুলার সাহেবও সেই সময় গৌহাটী যাত্রা করেছিলেন। এই সব কারণে শিলং ছেড়ে বারীনকে গৌহাটী ফিরে আস্‌তে হয়েছিল।

বারীনের কাছে শিলংএর ঐ ভদ্রলোকেরা আমাদের গুপ্ত সমিতির বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের সব লোমহর্ষণ বিবরণ শুনেছিলেন, তা হ'লেও ঐ হত্যাকারীর কাছে আরও শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রথমে যদিও তার একটু সন্দেহ হয়েছিল এবং গুপ্ত সমিতির কোন কিছু একটুও প্রকাশ করবে না ব'লেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত তার সে পণ কার্য্যতঃ রাখতে পারল না। কারণ, লোকের কৌতূহল বাড়াবার বা তা নিবারণ করবার অথবা কাউকে আশ্চর্য্যান্বিত ক'রে দেবার একটা সংক্রামক প্রবৃত্তি অনেকেরই মধ্যে আছে। পাঁচ জনের মজলিসে এক জন একটা আশ্চর্য্যজনক বা কৌতূহল-উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও সে রকম ঘটনা উল্লেখ করবার প্রবৃত্তি আপনা হ'তে জেগে ওঠে। অনেক স্থলে তা একটু বেশী চিত্তাকর্ষক করবার জন্য তাতে অনেক মিথ্যার ফোড়ন দিতে হয়। এ রকম মিথ্যা ধর্ত্তব্য বা দোষের ব'লে আমরা মনেই করি না। এতে উভয়তঃ বেশ আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া এমন মিথ্যার কথকরা শ্রোতার ভক্তি ও পূজা পেয়ে থাকে।

রূপকথা যেমন শৈশবের বিষয়, পুরাণ আদিও তেমনই মানব-সমাজের শৈশবের জিনিষ। আদিমকালে এ হেন শৈশবসুলভ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে প্রায় সকল মানব সমাজে এই পুরাণাদির ভেতর দিয়েই প্রচ্ছন্নভাবে সমাজকর্ত্তারা সুবিধামত সমাজশাসন উপযোগী ভাব ও শিক্ষা বিস্তার করতেন। এখন অনেক সমাজের জনসাধারণ সেই শৈশবের বেহুঁস অবস্থা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনসাধারণ এখনও সে অবস্থার মায়া সম্যক্ কাটাতে পারে নি।

ভারতবাসী আমরা আদিম অবস্থার মানুষের মত কোন মহৎ উদ্দেশ্যের অছিলায় বিস্ময় বা কৌতূহল-উদ্দীপক মিথ্যা কথা শুনে

অথবা শুনিয়ে ভক্তি-পূজা আদি দিতে বা আদায় করতে আজও অভ্যস্ত। যে দেশের লোকের এখনও এ হেন স্বভাব, তাদের দ্বারা এ রকম গুপ্ত সমিতি গঠন যে কেমন বিড়ম্বনা, তা সহজে অনুমেয়।

বারীনের কাছে থেকে শিলংএর ঐ ভদ্রলোকেরা যা জেনেছিলেন, গুপ্ত সমিতির মন্ত্রগুপ্তির পূরা দস্তর নিয়ম রক্ষা করতে হ'লে তা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়াই ঐ হত্যাকারীর উচিত ছিল। কিন্তু তার সে প্রবৃত্তি হ'ল না। তবে নিজ মুখে তেমন কিছু তা'দের না ব'লে নিজের মনকে বুঝাতে পেরেছিল যে, সে সমিতির নিয়ম রক্ষা করেছে। অথচ তার ভাবভঙ্গীর দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁরা যা শুনেছেন, তা অতি সামান্য মাত্র; তার বেশী এমন অনেক কিছু আছে—যা তা'দের জানান সঙ্গত নয়।

যাই হোক, বারীনকে এ রকম বৈপ্লবিক কাণ্ড সংঘটন করাবার একজন পাকা তদ্‌বিরকারক বলেই সে আগে হ'তে ধ'রে নিয়েছিল। এখন সে ধারণা সম্বন্ধে তা'র প্রথম সন্দেহের উদ্রেক হ'ল। লাটবধ-রূপ এমন ভীষণ ষড়যন্ত্রের ব্যাপার এত লোককে বলা উচিত কি না সে তর্কও তার মনে তখন এসেছিল।

তখন উচিত ব'লেই তার মনে হয়েছিল এই জন্য যে, স্থানীয় লোককে এ সব কথা না বললে তা'দের সাহায্য পাওয়া যেত না, আর স্থানীয় লোকের সাহায্য ব্যতীত এ রকম হত্যার কায সুসাধ্য হ'তে পারে না। এ ছাড়া এই উপায়ে বিপ্লববাদ প্রচারও সহজ হয়, সেই সঙ্গে বিপ্লববাদীদের প্রতি লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়ে। কিন্তু অনুচিত কেন, তা প্রমাণ করবার মত যুক্তি যদিও তার মাথায় তখন আসেনি, তথাপি ঐ কাযটা অসঙ্গত ব'লেই তার মনে লেগেছিল।

পরে কিন্তু অনেক দেখে এবং ভুগে, এই জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল যে, এ রকম ব্যাপারের কথা ব'লে বেড়ালে, সন্ত যে রকম অত্যধিক পূজা অথবা শ্রদ্ধা জোটে, তাতে স্বদেশের মঙ্গল জন্য বৈপ্লবিক হত্যা বা কোন মারাত্মক কায করবার ঐকান্তিক ইচ্ছার বদলে, ঐ রকম পূজা আদি পাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তা'দেরও ঠিক তাই হয়েছিল। বিশেষতঃ অতিরঞ্জন বা মিথ্যা দ্বারা যে প্রেরণা আসে, তা সাধারণতঃ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কারণ, মিথ্যা ধরা পড়তে বেশী দেরী লাগে না। তখন প্রতিক্রিয়ার ঠেলা সাম্‌লান মুস্কিল হয়ে পড়ে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ অল্প বিস্তর ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস। তা ছাড়া এই ভাবের মিথ্যা কথায় প্রথমে বিশ্বাস ক'রে, পরে যখন লোকে বুঝতে পারে যে, সে প্রতারিত হয়েছে, তখন তা'র ঘৃণা কিংবা ক্রোধ নিজের আহাম্মুকির ওপর না হয়ে, প্রতারকের ওপরেই হয়ে থাকে। তা'র ফলে প্রতারকের মন্দ কামনা করা প্রতারিতের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সেইজন্য অনেক স্থলে সেই সকল বিপ্লবীদের প্রদত্ত মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত খবরের বেচা-কেনা চলে। এইরূপে তা প্রতিপক্ষের অন্যায় উৎপীড়নের ওজুহাত হয়। পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে এ সকল কথার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করাবার জন্যই এখানে এত ভণিতার আবশ্যক হ'ল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সে গৌহাটীতে ফিরে এল। ফুলার বধ না ক'রেই, শিলংএ আশাতীত শ্রদ্ধা-ভক্তির স্বাদ, সে এমন ক'রে পেয়েছিল যে, বধ ক'রে একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাবার উচ্চ আশাজনিত আগেকার উদ্যম ক্রমে মিইয়ে গেছল। শিলংএর মত গৌহাটীতেও দেখল, অনেকে ভেতরের কথা, বারীণের কাছ থেকে জেনেছেন। সেখানেও উক্ত বোমার ভেতরকার একটু গুঁড়ো বের ক'রে তাতে

আগুন ধরিয়ে দেখান হয়েছিল, কেমন ফোঁস ক'রে ওঠে।* কাযেই সেখানে খাতিরও বেশ জমেছিল। গৌহাটীতে তিন চার দিন এক সঙ্গে থেকে বারীণকে চেন্‌বার প্রথম সুযোগ তার জুটল।

ফুলার বধের প্ল্যান্ আগাগোড়া শুনে তা একটু আধটু পরিবর্ত্তন করবার মতলব দিতে গিয়ে দেখল, বারীণের কাছে ও সব কিছু চ'ল্‌বে না। অথচ নিজের একটা মতলব পাকাপাকি ক'রে ফেলে, সেটা কাযে পরিণত করবার চেষ্টাও বারীণের ছিল না। অর্থাৎ যাকে want of resolution বলে, সেই জিনিষটাই সে দেখতে পেয়েছিল। মোটামুটি ভাবটা ছিল এই যে, আপনা থেকে ফেটে যায়, এমন ভাবে বোমাটা ফুলার সাহেবের গতিবিধির পথে রেখে দিয়ে, কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে তারা যেন শুন্‌তে পায় যে, সাহেব তাদের বোমাতে মারা গেছে। তা করতে শ দুই হাত লম্বা fuse বা বাতি দরকার। তা পুড়ে বোমাতে আগুন লাগতে যতক্ষণ লাগবে, ততক্ষণ তারা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে অনেক দূরে স'রে পড়তে পারে, ইত্যাদি।

সেখানে একটি ভদ্রলোক ব'সে ব'সে এই সব জল্পনা-কল্পনা শুন্‌ছিলেন। চুপি চুপি উঠে গিয়ে খানিক পরে তিনি এক গাদা কল্পনার অতীত সব জিনিষ নিয়ে ফিরে এলেন। আমাদের গুপ্ত সমিতির পক্ষে এই জিনিষগুলি হয়ে দাঁড়াল "রাধার ন-মণ তেলেরও" অধিক। রাধার সৌভাগ্য বশতঃ তখনকার দিনে এত অধিক তেল জোটান অসম্ভব ছিল। কাযেই রাধাকে আর নাচতে হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব জিনিষ জুগিয়ে, এখনকার দিনে বারীণকে নাচতে বাধ্য করেছিলেন গৌহাটীর ঐ অদ্ভুত ভদ্র লোকটি। তিনি বড় একটা

* প্রায় সকল হাই একস্‌প্লোসিভ (High explosive) আগুন ধরিয়ে দিলেও যে বিস্ফারিত হয় না, সে কথা তাদের তখনও জানা ছিল না।

কথা বল্‌তেন না। বারীণদের মন্ত্রণার মাঝখান থেকে কোন কিছু অভাবের কথা যখন শুন্‌তেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হ'লেও প্রায় তখনই তা জোগাতেন। যাই হোক, কেবল তাঁরই তখনকার কেরামতিতে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের তথাকথিত ইজ্জত রক্ষা হয়েছিল।

তার পর উল্লিখিত বোমা আর অন্য দু একটা জিনিষ কি রকম কায দেবে অথবা আদৌ কায দেবে কি না, দূরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য বারীণকে রাজি করা হ'ল। তারা দল বেঁধে অন্ধকার রাত্রে কাদাহেঁটে, জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়ল।

সহরের পুলিস পাছে বোমার শব্দ শুন্‌তে পায়, এই ভয়ে পাঁচ ছ' মাইল দূরে যাওয়া স্থির হয়েছিল। কিন্তু মাইল দুই যাবার পর দলের একজন বল্‌লেন, ঐ জঙ্গলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতী দলে দলে বে'র হয়। এই না শুনে, হাতীর ভোঁতা পায়ের তলায় তাদের এমন মূল্যবান্ প্রাণগুলি থাম্‌কা দেওয়া উচিত যে নয়, তা সাব্যস্ত হয়ে গেল। কাযেই একটু আফ্‌শোষ ক'রে দলটি ফিরে এল।

তার পরেও অনেক জল্পনা-কল্পনা চল্‌তে লাগল। এই সব থেকে সে বুঝেছিল, ফুলারবধটাই বারীণের কাছে সব চেয়ে বড় কায ছিল না। বিপ্লববাদপ্রচার আর সেই সঙ্গে আত্মপ্রচারটাই ছিল মুখ্য কায। এই প্রচারের ধরণটা ছিল এই যে, তারা ফুলারলাটকে বধ করতে এসেছে; তা'দের সঙ্গে বোমা, রিভল্‌বার আদি কত কি আছে; কত বড় বড় লোক তা'দের দলে আছেন; তারা কত রকম ভীষণ কায করেছে; এই সব দেখে শুনে ও তাদের দ্বারা সম্পাদিত "যুগান্তর" প'ড়ে লোকের বোঝা উচিত, তারা কেউকেটা নয়। কাযেই তা'দের পূজা দেওয়া উচিত, চেলা হওয়া উচিত ইত্যাদি।

তখন সে কতকটা অনুমান করতে পেরেছিল যে, ফুলারবধের সম্ভাবনা বড় কম। অথচ বারীণের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌তে গেলে তার সঙ্গে বনিবনা ত হবেই না; অধিকন্তু 'ক' বাবুর বিরাগ ভাজন হ'তে হয়। কাযেই এখন থেকে "ডনকুইকযোটের" * স্যাঙ্কো পাংশার মত তাকে বারীণের আজ্ঞাবহ অনুচর হ'তে হ'ল। স্যাঙ্কোর মত তার মাঝে মাঝে যখন কাণ্ড জ্ঞান জন্মাত, তখন বারীণের ওপর মনে মনে ভারি চটে যেত। আর অন্য সময় স্বাধীন ভারতে একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাবার আশায় বারীণের সকল কথায় সায় দিয়ে চলাই উচিত ব'লে মনে ক'রত। কিন্তু এও সত্য যে কুইক্সযোটের মত বারীণের অনন্যসাধারণ অনেক গুণে এই ভারতীয় স্যাঙ্কোও মুগ্ধ হয়েছিল।

তিন চার দিন পরে সেই অদ্ভুত যোগাড়ে ভদ্রলোকটির কৃপায় বারীণরা জান্‌তে পারল, ফুলার সাহেবের যে ভ্রমণবিবরণী (tour programme) সাধারণকে জানাবার জন্য বের হ'ত, সে অনুযায়ী কায হ'ত না। অর্থাৎ অন্য যে বিবরণী অনুযায়ী লাটসাহেব ভ্রমণ করতেন, তা সাধারণকে জান্‌তে দেওয়া হ'ত না। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, লাট সাহেবকে কেউ যে হত্যা ক'রতে পারে, এ সন্দেহ তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল।

যাই হোক, গুপ্ত ভ্রমণবিবরণী থেকে তারা জান্‌তে পেরেছিল, বরিশালে গিয়ে সাহেবকে ধ'রতে পারবে। তাই আমাদের স্যাঙ্কোকে সঙ্গে ক'রে বাংলার কুইকযোট ষ্টীমার যোগে বরিশাল রওয়ানা হ'ল। দিন কতক পরে একদিন সকালবেলা ঘাট থেকে এব

* The History of Don-quixote De la Mancha by Miguel De Cervantes Savedra.

দূরে তাদের ষ্টীমার গিয়ে দাঁড়াল। তখন তারা দেখ্‌ল, জেটিতে ফুলার সাহেবের স্পেশ্যাল ষ্টীমার "ব্রহ্মকুণ্ড" ভিড়ান রয়েছে; ঘাটের ওপরে রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে বিস্তর লালপাগড়ী পাহারা দিচ্ছে। টুপী, সাম্‌লা, কোট, চোগা, চাপকান আদি নানা বেশ-ধারী হরেক রকম লোক লাট-অভ্যর্থনার জন্য ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

"ব্রহ্মকুণ্ড" হ'তে নেমে অভ্যর্থনা সেরে ফুলার সাহেব বরিশাল সহরে প্রবেশ কর্‌লেন। পূর্ব্বউল্লিখিত বরিশালের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের পর লাট সাহেবের এই প্রথম আগমন। সাম্‌নে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ দূরে চ'লে গেলে. নতুন কাঁচা শিকারীর যে সোয়াস্তি মিশ্রিত আফ্‌শোষ হয়, ফুলার-শীকারীদেরও প্রায় তাই হয়েছিল।

এমন দাঁওটি হাতছাড়া হ'ল, এই দুঃখ কর্‌তে কর্‌তে বোমা রিভল্‌বার আদি পূর্ণ দু'টো ব্যাগ ঘাড়ে ক'রে আমাদের স্যাঙ্কো কুইক-যোটের পেছনে পেছনে, গেঁয়ে চালে যেতে যেতে, ঘেরাও ঘরওলা হোটেল খুঁজে কোথাও পেল না। সব হোটেলে তিন দিকে চাঁচড়ার বেড়া দেওয়া সারি সারি বাঁশের মাচান আগন্তুকদের থাক্‌বার জন্য নির্দ্দিষ্ট। এত সাংঘাতিক জিনিষপত্র নিয়ে ও রকম যায়গায় থাকা নিরাপদ নয় দেখে, অগত্যা তারা এক জন স্বদেশী নেতার বাড়ীতে উঠে পড়ল। তিনি কুলপরিচয় জেনে বারীণকে খুবই খাতির-যত্ন কর্‌লেন।

সেই সময় বরিশালে ভীষণ দুর্ভিক্ষের জন্য স্বর্গীয় লোকপূজ্য অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে দাতব্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল। তিনি দিনরাত কি রকম অক্লান্ত পরিশ্রমে লোকসেবা কর্‌তেন, তা দেখে হতভম্ব হয়ে যেতে হ'ত। বরিশাল ছাড়া আশেপাশের অন্য জিলা

হ'তেও নিত্য শত শত লোক শুধু অন্ন-বস্ত্র ভিক্ষার জন্য নয়, নানা বিষয়ের পরামর্শ করতে বা উপদেশ নিতে আসত। কারও ছেলের কিম্বা মেয়ের বিয়ে, কি করবে, তার পরামর্শ চাই; কারও গৃহস্থালী ঝগড়া, কারও ছেলে অবাধ্য, কারও বা ব্যারাম সারে না, কারও গরু হারিয়েছে, ইত্যাদি যত কিছু মুস্কিল, অশ্বিনী বাবুর কাছে তা'র আশানের ব্যবস্থা না নিলেই নয়। বড়ই আশ্চর্য্য এই যে, কেউ প্রায় হতাশ হ'য়ে ফিরত না। যদি দেবতা ব'লে কিছু থাকে, তবে অশ্বিনী বাবু তাই ছিলেন।

বরিশালবাসিগণ, বিশেষতঃ যুবকগণ অশ্বিনীবাবুর গুণের মর্য্যাদা উপযুক্ত রকমেই করেছিলেন। কিন্তু আত্মমর্য্যাদার ভিত্তি, যে আত্মনির্ভরতার ওপর গঠিত, আর আপন বিচারবুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা যে আত্মশক্তির উপলব্ধি হয়, তা যেন তাঁরা খুব বেশী ক'রে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। আমাদের ভক্তির দেশে আমার এ কথাটা আপাততঃ নেহাৎ ধৃষ্টতার পরিচায়ক ব'লেই বিবেচিত হ'বে। কিন্তু এ কথাও ধ্রুব সত্য যে, পরনির্ভরতা বলে জিনিষটা, দেশের নেতা, বিদেশী কর্ত্তা বা স্বয়ং ভগবানের ওপর হলেও, যত দিন আমাদের স্বভাবে তা থাকবে, তত দিন, যে কোন স্বাধীনতার জন্য এই তথাকথিত বিপ্লব চেষ্টা, যা ইদানীং সুরু হয়েছিল, কার্য্যতঃ অসম্ভব থাকবেই।

বারীণ বড় আশা করেছিল, বরিশালে একটা মস্ত বড় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি দেখতে পাবে, অথবা সহজে সে রকম একটা গ'ড়ে তুলতে পারবে। কারণ সদ্য কয়েক মাস আগে উক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে বাংলার তখনকার সমস্ত বড় বড় নেতাদের এমন লাঞ্ছনা, বরিশালবাসী, বিশেষ ক'রে সেখানকার ছাত্রগণ নিজের চোখে যেমনটি ক'রে দেখেছিল, এ দেশে তেমন আর কোথাও কেউ

তখনও দেখেনি। তার পর 'পিটুনী' পুলিসের পিটুনী যেমন তারা হজম করেছিল, এমনটিও সে যাবৎ কেউ করেনি। বরিশালের ব্যাপার সম্বন্ধে কাগজে পড়েই অন্য স্থানের কত লোক বিপ্লববাদে নতুন ক'রে সহানুভূতি না দেখিয়ে পারেনি। ঐ ঘটনার পর বৈপ্লবিক দলে টেনে নেবার সব চেয়ে অমোঘ মন্ত্র হয়েছিল বরিশালের লাঞ্ছনার উল্লেখ করা। তাই বারীণের মনে ভয়ও হয়েছিল, কলকাতার ওপর চাঁটি মেরে 'পুণ্যে বিশাল বরিশাল'ই বুঝি বিপ্লবের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়।

বারীণ প্রথমে সেখানকার অনেক সভা-সমিতির সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে খুঁজতে লাগল, তাদের ভেতরের মতলব কি। সপ্তাহখানেক পরে যখন দেখল, বৈপ্লবিক ভাবের কোথাও নামগন্ধও নেই, তখন নিজের মামুলী কায়দা আরম্ভ করল, অর্থাৎ তারা যে কত বড় বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি গ'ড়ে তুলেছে, সমস্ত বাংলাদেশে তার যে কত শাখা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, ভারতে অন্য প্রদেশে যে ঐ রকম সমিতির কায কত এগিয়ে গেছে, ইত্যাদি এমন কায়দা-দোরস্ত ক'রে বারীণ বলতে লাগল, আর শ্রোতারা শুনে, অন্ততঃ খালি তখনকার মত, বিপ্লবের ভাবে এমন অনুপ্রাণিত হয়ে গেল যে, তা দেখে বারীণের ওপর আমাদের স্যাঙ্গাৎর ভক্তি গদগদ হয়ে উঠল।

সেখানকার ছাত্রমহলে তখন এক জন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোড়ল ছিলেন। প্রথমে তাঁর স্কন্ধে চাপবার চেষ্টা হ'ল। তাঁকে বোমার মসলা কিছু সংগ্রহ ক'রে দিতে হবে, আর তাঁর বাড়ীতে লুকিয়ে বোমা আদি রোদে শুকিয়ে নিতে হবে, এই ছুতো ক'রে তারা ঐ ভদ্রলোকটির বাড়ী গিয়ে তাদের ব্যাগ খুলে, সব তোড় জোড় দেখাল, আর মামুলী কায়দায় বচনও অনেক ঝাড়ল। কিন্তু এত

ক'রেও বরিশালে উল্‌টো ফল ফল্‌ল। সেখানে কেবল একমাত্র কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হয়।

ফুলার সাহেব দু এক দিন পরে সেখান থেকে নিরাপদে চ'লে গেলেন। তখন পূর্ব্বোক্ত কন্‌ফারেন্সে দুর্ঘটনার কর্ত্তা যে সকল সাহেব (মিঃ কেম্প আর মিঃ ইমারসন ?)।—তাঁদের বধ করবার চেষ্টা করতেই হবে, এই অছিলায় সেখানে তাদের কিছুদিন থাকা দরকার হয়ে পড়ল। তাই সাহেবদের কুঠী, ক্লাব হাউস, এবং সাহেবদের অন্যান্য গতিবিধির স্থান চিনিয়ে নেবার জন্য অর্থাৎ reconoiter কর্‌বার জন্য, সেখানকার জনকতককে তাদের "সাহেব বধের মতলবটা আগেই বল্‌তে হয়েছিল। তারা যে সেখানে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাবার চেষ্টায় আছে, এ কথাটা অনেকের মধ্যে খুব সম্ভব এই কারণে জানাজানি হয়ে গেছল। এ জন্যই হোক্ বা পূর্ব্বোক্ত মোড়ল মশয়ের কাছে শুনেই হোক, সেখানকার কর্ত্তা বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে নাকি নিষেধ আজ্ঞা জারী করেছিলেন তাই অন্যস্থানের মত সেখানে যুবকদের মধ্যে সাড়া না পেয়ে তর্কযুদ্ধে কর্ত্তাকে জয় কর্‌বার জন্য আমাদের কুইক্‌যোট, তাঁর কাছে বৈপ্লাবিক গুপ্ত সমিতি গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কথা তুল্‌তেই, বাংলার অন্য নেতাদের মত তিনি আগেই ব'লে দিলেন, তিনি যে পথে চল্‌ছেন, সে পথ ছেড়ে, নতুন ক'রে অন্য পথে যাবার তাঁর সামর্থ্যও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

তারপর সেই দিনই তিনি আমাদের কুইক্‌যোট ও স্যাঙ্কোকে, "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" ক'রে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার এমন একটা কৌশল খেল্‌লেন যে, তারা পরদিন ভোরে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

সেখানে একটাও রিভল্‌বার কারও কাছে ছিল না। একটা এমন অস্ত্র কাছে থাক্‌লে, আবার কোন দুর্ঘটনার সময়, উত্তেজনার বশে সেটার যদি সদ্ব্যবহার হয়ে যায়, হয় ত এই আশায়, তারা উক্ত মোড়ল মশয়কে একটি ভাল রিভল্‌বার দিয়ে এসেছিল। কয়েক মাস পরে স্বয়ং মোড়ল মশয়ের বরাতে তাদের প্রত্যাশিত লাঞ্ছনাও লাভ হয়েছিল। পুলিশের তোফা ঠেঙ্গানী খেয়ে রিভল্‌বারের সদ্ব্যবহারের বদলে, কর্ত্তার হুকুম নিয়ে, খবরের কাগজে লেখা, আর সাহেবকে ব'লে দেওয়ারূপ অস্ত্রের নাকি শুধু পাঁয়তাড়া দেখিয়েই বীরচূড়ামণি বলে, বিশেষ করে ছাত্রমহলে, তিনি পূজিত হয়েছিলেন।

উল্লিখিত কন্‌ফারেন্সের সময় একটি বালক পুলিশের অজচ্ছল ডাণ্ডা খেয়েও 'বন্দে মাতরম্' বলা বন্ধ করেনি। তার পরেও ডাণ্ডা পেটা হ'তে হ'তে নিকটের একটা পুকুরে গিয়ে পড়ে; তখনও ডুব দিতে দিতে 'বন্দে মাতরম্' বলে, আর ডাণ্ডাও খেতে থাকে। চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বালকের সেই অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখে গৌরব অনুভব কচ্ছিল, আর দেশীয় প্রায় সকল খবরের কাগজে পরে বড় বড় অক্ষরে লিখিত সেই বীরত্বের কাহিনী প'ড়ে প্রায় বাঙ্গালীমাত্রেই তখন ধন্য হচ্ছিল।

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে সহজে অনুমিত হয় যে, বাংলা দেশে অহিংসাবাদটি সদ্য নতুন পাওয়া নয়। এটা বাঙ্গালী চরিত্রের ভেতরকার জিনিষ, বাঙ্গালী চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর গৌরবের বস্তু। এই অহিংসাবাদের খাতিরেই বাঙ্গালী, সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে না। সত্যি করে সদ্য মারামারি কাটাকাটির কোন সম্ভাবনা নেই, তথাপি "ইউনিভারসিটি কোরে" বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যথেষ্ট সৈন্য জোটে না। এ বিষয়ে দুনিয়াতে আমরা অতুলনীয়।

আমাদের কুইক্‌ষোট আর স্যাঙ্কো আবার গৌহাটী রওয়ানা হ'ল। পথে একদিন চাঁদপুরে নেমেছিল। পূজাও পেয়েছিল। গৌহাটী এসে জান্‌তে পার্‌ল, লাট সাহেব রংপুর দিয়ে যাবেন। দু'তিন দিন পরে তারা রংপুর রওয়ানা হ'ল। সেখানে প্রথমে থাক্‌বার স্থান জোটেনি। তখন সেখানে স্বদেশী আন্দোলন পুরোমাত্রায় চল্‌ছিল। একটি গুপ্ত সমিতিও সবে গ'ড়ে উঠেছিল। লাঠিখেলা, কুস্তি, দৌড়ন, এয়ারগানে চাঁদমারীর তালিম ইত্যাদি চল্‌ছিল। দু'তিন জন ভদ্রলোক অন্তরের সহিত এই সব কাযে লেগে পড়েছিলেন। তাঁরাই সেখানকার নেতা ছিলেন। উপনেতার বোধ হয় বেশী বাড়াবাড়ি ছিল না। কর্ম্মী ছিল কতকগুলি বালক।

সেখানকার সমিতিও মেদিনীপুর সমিতির মত কল্‌কাতার কেন্দ্র-সমিতির আধিপত্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। কল্‌কাতা থেকে নেহাৎ অর্ব্বাচীন বালক বা যুবক, নিজেকে কলকাতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত প্রচারক বা পরিদর্শক ব'লে পরিচয় দিয়ে, কল্‌কাতার বাইরে স্থানীয় প্রবীণ নেতাদের ওপর বৃথা চাল মার্‌ত, আর টাকা আদায়ের চেষ্টা করত। রংপুরে কটি প্রবীণ ভদ্রলোক এ জন্য কল্‌কাতার নেতাদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছিলেন। তাই বারীণকে তাঁরা খুব একচোট শুনিয়ে দিলেন। অনেক লোক সেখানে ছিলেন। বারীণ এত লোককে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ল না। বোমা রিভল্‌বার আদি দেখানর অথবা লাট বেলাট বধ mission এর টোপ ফেল্‌বারও সুবিধা পেলনা। অগত্যা কয়েক জন বিশেষ ব্যক্তিকে বল্‌ল যে, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কোন এক জনকে গোপনে, তাদের রংপুরে আস্‌বার গুরুতর উদ্দেশ্য, আর সে জন্য স্থানীয় নেতাদের সাহায্য কি রকম দরকার, তা বল্‌তে পারে।

তাঁরা একজনকে পাঠালেন। সন্ধ্যার পর নির্জ্জন এক পুকুর ঘাটে তাঁর সঙ্গে কথা আরম্ভ হ'ল। স্যাঙ্কোও আত্মারাম 'সরকারের ঝুলি' অর্থাৎ বোমা আদি পূর্ণ দুটি ব্যাগ ঘাড়ে করে গেছল। যে সকল কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তার ভাবটা ছিল এই—কল্‌কাতার গুপ্ত সমিতি কত সব গুরুতর ব্যাপার সাধন ক'রে ফেলেছে, জিলায় জিলায় কত সব কেন্দ্র খুলেছে, সমস্ত ভারতময় আর আমেরিকা য়ুরোপেও তাদের লোক গিয়ে কি রকম জোগাড়যন্ত্র এবং কাজ কর্‌ছে, আরও অনেক কিছু, যার সবটা খুলে বলা গুপ্ত সমিতির নিয়মবিরুদ্ধ বলেই ব'ল্‌তে পার্‌ছে না। খালি ইঙ্গিতে মাত্র কিঞ্চিৎ জানাতে বাধ্য হচ্ছে, ইত্যাদি। অবশেষে ঝুলি থেকে বোমা বের ক'রে, তা থেকে একটু গুঁড়ো নিয়ে দেশলাই ধরিয়ে দিতেই, অমনি ফোঁস ক'রে জ্বলে উঠল। তার পর বলেছিল, রিভল্‌বার দুর্ঘটনার জন্য শিলংএ ফুলারবধের চেষ্টা ফস্‌কে গেছে, তাই রংপুরে সেই চেষ্টা তারা কর্‌তে এসেছে। এই সকল দেখে শুনে সেই ভদ্র-লোক খুসী হয়ে গেলেন। আমাদের কুইক্‌যোট ও স্যাঙ্কোর থাকার এবং ভোজনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর সাধ্যমত সাহায্য কর্‌তে তাঁরা রাজিও হলেন। আমাদের স্যাঙ্কো, বচনের সাফাই দেখে মনে মনে বারীণকে বেজায় তারিফ করেছিল। যাই হোক্, এই প্রকারে তারা দুজন রংপুরে বেশ আড্ডা গেড়ে বস্‌ল, আর নিরাপদে ফুলার সাহেবকে কি রকম ক'রে মারা যেতে পারে, তার মতলব আঁট্‌তে লাগল।

অনেক মতলব ভাঙ্গা-গড়ার পর অবশেষে স্থির হ'ল এমন ভাবে রেল লাইনের নীচে বোমা পুতে রাখতে হবে যেন গাড়ী সেই লাইনের ও'পর এসে প'ড়ামাত্র আপনা হতে বোমা ফেটে ট্রেণখানা

ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তখন এই মৎলব কাযে পরিণত করবার আবশ্যক জিনিষ কেন্‌বার জন্য, শ্যাঙ্কো কল্‌কাতা রওনা হ'ল। সেখানে "ক" বাবুর কছে, সে যাবৎ ফুলার-বধ চেষ্টার সমস্ত বিবরণ ব'লে টাকার অভাব জানাল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্যাটরা হাত্‌ড়ে, সব সমেৎ পঁচিশটি টাকা মাত্র তাঁর সম্বল আছে, দেখালেন। তা'ই শ্যাঙ্কোর হাতে তুলে দিলেন। দরকারী দু একটা কিছু কিনে সে সেই দিনই রংপুরে যাত্রা কর্‌ল।

আমাদের কুইকষোট শ্যাঙ্কোর মারফৎ আশানুরূপ টাকা না পেয়ে 'ক' বাবুকে টাকা পাঠাবার জন্য আবার তাগাদা দিয়েছিল। টাকার কোন উপায় না দেখে, 'ক' বাবু নরেন গোসাইঁকে রংপুরে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন, ডাকাতি ক'রে টাকা সংগ্রহ করা চাই।

ডাকাতিতে নরেন গোসাইঁ সব চেয়ে পটু ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছিল। আর সেও সেই ভাবে বড়াই কর্‌ত। সে ছিল শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার গোসাইঁ বাবুদের এক জন বংশধর। তিন চার পুরুষ আগে বাংলার অনেক জমীদারই উক্ত কর্ম্মে নিপুণতা দেখাতে পার্‌লে যে গৌরব অনুভব কর্‌তেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে শ্রীরামপুরের গোসাইঁ জমীদাররা কখনও তেমন নিপুণ ছিলেন কি না' জানি না। আমাদের গুপ্ত সমিতির আর্থিক অবস্থা বিশেষ ক'রে প্রধান কেন্দ্রের অবস্থা কেমন ছিল, এ থেকে তা সহজে অনুমিত হ'তে পারে। আমাদের বদ্ধমুল ধারণা ছিল (এখনও আছে, বরং বেশী হয়েছে), অর্থকরী কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না কর্‌লে কেউ দেশ উদ্ধারের প্রকৃত নেতা, এমন কি, সামান্য কর্ম্মীরও যোগ্য হ'তে পারে না।

তার পর ধুবড়ীতে একজন লোক এই জন্য পাঠান হ'ল যে, লাট সাহেব স্পেশ্যাল ট্রেণে রংপুরের দিকে রওয়ানা হ'লেই সে তৎক্ষণাৎ রংপুরে টেলিগ্রাম করবে। তা হ'লে রংপুরে এই ট্রেণ পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে, সেখানকার ষ্টেশন থেকে এক মাইল আগে, একটা সুবিধামত যায়গায়, লাইনের তলায় ব্যাটারী লাগিয়ে বোমা রেখে আসা হবে। আর ঐ ষ্টেশনের বিপরীত দিকে এক মাইল দূরে, আমাদের স্থাঙ্কো ও মজঃফরপুর বোমার ব্যাপারের প্রফুল্ল চাকী, লাইনের ওপর লাল লণ্ঠন নিয়ে হাজির থাকবে। লাট সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেণ রাত্রেই রংপুর ষ্টেশন দিয়ে যাবে ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছিল। লাল আলোটা এমন ভাবে লাইনের ওপর রাখা হবে, দূর থেকে দেখে যেন মনে হয়, একটা লোক লাল আলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যদি ষ্টেশনের ওধারে উক্ত বোমা কোন গতিকে ফস্‌কে যায়, তা হলে লাট সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেণ, ষ্টেশনের এধারে এ'সে লাল আলো দেখে, নিশ্চয় দাঁড়াবে। তখন দু'দিক থেকে ঐ দু'জন রিভল্‌বার নিয়ে লাট সাহেবের কামরাতে উঠে প'ড়ে গুলী চালাবে।

আক্রমণের এই দুটি মতলবের, শেষেরটার ওপর একেবারে আমল দেওয়া হয়নি। কারণটা বোধ হয় এই ছিল যে, শেষেরটাতে প্রথমটার চেয়ে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা যেমন অনেক বেশী ছিল, কার্য্যসিদ্ধির পর ধরা প'ড়ে ফাঁসিতে ঝুলবার ভয়ও তেমনি ছিল। এই প্রচেষ্টা গোড়াতে যাই হোক, পরে ক্রমশঃ যত দেরী হ'তে লাগল, ততই কেবল অছিলারূপে পরিণত হল; বিপ্লববাদপ্রচার আর সেই সঙ্গে আত্মপ্রচারটাই হয়ে দাঁড়ালে প্রধান কায।

এই বন্দোবস্ত পাকা করবার পর ডাকাতির চেষ্টা সুরু হ'ল। কারণ, ফুলার সাহেবের রংপুর দিয়ে যাবার দেরী ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বৈপ্লবিক ডাকাতির প্রথম চেষ্টা

প্রথম স্বদেশী ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল রংপুরে। অন্য স্থানে ডাকাতি কর্‌বার মতলব, এর আগেও আঁটা হয়েছিল; কিন্তু তা সে যাবৎ চেষ্টায় পরিণত হয়নি। রাওলাট কমিসন রিপোর্টেও এইটেকেই স্বদেশী ডাকাতীর প্রথম চেষ্টা ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে।

বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠনের সুরুতে আর্থিক সমস্যা সমাধান জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বিত হয়েছিল, তার মধ্যে ডাকাতিই ছিল প্রধান। বিপ্লবচেষ্টার অন্যান্য ব্যাপারের মত এটাও বঙ্কিমবাবুর নভেল থেকে নেওয়া হয়েছিল। আর একটা বড় সমর্থন এই ছিল যে, রাসিয়ার বিপ্লববাদীরাও না কি ডাকাতি করত; কাযেই এ দেশে ডাকাতী করা উচিত কি অনুচিত, অথবা কি রকম ডাকাতী করা উচিত, সে বিষয় কোন দ্বিধা আমাদের মনে ত আসেইনি, নেতাদের মনেও এসেছিল ব'লে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ, নেতাদের মধ্যে ডাকাতির বিরুদ্ধে একটুও প্রতিবাদ কর্‌তে কাউকে কখনও শুনিনি।

রাসিয়ার বিপ্লববাদীদের ডাকাতিতে কোন বিশেষত্ব ছিল কিনা, অর্থাৎ তারা "বিধবার ঘটী চুরি" কর্‌ত কি না, সে খোঁজ কারুরই ছিল না। আর বঙ্কিম বাবুর নভেলি ডাকাতির যে একটু বিশেষত্ব (মহত্ব ?) ছিল তা আমরাও জান্‌তাম, নেতারাও জান্‌তেন। তাতে দেশের মধ্যে যে অর্থশালী ব্যক্তি খয়েরখাঁই বা মুখবীরের (informer) কায করত, অথবা যে সাধারণের অপ্রিয়, অত্যাচারী, পরস্বাপহারক, সুদখোর,— তাদেরই অর্থ ডাকাতি ক'রে শিষ্ট, দরিদ্র, দুঃস্থ, অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য

কর্‌বার ব্যবস্থা ছিল। গুপ্ত সমিতির সুরুতে আমাদেরও এই ধারণা ছিল যে, সরকারী কোন অফিসের, রেলওয়ে কোম্পানীর, বিদেশী বণিকের টাকাই ডাকাতি কর্‌তে হবে। সরকারী অফিসের টাকা যে দেশের লোকেরই টাকা, অর্থাৎ তা যে দেশেরই আয়-ব্যয়ের তহবিলের টাকা, আর তা'র ক্ষতি-বৃদ্ধির জন্য যে, দেশের লোকই দায়ী, সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। টাকা বা নোটজালের কল্পনাও অনেকের মাথায় এসেছিল, তা কাযে পরিণত হয়েছিল ব'লে শুনিনি।

যাই হোক্, এ যাবৎ চাঁদা, দান আদির দ্বারাই গুপ্ত সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহ চল্‌ছিল। এখন তাতে আর চলে না দেখে, বিশেষতঃ হঠাৎ টাকার খুব দরকার হয়ে পড়ায়, অন্য উপায় অভাবে, 'ক'-বাবু ডাকাতির হুকুম দিলেন। ডাকাতি যে তথাকথিত actionএর একটা অঙ্গ, তা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু কা'দের টাকা ডাকাতি কর্‌তে হ'বে, তা'র কোন বিধি-ব্যবস্থা 'ক'-বাবু দেননি।

কার টাকা ডাকাতি করা যেতে পারে, এই সমস্যা মীমাংসার জন্য রংপুরের নেতাদের সঙ্গে কয়েক দিন ধ'রে পরামর্শ চল্‌তে লাগল, সে সময় পাটের মহাজনেরা দাদন দেবার জন্য তোড়া তোড়া টাকা নিয়ে আনাগোনা কচ্ছিল। তাদের ওপরেই নজরটা পড়ল প্রথমে। কিন্তু দেখতে তারা ছিল ভারী 'তাকৃড়া'। তা'র পর রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস আর স্থানীয় অনেক বড়লোকের কথা উঠেছিল। কোথাও কিন্তু বড় সুবিধা হ'ল না, অর্থাৎ নিরাপদ বা অহিংস ডাকাতির সম্ভাবনা খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে একজন সন্ধান দিলেন, রংপুর সহর থেকে ১২।১৩ মাইল দূরে, তাঁর বাড়ীর নিকট গাঁয়ে এক বিধবার নাকি হাজার খানেক নগদ টাকা আছে। তার বাড়ীর আশে পাশে এমন পুরুষমানুষ না কি কেউ ছিল না যে, ডাকাতদের একটুও বাধা দিতে

অর্থাৎ হিংসা করতে পারে। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই বিধবার বাড়ীতেই স্বদেশী ডাকাতির বউনি করা স্থির হ'ল।

স্যাঙ্কো এই রকমের নিরাপদ বা আজকালকার ভাষায় অহিংস স্বদেশী ডাকাতির নামকরণ করেছিল "বিধবার ঘটী চুরি।"

সেই ঘটী চুরির জন্য আয়োজন হ'তে লাগল। জাঙ্গিয়া, কুর্ত্তা আদি তয়ের করতে দেওয়া হ'ল কিন্তু স্থানীয় এক দর্জ্জিকে। যুক্তি স্থির হ'ল যে, বিধবার সন্ধান দিয়েছিলেন সেই যে সন্ধানী, তিনি সত্যিকার এক জন ডাকাতকে, সাহায্য করবার জন্য অর্থাৎ আমাদের স্বদেশী বাবু-ডাকাতদের হাতে খড়ি দেবার জন্য যথাসময় পাঠিয়ে দেবেন রংপুর থেকে রাত ৯টার সময় দু'দলে পরে পরে বেরিয়ে গিয়ে ঐ বিধবার বাড়ীর একটু দূরে, একটা নির্দ্দিষ্ট গাছতলায় তারা উক্ত ডাকাতের সঙ্গে জুটে রাত ১২টার সময় বিধবার ঘর চড়াও করবে। স্থানীয় ৬।৭ জন যুবককে এই কাযের জন্য মনোনীত করা হ'ল।

এই ঘটনার চার বছর পূর্ব্বে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেবার সময় স্যাঙ্কো যদিও শপথ ক'রে ব'লেছিল যে, দেশের জন্য অসঙ্কোচে সব করবে, তথাপি এ হেন ডাকাতি অর্থাৎ 'বিধবার ঘটী চুরি' করতে তার দ্বিধা বোধ হ'তে লাগল। যখন সে বুঝতে পেরেছিল, তাকেও ডাকাতিতে যোগ দিতে হবে, তখন প্রথমেই তার মনে এই দুর্ভাবনা এসেছিল যে, ধরা যদি পড়ে, তবে আদালতে দাঁড়িয়ে, কেন ডাকাতি করতে গেছল, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কি উত্তর সে দেবে? জবাবই যদি দিতে হয়, তবে কি তাকে বলতে হবে যে, দেশের কাযের জন্য টাকার দরকার, তাই সে ডাকাতি করেছে? তাতে ক'রে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সমিতিকে betray করা হবে। আর জবাব না দেয় যদি, তবে আদালত যা-ই মনে করুক না কেন, দেশের

লোক কি মনে করবে? সামান্য হ'লেও তার নিজের কিছু সম্পত্তি ছিল; তার অনেক সম্ভ্রান্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবও ত ছিলেন। তাদের মুখে কালি দিয়ে সামান্য টাকার জন্য এমন ঘৃণিত কায করতে গেছল কেন? তার ছেলেপিলেরা সমাজে মুখ দেখাবে কি ক'রে?

তার পর এও তার মনে হয়েছিল যে, যদি সে ধ'রেই নেয় যে লোকে অনুমান ক'রে নিতে পারবে, দেশের কাযের জন্যই সে 'বিধবার ঘটী চুরি' করতে বাধ্য হয়েছিল তা হ'লে কিন্তু তার উচিত ছিল আগে নিজের স্ত্রীপুত্র পরিজনকে পথে দাঁড় করিয়ে নিজের সর্ব্বস্ব দেশের কাযে দেওয়া; পরে আত্মীয় বন্ধুদের সর্ব্বস্ব, তার পরেও দরকার হ'লে, বঙ্কিম বাবুর নভেলি ডাকাতির অনুযায়ী অন্যায়কারীদের ডাকাতি করা। তা না ক'রে নিঃসহায় বিধবার সম্বল চুরি করতে গেল কেন, তার জবাব কি দেবে?

তার মনে দ্বিতীয় প্রশ্ন এসেছিল এই যে, দেশের লোকের সম্পত্তি ডাকাতি করা আদৌ উচিত কি না? সে জানত, বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ স্বাধীন করা; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চাই শক্তি, সেই শক্তির ভিত্তি হচ্ছে লোক-মতের সহানুভূতির ওপর স্থাপিত। নিরপরাধ দেশবাসীর ওপর এমন ডাকাতি অর্থাৎ 'বিধবার ঘটী চুরি'রূপ অমানুষিক দুষ্কর্ম্ম ক'রে বিপ্লববাদীরা লোকমতের পূর্ণ সহানুভূতি কখনও পেতে ত পারে না; অধিকন্তু অতিমাত্রায় কূটনীতিপরায়ণ প্রতিপক্ষ, বিপ্লববাদের প্রতি লোকমতকে বিরূপ করবার এমন একটা মহান্ সুযোগ কখনও ছেড়ে দিতে পারে না। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের জনসাধারণেরই কেবল মঙ্গল-সাধন করাই, যে বিপ্লববাদীদের মূলমন্ত্র বা একমাত্র ব্রত ব'লে প্রচার করা হয়,

তারাই যদি সুরুতেই বেচারা দেশবাসীর ওপর এমন অত্যাচার অক্লেশে ক'রে সেই মঙ্গল-সাধনের এই রকম প্রথম নমুনা দেখায়, তা হ'লে হাজার দার্শনিক ব্যাখ্যা-সমন্বিত ওজর সত্বেও কখনও সাধারণ লোক, এ হেন বিপ্লব অন্তরের সহিত কামনা করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—তার মনে হ'ল, যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, যেন তেন ক'রে দেশটা একবার স্বাধীন ক'রে নিয়ে, তখন বিপ্লবে যারা অত্যাচারগ্রস্ত হবে, সুদসমেত তাদের ক্ষতিপূরণ ক'রে দিলেই চল্‌বে। কিন্তু কোন ব্যারামের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের জন্য পরিমিত মাত্রায় আফিম খেতে সুরু ক'রে, রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি-লাভের পর ঐ রোগ হ'তে অধিক অনিষ্টকর আফিমের নেশা রোগী যেমন ছাড়তে পারে না, আর সেই নেশার মাত্রা যেমন ক্রমে বেড়ে গিয়ে তার মনুষ্যত্ব নাশ ক'রে ফেলে, এই ডাকাতিও যে দেশের লোকের পক্ষে সে রকম হবে না, তার নিশ্চয়তা কি? বিশেষ ক'রে বাংলা-দেশের পক্ষে! কারণ, প্রায় ৬০।৭০ বছর আগে পর্য্যন্তও এই বাংলা-দেশে, ডাকাতি বড় একটা ঘৃণিত কর্ম্ম ব'লে বিবেচিত হ'ত না; বরং খুব বাহাদুরীর কায ব'লেই অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও মনে করতেন। এই "স্বদেশী ডাকাতির" নাম ক'রে যে ভদ্রলোকের ছেলেরা আবার ঘৃণিত ডাকাতির নেশায় অভ্যস্ত হবে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে?

স্যাঙ্কো তখন যা আশঙ্কা করেছিল, পরে কাযেও তা ঘটেছিল। স্বদেশী ডাকাতির নামে বিস্তর মামুলী ডাকাতি লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলেদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আর খাঁটি বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে সকল ডাকাতি হয়েছিল, তারও অধিকাংশ টাকার অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে অপব্যবহার হয়েছে ব'লে আমরা জানি।

বল্‌তে কি, যে সকল কারণে এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা স্থরুতে বিফল হয়েছে, তার একটা কারণ হচ্ছে, এই রকম "বিধবার ঘটি চুরি" অর্থাৎ স্বদেশী ডাকাতি।

সে যাই হোক্, স্যাকো অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করেছিল, সে ডাকাতি করতে কখনও যাবে না। তাই আমাদের কুইক্‌ষোট্‌কে বলেছিল, সে লাট-বধের জন্ত এসেছে, ডাকাতি করতে আসেনি, কাযেই ডাকাতি করতে যাবে না। বারীন এতে ভারী বিরক্ত হয়েছিল। অবশেষে স্যাকোকে এই ব'লে ডাকাতিতে যেতে বাধ্য করেছিল যে 'ক'বাবুর আদেশ তাকে পালন করতেই হবে, আর সে আদেশ পালন করাবার ভার বারীনের হাতে। স্থতরাং বারীনের হুকুম অমান্ত করলেই বারীন তাকে বিদ্রোহী ব'লে অভিযুক্ত করবে।

তখন স্যাকোর পক্ষে ভারী মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল। দীক্ষা নেবার সময় নিজের মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিয়েছিল যে স্বদেশের মঙ্গলের জন্ত কৃত কোন কাযই বিবেক-বিরুদ্ধ হ'তে পারে না; বিশেষতঃ 'ক'বাবুর মত এত বড় বিজ্ঞলোকের দ্বারা কোন অন্তায় কায অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না। মানুষ যত বড় বিজ্ঞই হোক্, অথবা অবতারই হোক্, সে সব সময় সকল বিষয়ে অভ্রান্ত হ'তেই পারে না; এ কথা বেচারা স্যাকো তখন ভেবে দেখেনি। তার পর আমাদের দেশের নেতাদের বিপ্লববাদ বা রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বহর কতটুকু, তাও তার জানা ছিল না। বিশেষ বিশেষ বড়লোকদের বড়ত্বের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞানের (common-sense) অভাব। এ বিষয় 'ক'-বাবু শুধু নয়, আমাদের কুইক্‌ষোট্‌ও যে এই রকম বড়ত্বের অধিকারী, স্যাকো তাও তখন বুঝতে পারেনি। আর বৈপ্লবিক কাণ্ডটা একটা সামরিক ব্যাপার ব'লেই সে ধ'রে নিয়েছিল; কাযেই সামরিক বিধি অনুসারেই কাপ্তেনের

হুকুম কাঁটায় কাঁটায় তামিল ক'রে চল্‌তে সে বাধ্য। তাই কুইক্‌বোটের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি না ক'রে তার আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েছিল।

কিন্তু এই একটা সমস্যা তার মনে তখন এসেছিল যে, যদি কোন কর্ম্মী, নেতার আদেশ যথারীতি পালন করতে গিয়ে দেখে যে, আদেশ পালন করলে বিপ্লববাদের বা দেশের যে মঙ্গল হ'তে পারে, তার চেয়ে আদেশ পালন না করলেই অধিকতর মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে, তা হ'লে সেখানে তার কর্ত্তব্য কি?

নেতাদের মধ্যে মতভেদ হ'লে সাধারণতঃ তাঁরা নিজ নিজ মতানুযায়ী দু'দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু ক'রে দেন। কিন্তু 'চেলা বা সামান্য কর্ম্মীর পক্ষে তা ত হ'তে পারে না। বিশেষতঃ সে যে মতটাকে উচিত ব'লে মনে করে, সেই মতাবলম্বী কোন নেতা যদি দেশে থাকেন, তবেই না সে তাঁর দলভুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু যদি না থাকেন, তা হ'লে তার বিবেকসম্মত মতটাকে আমল না দিয়ে, অন্ধভাবে নেতার অন্যায় মতের অনুগমন করবে, না এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে ভেরাণ্ডা ভাজবে অথবা সেই অন্যায় মতের প্রতিবাদ করবে?

এই রকম অবস্থাচক্রে প'ড়ে পরে দেশের কাযে সমর্পিতপ্রাণ অনেক যুবক সত্য সত্যই দেশের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে ভেরাণ্ডা ভাজতে বাধ্য হয়েছিল, এখনও হচ্ছে। কারণ, তাদের মতের ন্যায্যতা দেখাতে গিয়ে নেতাদের কাছে গুণগ্রাহিতার বদলে ঘৃণা, বিদ্বেষ, এমন কি, নির্য্যাতন ভোগ করতে তারা বাধ্য হয়েছে। শুধু নেতা নয়, আমাদের দেশের লোকের স্বভাবই এই যে, যে যত লোকমান্য, সে তত অন্যের যুক্তিসঙ্গত মতামত সহ্য করতে অপারক্।

আমাদের স্যাঙ্কো নিজের বিবেকবুদ্ধি ধামাচাপা দিয়ে সেই-বারকার মত 'বিধবার ঘটী চুরি' করতে অগত্যা রাজী হয়েছিল।

তার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে ডাকাতির জন্য যাত্রা করবার পূর্ব্বে আমাদের কুইক্‌ষোট্‌ প্রকাশ ক'রে বল্‌ল, সে যখন দলপতি অর্থাৎ "কমাণ্ডার", তখন যথারীতি লড়ায়ের সময় ক্যাম্পেই থাকবে অর্থাৎ "ঘর সামলাবে', (ঘর সামলান কথাটি বারীনের নিজস্ব)।

যাই হোক, এক জনকে ওস্তাদ্‌ ডাকাত ডাকতে উক্ত সন্ধানীর বাড়ী আগেই পাঠান হয়েছিল। বাকী দশ কিংবা বার জনকে দু'দলে ভাগ ক'রে, এক দলের স্যাঙ্কো, অন্য দলের নরেন হয়েছিল সর্দ্দার। প্রত্যেক দল দুটি ক'রে রিভলবার নিয়েছিল।

তখন বোধ হয় আষাঢ় মাস; আকাশ মেঘে ঢাকা। রাত্রি ৯টার সময় নরেনের দল আগে যাত্রা করল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্যাঙ্কোর দল বেরুল। অন্ধকার, কাঁচা রাস্তা, বারো মাইলেরও বেশী; অধিকাংশ পথটায় বিশ্রী কাদা; কোথাও কোথাও একটু শুক্‌নো ছিল বটে, কিন্তু পথটা যেন দাঁত বের ক'রেই ছিল। পায়ে কারো জুতো ছিল না; কারো বগলে ছিল হাতকাটা কুর্ত্তা আর জাঙ্গিয়ার পুঁটলি; আর কারও বা ছিল জাঙ্গিয়ার ওপর কাপড় পরা।

ডাক হরকরার অনুকরণে চ'লে রাত্রি প্রায় ১১টার সময়, স্যাঙ্কোর দল নির্দ্দিষ্ট গাছতলায় পৌঁছে দেখল, নরেনের দল কিংবা সত্যিকার ডাকাত যে ডাক্‌তে গেছল, সে তখনও আসে নি। তাই তাদের দলের দু'জন গিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে নরেনের দলকে খুঁজে নিয়ে এল। আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বার পর সন্ধানী মহাশয়ের কাছ থেকে খবর এল যে, সেই গ্রামে কি একটা তদন্তের জন্য দারোগা বাবু সদলবলে সশরীরে উপস্থিত। কাযেই ফিরে যেতে হবে।

তখন জোনাকীর আলোতে ঘড়ী দেখা হ'ল, ২টা। অগত্যা ৫ টার আগে রংপুরে ফিরে আস্‌বার জন্য হাঁটুনির বেগ আরও বাড়াতে

হয়েছিল। এই ডাকাতিটা ফস্‌কে যেতে স্বাকো ভারী সোয়াস্তি অনুভব করেছিল। কিন্তু প্রথমে তা প্রকাশ না ক'রে অন্যের মনের কথা জানতে চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রায় সকলেরই মন ঐ রকম একটা কিছু প্রতিবন্ধকের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই মনোভাবই যে নরেনের পথ ভুলে যাওয়ার অনেকটা কারণ, তাও সে প্রকাশ করেছিল। ধরা পড়লে কি জবাব দেবে, এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দেওয়া বড়ই মুস্কিল দেখে, কেউ কেউ বলেছিল, বারীনের ডাকাতিতে যোগ না দেওয়ার এইটেই ছিল কারণ।

যাই হোক, তারা ভোরবেলায় রংপুরে ফিরে এসেছিল। বারীন সমস্ত শুনে বলেছিল, ডাকাতি না হলেও তার "honest attempt" (সৎ চেষ্টা) ত হয়েছে।

এর পর থেকে দু'বছর যাবৎ কত যে, এ হেন honest attempt হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। এ রকম প্রত্যেক অকারণ কষ্টের পর মন থেকে অকৃতকার্য্যতার গ্লানি মুছে ফেলবার জন্য এই বুলীটি আওড়ে গীতার মর্য্যাদা রক্ষা করা হ'ত; অথচ চেষ্টা নিস্ফল হবার কারণ কখনও খুঁজে দেখা হ'ত না। অর্থাৎ কর্ম্মেই অধিকার আছে, ফলে ত নাই। কর্ম্মের সৎ চেষ্টা ক'রে যদি ফল না ফলে, তাতে দুঃখ কিছুই নাই। হয় ত গীতার এই নীতির প্রভাবে দেশহিতের প্রায় সকল কাযই ব্যর্থ হয়ে আস্‌ছে। এ ক্ষেত্রে ডাকাতির দ্বারা লব্ধ অর্থটাই ছিল ফল। এই ফললাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ডাকাতির চেষ্টাটা আর যাই হউক, ঐকান্তিক যে হ'তে পারে না, ভুক্তভোগিমাত্রেই (অবশ্য দার্শনিক তর্কের কথা পৃথক্) অস্বীকার করতে পারবেন না। অধিকন্তু এই রকম তথাকথিত বৈপ্লবিক action সার্থক করবার চেষ্টা ঐকান্তিক

না হবার কারণ যে আদর্শের সংকীর্ণতা এবং অস্পষ্টতা, সে কথা আমরা আগেই বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। দেশের যে স্বাধীনতার জন্য লোকে সর্ব্বস্ব পণ করবে, সে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপটা কি, তা স্পষ্ট ক'রে কখনও কেউ ধারণা করতেও পারেন নি, কাযেই অন্যকে করিয়ে দিতেও পারেন না। স্বাধীনতার স্বরূপ বিশদরূপে হৃদয়ে অনুভূত না হ'লে, আর তা লাভের জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বা কামনা না জাগলে, তার জন্য চেষ্টা ঐকান্তিক হবে কেমন করে?

যাই হোক্, পায়ের ব্যথা সার্‌তে তাদের প্রায় ৪।৫ দিন লেগেছিল। ইতিমধ্যে আবার ডাকাতির মতলব আঁট্‌তে শুনে শ্যাঙ্কো কুইক্‌ষোটের সঙ্গত্যাগের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। আর সেই সময় ধুবড়ী থেকে খবর এল, লাট সাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেণ গৌহাটী থেকে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল; কিন্তু লাট সাহেব এসেই ট্রেণে না উঠে, "ব্রহ্মকুণ্ডে" চ'ড়ে গোয়ালন্দ রওয়ানা হয়েছেন। সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের তরফ থেকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হবে। তার পর সেই পথে বম্বে হয়ে বিলাত রওয়ানা হবেন।

বারীনও বোধ হয় চাচ্ছিল শ্যাঙ্কোকে তাড়াতে, তাই হয় ত নিজে না গিয়ে শ্যাঙ্কোকে গোয়ালন্দ গিয়ে লাটবধের চেষ্টা করতে দিয়েছিল। শ্যাঙ্কো প্রফুল্ল চাকীকে সঙ্গে নিয়েছিল। প্রফুল্লকে খাঁটি লোক বলেই বোধ হয় তার ধারণা হয়েছিল। সেও ইচ্ছুক ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ গোয়ালন্দ অভিমুখে রওয়ানা হ'ল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লাট-বধের দ্বিতীয় চেষ্টা

রংপুর থেকে বেরিয়ে পরদিন সকালে গোয়ালন্দে পৌঁছবার একটা কি দুটো ষ্টেশন আগে গাড়ী দাঁড়ালে, স্যাঙ্কো শুন্‌ল, ভীষণ বন্যার জন্য গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গাড়ী যা'বে না। গোয়ালন্দ ষ্টেশনে তখন না কি এক বাঁশ জল। যে ষ্টেশনে গাড়ী আটকাল, সেখানেও স্যাঙ্কো দেখ্‌ল, রেল লাইন জলে ডুবে আছে। অনেক প্যাসেঞ্জার নেমে পড়ল। অধিকাংশই বকা-ঝকা ক'রে গাড়ীতে ব'সে রইল। স্যাঙ্কো তখন নেমে গিয়ে, অনেক চেষ্টায় জেনেছিল, হঠাৎ বন্যার জন্য উক্ত লাট-অভিনন্দন স্থগিত হয়েছে; তাই লাট স্পেশ্যাল ট্রেণে কল্‌কাতা যাচ্ছেন।

তা'রা কল্‌কাতার টিকেট কিনে ফেল্‌ল। সে গাড়ীটা তখুনি পেছন হেঁটে চল্‌ল। মাঝখানে একটা ষ্টেশনে বোধ হয় গাড়ী বদল ক'রে সেই দিন সন্ধ্যেবেলা, প্রায় ৬টার সময় তা'রা নৈহাটী ষ্টেশনে পৌঁছে দেখল, লাল পাগড়ীতে প্লাটফর্ম্ম ভ'রে গেছে। অনেক পুলিস অফিসারও ঘোরাফেরা করছে। অনুসন্ধানে জেনেছিল, লাটের গাড়ী সেখানে তখনই এসে দাঁড়াবে।

তা'রা কিন্তু মৎলব এঁটেছিল, লাটের আগে কল্‌কাতায় পৌঁছতে পারবে এবং শিয়ালদা ষ্টেশনে লাট নামবার সময়, সুযোগ দেখে রিভল্‌বার চালাবে। কিন্তু ঐ সুযোগের ধারণা স্যাঙ্কো খুঁটিনাটি মিলিয়ে করতে পারছিল না। বোধ হয়, তাই তা'র মনে একটা কিন্তু ছিল। তা'র পর হঠাৎ নৈহাটীতে লাটের গাড়ী দাঁড়াবে

ব'লে যাই শুনতে পেল, আর সেখানেই যখন পুলিসের এত ঘটা, তখন কল্‌কাতাতে যে, তা' আরও বেশী হ'বে, এ চিন্তা মুহূর্ত্তমধ্যে তা'র মনে যাই এল, অমনি সেখানেই চেষ্টা করা উচিৎ মনে ক'রে প্রফুল্ল ও সে নেমে পড়ল।

তখন পুলিস অন্য সব লোকজনকে প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। কটি স্কুলের ছেলে বেড়ার বাইরে ছিল; তবু পুলিস তা'দের কাপড় জামা টিপে তালাসী করল। ঘ্যাঙ্কো দেখল, ব্যাপার বড়ই সঙ্গীন; এবং প্ল্যাটফর্‌মের ওপর থেকে কোন চেষ্টা একেবারে অসম্ভব।— তাই আবার তড়িঘড়ি একটা মতলব এঁটে ফেলল; যেন পুলিসের ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, প্রবেশদ্বার দিয়ে না বেরিয়ে, বরাবর প্ল্যাটফর্ম্মের দক্ষিণ দিকে লাইনের পাশে পাশে একটুখানি গিয়ে হাঁপ ছেড়ে ব'সে পড়ল। মনে করেছিল, তা'দেরই সামনের লাইন দিয়ে লাটের গাড়ী কলকাতা যা'বে। তাদের সামনে যখন গাড়ী আস্‌বে, তখন নিশ্চয় গাড়ীর বেগ খুব জোর হ'বে না। কাযেই তারা কোন গতিকে গাড়ীতে উঠে প'ড়ে, দু'জনেই লাটের ওপরে পটাপট গুলী চালাতে পারবে। ব্যাগের ভেতর থেকে দুজনে দু'টী রিভল্‌বার বে'র ক'রে নিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক পরে লাটের গাড়ী এসে দাঁড়াল; তখনও খুব অন্ধকার হয় নি। লাটের কাম্‌রাতে আলো জ্ব'লে উঠল! গাড়ী কেটে রেখে এন্‌জিন্‌খানা, তা'দের সাম্‌নে দিয়ে লাইন্‌ বদলে, আবার ফিরে ষ্টেশনের অন্য দিকে গেল। এ ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করবার মত মনের অবস্থা তখন তা'দের ছিল না। একটুও এদিক ওদিক না ক'রে কি ক'রে—একটি লাফে একেবারে লাটের

কামরাতে উঠে পড়বে, আর কি ক'রে একটুও কোন রকম অভিভূত না হ'য়ে গুলী চালাতে থাকবে, সামনের গাড়ীখানার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে, আগাগোড়া সেই ব্যাপারটাই মনে মনে বার বার মক্‌স কচ্ছিল। তা'দের ওপর পুলিশের নজর না পড়ার বোধ হয় একমাত্র কারণ ছিল—তখনকার পুলিসের এ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। বরং তা'দের চেহারা দেখে পুলিস্ বোধ হয় ভেবেছিল তা'রা নেহাৎ হাবাগোবা গেঁয়ে বেকুব। তা'দের দু'দিন নাওয়া হয়নি, খাওয়াও এক রকম না হওয়ার মধ্যে, জুতো ছিল না পায়, জামা-কাপড় বিশ্রী ময়লা, বহুদিন যাবৎ দাড়ী কামান, চুল ছাঁটা আর আঁচড়ান হয়নি; বিশেষতঃ দুজনেরই স্বাভাবিক চেহারাই ছিল বদ্‌খত্ রকমের। তা'র ওপর ভীষণ উদ্বেগ আর বিকট চিন্তায় তাদের মুখের ভাব এমনই বেয়াড়া হয়েছিল যে, তা'দের দ্বারা যে লাটের কোন রকমে অকল্যাণ সংঘটিত হ'তে পারে, এ কথা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেউ তখন মনে স্থান দিতে পারত না। সদ্য হত্যাকারীর চেহারার বিশেষত্ব সম্বন্ধে তখনকার সাধারণ পুলিস বোধ হয় ওয়াকিবহাল ছিল না। এই ঘটনার প্রায় দু'বছর পরে, সাব ইন্সপেক্টার নন্দলাল কিন্তু এই প্রফুল্লকেই চেহারার বিকৃতি দেখেই ঠিক ধ'রে ফেলেছিল। খাওয়া-দাওয়া, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি শারীরিক শক্তি সংরক্ষক ও স্ফূর্ত্তিবিধায়ক কাযগুলার অভাবে শরীর বিকৃত হ'লে যে সেই সঙ্গে মনও বিকৃত বা দুর্ব্বল হ'তে পারে, এ কথাটা বিপ্লবীদেরও জানা ছিল না।

যাই হোক, ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। প্রাণপণে সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে রিভলবার বাগিয়ে ধ'রতে গিয়ে তারা বুঝেছিল—যেন চালিত যন্ত্রবৎ ক'রে যাচ্ছে। গাড়ীখানার কোন্ দিকে এঞ্জিন

ছিল, তা' দেখ্‌তেই পায় নি। অবশেষে ভেঁা দিয়ে গাড়ীখানা তখন যে দিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে চলে গেল। তা'রা ত একেবারে হতভম্ব! অবাক্ হ'য়ে অনেকক্ষণ থাক্‌বার পরে দেখল, ষ্টেশনে একটিও পুলিস নেই, সব নিস্তব্ধ; অগত্যা তা'রা ষ্টেশনের দিকে ফিরে চল্‌ল। তখন তা'দের শরীর ও মনের ওপর প্রচণ্ড উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে। একটা দুর্দ্দমনীয় অবসাদ ক্রমে তা'দের আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছে। কোন গতিকে ষ্টেশনে এসে জিজ্ঞাসা ক'রে, যাই জেনেছিল, লাট হুগলী পুল পেরিয়ে ই, আই রেলওয়ে ধ'রে সোজা বম্বে রওয়ানা হ'য়েছেন, প্রফুল্ল অমনই ব'সে পড়ল। তা'র চোখমুখের অবস্থা দে'খে স্যাঙ্কো বুঝ্‌ল অবস্থা কাহিল। তা'র নিজেরও প্রায় সেই দশা। নিকটেই ছিল ফেরিওয়ালা, স্যাঙ্কো একটা সোডা নিয়ে তা'কে খানিকটা খাইয়ে দিয়েছিল, আর বাকীটা চোখে মুখে দিতে প্রফুল্ল একটু সুস্থ হ'ল। মিনিট কয়েক পরেই কল্‌কাতার গাড়ী এসে পড়ল। সেই গাড়ীতে কল্‌কাতা পৌঁছেই 'ক'-বাবুর কাছে গেল। তিনি নির্ব্বিকার ভাবে সমস্ত শুনে তা'দের শুধু বাড়ী যেতে বল্‌লেন।

আন্দাজ রাত্রি দশটার সময় বাড়ী ফিরে, আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে তা'রা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সদ্য হত্যাকারীর চুল যে খোঁচা খোঁচা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, চোখ কোটরে প্রবেশ করে, আর দৃষ্টি কি রকম ভীষণ হয়, নিজেদের চেহারা দেখে সে দিন তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিল।

যাই হোক, এখন থেকে পরবর্ত্তী প্রায় দু বছর যাবৎ এই ধরণের action অর্থাৎ লাট-হত্যার, আর "বিধবার ঘটি চুরির" বিস্তর honest attempt হয়েছিল। কিন্তু একটাও সফল হয়নি। কেন?

দেশকালপাত্রের অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কল্যাণ-অকল্যাণ জ্ঞান অর্থাৎ লোকমতেরও পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, তা' আমরা ভাবতে পারি না। বরং অনিবার্য্য কারণে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বে, যা' কিছু পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে, তা' হাজার বা শত বছর আগে যেমনটি ছিল, ভাল-মন্দ নির্ব্বিচারে ঠিক সেই রকমটি ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রায় সমস্ত মস্তিষ্ক-শক্তির অপব্যয় করছি। এই যে "বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার," ইহাই বিপ্লববাদের বা যে কোন জাতীয় উন্নতির অনতিক্রমণীয় অন্তরায়।

যে ধরণের ন্যায়যুদ্ধে মানুষ মানুষকে হত্যা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে রকম জিনিষটা এ দেশে বহুকাল যাবৎ একেবারে নেই বললে প্রায় অত্যুক্তি হ'বে না। তা'র ওপর আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও কেউ কখনও যুদ্ধে একটাও মানুষ বধ করেছে, অথবা খালি যুদ্ধ করেছে, এ কথা আমরা কেউ কখনও শুন্‌তে অভ্যস্ত নই। এমন কি, তা'র কোন রকম ধারণা করবার চেষ্টাও আমরা কখনও করিনি, অথবা তা'র কল্পনা করবার প্রবৃত্তিও আমাদের কখনও হয়নি। বিশেষ ক'রে হিন্দুদের মধ্যে।

তা' ছাড়া নারীর নিকট সম্মান বা আদর লাভের বাসনা পুরুষ হৃদয়ের স্বভাব। এটা সকল জাতির মধ্যে স্মরণাতীত কাল হ'তে এ যাবৎ পুরুষদিগকে যুদ্ধপ্রিয় করবার প্রধানতম প্রবর্ত্তক। পরন্তু সৈন্য বা যোদ্ধা যে, প্রকারান্তরে পেশাদার নরঘাতক, এ কথা অতি সত্য হ'লেও কোন দেশের লোক, এমন কি, স্ত্রীলোকরাও, এহেন ছোট বড় যোদ্ধামাত্রকেই যখন বীরের পূজা বা শ্রদ্ধা জানায়, তখন তা'রা যে নরহন্তা, সুতরাং, বীভৎস ও পাপী, তা' কিছুতেই মনে আন্‌তে পারে না। অথচ আমাদের দেশের স্ত্রীলোক ত দূরের

কথা, পুরুষদের মনেও খালি যুদ্ধের নামেই মৃত্যুর বিভীষিকা জেগে ওঠে—যেহেতু, আমরা আধ্যাত্মিক জীব। অবশ্য এ কথা তুনিয়ার অন্য লোক বিশ্বাস না করলেও নিত্য আমরা প্রত্যক্ষ কর্‌ছি যে, ভারতবাসী ভগবানের বিশেষ ইচ্ছায় আধ্যাত্মিকতার খাঁটি মাল-মসলায় গঠিত। সেই হেতু আমাদের সঙ্গে অন্য দেশের অনাধ্যাত্মিক মানুষের তুলনাই হ'তে পারে না। কাযেই মানুষ মারা যুদ্ধ কখনও আমাদের আধ্যাত্মিকতা-সম্মত ব'লে বিবেচিত হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটাও সকলে স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের অথবা অন্য যে কোন দেশের পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক যুগের সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন সংগ্রামে, যে যত বেশী নরহত্যা করতে পেরেছে, সে তত বড় যোদ্ধা, সেই হেতু সে তত বড় বীর, তত অধিক পূজ্য, তত পূর্ণ মানব-রূপী ভগবান্ বা অবতার, দেবতা, ঋষি, মহাপুরুষ, ধার্ম্মিক ইত্যাদি।

তা' হ'লেও কয়েক শতাব্দী ধ'রে অহিংসাবাদ এমনই আমাদের অস্থিমজ্জাগত হ'য়ে পড়েছে যে (কচিৎ পাঁঠা আর বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে মাছ ছাড়া) কোন খাদ্য প্রাণি হত্যা করতে দেখে, এমন কি, শুনেও আতঙ্কে শিউরে ওঠা হিন্দুদের ধার্ম্মিকতার একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণে পরিণত হয়েছে।

হঠাৎ বিনা উত্তেজনায় জ্যান্ত মানুষকে এই রকম অহিংস-আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার মধ্যে হত্যা করা, বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে যে কি রকম বিষম ব্যাপার, এ থেকে তা' সহজে অনুমেয়।

অবশ্য, আমরা এ কথা বলছি না যে, বাঙ্গালী আজকাল নরহত্যা-রূপ ঘৃণিত অপরাধ করে না। আমরা জানি, নরহত্যার অপরাধে দণ্ডিত হ'য়ে প্রতি বছর বিস্তর নরহন্তা ফাঁসিতে ঝুলে, জেলে ও দ্বীপান্তরে

যায়। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাংলা দেশ থেকে যা'রা উক্ত অপরাধে দণ্ডিত হয়, তা'দের মধ্যে অধিকাংশই "অভাগিনীর বক্ষে ছুরী হানে" অর্থাৎ নারীহন্তা। ভারতের অন্য কোন প্রদেশের দণ্ডিতদের মধ্যে, অনুপাতে এত নারীহন্তা দেখা যায় না। যাই হোক, ব্যক্তিগত স্বার্থ, আক্রোশ বা শত্রুতাজনিত সদ্য উদ্দীপ্ত প্রচণ্ড উত্তেজনাবশে নরহত্যা পৃথক্ কথা।

ফল কথা, পৃথিবীতে যত উল্লেখযোগ্য জাতি আছে, তা'র মধ্যে, বাঙ্গালীর মানবহিতের অথবা দেশহিতের জন্য যোদ্ধৃসুলভ মনোভাবের অভাব সব চেয়ে বেশী। আর এই অভাবই আমাদের ভুল-ভ্রান্তির কারণ।

কেউ বলতে পারেন, আমাদের স্যাঙ্কো আর প্রফুল্ল, মাত্র এই দু'জনের অবস্থা থেকে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নয়। তা' না-ও হ'তে পারে। কিন্তু এই গত বিশ কি বাইশ বছরের নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তা'দের মন, এ দেশের কারুর থেকে বেশী দুর্ব্বল ছিল না।

দেড় শত বছরে, যে ইংরেজ আমাদিগকে স্বরাজভোগের উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেনি ব'লে আমরা এত অনুযোগ করি, সেই ইংরেজ সরকারই বাঙ্গালী জাতিকে এই অতিবড় অভিসম্পাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য তবু অনেক চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠনের চেষ্টা কিছুদিন আগে বিশেষ ক'রে হ'য়েছিল; তা'র পর অনেক বার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সে চেষ্টা এখনও চলছে কেবল ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। যাই হোক, বাংলার কর্ত্তাদের কিন্তু সে দিকে খেয়াল নাই। কারণ জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হ'লে মানুষমাত্রেরই দেশ বা আত্মরক্ষার জন্য যে

সামর্থ্য অবশ্য থাকা চাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিশেষ ক'রে বাঙ্গালী জাতি একথা অতি তুচ্ছ মনে করে। তা'র বদলে অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিকশক্তির (Soul force) দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সাধন ক'রে মানব জাতিকে শক্তির এক অভূতপূর্ব্ব পন্থা দেখানই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে। কাযেই কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে সে লক্ষ্য সিদ্ধ হ'বে, এখন আমাদিগকে তারই প্রতীক্ষা করবার সামর্থ্য লাভের জন্তই সাধনায় রত থাকতে হ'বে—অন্ততঃ শত যুগ। * যে দেশে এরকম মনোভাব সেখানে বিপ্লববাদ প্রচার নিরর্থক।

যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় কিন্তু আমাদের মধ্যে এই মহৎ লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাই কুবুদ্ধির প্ররোচনায় মনে ক'রে ফেলেছিলাম যে, যে কোন জাতির ইতিহাসে, পুরাণে, ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বা রূপকথায় অন্যায়ের প্রতীকার বা অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বদেশ বা স্বার্থরক্ষা করবার যে একটামাত্র সনাতন শেষ উপায় নির্দ্ধারিত আছে, তা' হচ্ছে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ আমাদিগকে অগত্যা করতেই হ'বে ব'লে, তা'র প্রথম আয়োজন, যা' চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী অতি গোপনে অনুষ্ঠেয়—আজকালকার ভাষায় যাকে বলে গুপ্ত সমিতি—তা' কোন প্রকারে গ'ড়ে তুলতেই হ'বে। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উক্ত সমিতির কায চল্‌লে পাঁচ ছ বছরের মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। এর জন্ত বিদেশে গিয়ে বিপ্লববাদের কোন কিছু শেখা যে বিশেষ দরকার সে ধারণা আমাদের ত ছিলই না কর্ত্তাদেরও ছিল না। যুদ্ধের জন্য খালি হাতিয়ার গোপনে সরবরাহ করা, আর বোমা, গোলা, গুলী আদি তয়ের করতে বিদেশ থেকে শিখে আসা যে আবশ্যক, সেই কথাই আমাদের বোঝান হয়েছিল।

কিন্তু ঐ সময়ের প্রায় দু'বছর আগে থেকে একটা প্রবল দুরাশা আমার ঘাড়ে চেপেছিল যে, আমেরিকায় গিয়ে ইতালীর উদ্ধারকর্তা গ্যারিবাল্দীর মত অথবা তথাকথিত সুরেশ বিশ্বাসের * মত যুদ্ধবিদ্যাটা রীতিমত শিখে, ভারত স্বাধীন করবার বিলকুল তোড়জোড় অস্ত্রশস্ত্র সমেত, একদিন শুভ মহেন্দ্র যোগে, কেন্দ্রে বৃহস্পতিকে চাঁড়িয়ে, দেশে ফিরে এসে একদম রক্তগঙ্গা ছুটিয়ে দোব। অর্থাৎ কিনা আমার দুরাশার দৌড়টা ছিল, প্রবাসী ভারতবাসী দ্বারা গঠিত Indian Legion আর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ রণ-সম্ভারপূর্ণ একবহর রণতরীতে ভারতীয়া মহিলাদের দ্বারা কারুকার্য্য-খচিত স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে, অতর্কিতভাবে ঘোড়ামারা দ্বীপটা দখল ক'রেই, দমাদ্দম তোপের ওপর তোপ দেগে, ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করা। এই ফন্দিটা অবশ্য মনে মনেই ছিল। তখন কিন্তু ভারতের গ্যারিবাল্‌দী হবার সাধটা আমাদের মধ্যে অনেকেই মুখ ফুটে প্রকাশ ক'রেও বেশ তৃপ্তি লাভ করত।

কিন্তু ক্রমেই গুপ্ত সমিতির কার্য্যকলাপের মধ্যে থাকতে থাকতে নেতাদের স্বরূপ যতই হৃদয়ঙ্গম হ'তে লাগল, ততই তাঁ'দের ভারত স্বাধীন করবার মুরোদ সম্বন্ধে চোখ ফুটতে লাগল; আর সেই সঙ্গে আমারও বড় সাধের জাঁদরেলীর আশা, ঘুচে আস্‌ছিল। অবশেষে, এমন কি, গুপ্ত সমিতি গঠনেরও সামর্থ, ক'বাবুর কিংবা অন্য কোন নেতার ছিল কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ জন্মেছিল। তখন বেশ বুঝেছিলাম, এর জন্য বহুকাল যাবৎ দস্তুরমত হাতে কাযে শিক্ষা চাই। এ দেশে সে শিক্ষার সুযোগ জোটা অসম্ভব। এর বছরখানেক আগে অবধিও বিশ্বাস ছিল,

* অনেকের মতে সুরেশ বিশ্বাস কল্পিত ব্যক্তি।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে খুব পাকা রকমের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কায চলেছে। কিন্তু সে সব যে কেবল চালিয়াতি, তা' তখন বুঝে ফেলেছিলাম।

শোনা ছিল, রাসিয়াতে গুপ্তসমিতির অতি প্রকাণ্ড কারবার চল্‌ছে। আর তাদের শাখা-সমিতি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও আছে। কোন দেশের ভাষা নতুন ক'রে শি'খে, সে দেশে এই রকম সমিতি খুঁজে নিয়ে, তা'র সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব ব'লেই মনে হ'য়েছিল। তা'র পর ইংল্যাণ্ডে সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বাতুলতা হ'বে মনে ক'রে, আমেরিকা যাওয়াই স্থির ক'রেছিলাম। আর পূর্ব্ব হ'তেই আমেরিকার দিকে একটা টানও ছিল।

এক জন জুড়ীদার জুটেছিলেন। তিনি কোন নেতার অভিপ্রায়মত হাতিয়ার সংগ্রহ আর বোমা, বারুদ আদি প্রস্তুত করা শেখবার জন্য নাকি আমেরিকা যাচ্ছিলেন। দু'মাস আগে একসঙ্গেই যাবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি অনেকগুলি সাধারণ শিল্পশিক্ষার্থীর সঙ্গে যাচ্ছিলেন ব'লে, এবং হঠাৎ আমি সমিতির কোন বিশেষ কাযে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ায় তাঁ'র সঙ্গে যেতে পারিনি।

দু' একজন আত্মীয় বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে অর্থ-সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁ'রা জানতেন না যে, আমি কি রকম ভীষণ মতলবে যাচ্ছি। তাঁ'দের কেবল জানিয়েছিলাম, আমি কোন একটা শিল্প শিখতে যাচ্ছি! তাই তাঁ'রা ক্ষুন্ন হ'লেও তাঁ'দের স্নেহের দান দুটি কারণে সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হ'য়েছিলাম।

প্রথমতঃ, আমি একদিন পুলিসের হাতে বাঁধা পড়ব, আর সেই সঙ্গে আমার সম্ভ্রান্ত সাহায্যকারীরাও যে সমানে লাঞ্ছিত

হবেন, তা' বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। পরে কাযেও তাই হ'য়েছিল অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও কোন নির্লিপ্ত ভদ্র লোককে অকারণ যথেষ্ট বেগ পেতে হ'য়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ সময় দেশের কাযের নাম ক'রে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য চাঁদা সংগ্রহের বিস্তর "ফাণ্ড" বা তহবিলের সৃষ্টি হ'য়েছিল। ঐ সকল ফাণ্ডের নাম ক'রে, যে সে, যেখানে সেখানে, চাঁদা আদায়ের ব্যবসা খুলেছিল। প্রথমে আমরাও খুব আগ্রহের সহিত দেশের প্রভূত মঙ্গলের আশা ক'রে সাধ্যমত চাঁদা আদায়ও করেছি, দিয়েওছি। কিন্তু কিছুদিন পরে অনেক স্থলে সেই সংগৃহীত অর্থের অত্যন্ত অপব্যয় প্রত্যক্ষ ক'রে স্থির ক'রেছিলাম, অর্থের সদ্ব্যয় সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় না হ'য়ে, কখনও স্বদেশী কাযের নামে কাউকে টাকা দোবও না, আর কারুর কাছ থেকে নোবও না। অধিকন্তু এও স্থির ক'রেছিলাম যে, নিজের সম্পত্তি যা কিছু, আর তার পর সাধ্যমত চেষ্টার দ্বারা নিজের রোজগারের যা' কিছু, তা' আগে দিয়েও যদি দেশের কোন কাযে আরও টাকার অভাব দেখি এবং কারও প্রদত্ত টাকা, সে অভাব পূরণে নিশ্চিত ব্যয় হ'বে, আর দাতাকে সে জন্য বিপন্ন হ'তে হবে না, এ বিষয়ে যদি নিশ্চিত হ'তে পারি, তবেই অন্যের প্রদত্ত অর্থ-সাহায্য নোব, নচেৎ নয়।

যাই হোক, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ফ্রান্সের মার্শাই বন্দর পর্য্যন্ত টিকিট কিনে ফেল্‌লাম। কলম্বো থেকে জাহাজে য়ুরোপ হ'য়ে আমেরিকা যাবার সংকল্প ছিল। তখন পাশপোর্টের হাঙ্গামা ছিল না।

সেই সময় ইংল্যাণ্ডের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেসনের

বিখ্যাত নেতা এবং ম্যাজিনীর বন্ধু মিঃ এচ, এম, হাইণ্ডম্যানের সম্পাদিত "জাস্‌টীস" নামক পত্রিকা, স্বনামখ্যাত বিপ্লবপন্থী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাজীকৃষ্ণবর্ম্মা এম্‌, এ, মহাশয়ের "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজী" এবং আমেরিকার "গেলিক আমেরিকা" নামক পত্রিকার মিঃ ফ্রিম্যানের সহিত আমাদের "যুগান্তরের" আদান প্রদান চল্‌ত। "যুগান্তরের" আদর্শের প্রতি ঐ পত্রিকাত্রয়ের সম্পাদকগণের নাকি প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল। এও তখন শুনেছিলাম, উক্ত পণ্ডিতজী ছাড়া অন্য দু'জন মহাপুরুষের না কি ভারতকে একেবারে স্বাধীন করে দেবার সাধু ইচ্ছাও ছিল। এর এক বছর পরে কিন্তু মিঃ হাইণ্ডম্যানকে বল্‌তে নিজ কানে শুনেছি যে, ইংল্যাণ্ডের অধীনে ভারত শুধু স্বায়ত্ত-শাসন পাবারই আশা করতে পারে।

যাই হোক, আশা করেছিলাম, 'যুগান্তরের' নাম ক'রে গেলে এঁদের আন্তরিক সাহায্য নিশ্চয় পাব, আর তা হ'লেই ভারত উদ্ধারের সমস্ত তদ্বির ক'রে ফেলতে পারব। তাই এঁদের নামে তিনখানি পরিচয়-পত্র পেয়ে বড়ই ধন্য হ'য়ে গেছলাম।

তা ছাড়া—কলম্বো যাবার পথে কটক, মাদ্রাজ, কইম্‌বাটুর ও তুতিকোরিনে নাকি এক একটা বিপ্লব-কেন্দ্র ছিল ব'লে কর্ত্তারা জাঁক করতেন। ঐ সকল কেন্দ্রের নেতাদের নামে এবং আরও জনকয়েকের নামে পরিচয় পত্র সংগ্রহ ক'রে তুতিকোরিন পর্য্যন্ত রেলওয়ে টিকেট কিনে ফেললাম।

বিলেতে যাচ্ছি ব'লে আমার গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবদের কাছে আদর কাড়াবার তীব্র বাসনাকে অতি কষ্টে জলাঞ্জলি দিয়ে, কলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুর সমিতির দু'এক জন বিশেষ সভ্যের কাছে বিদায় নিয়ে মামার বাড়ীতে দু'দিন ছিলাম। হঠাৎ বিলেত

যাবার একটা মিথ্যা কারণ দেখিয়ে মনে মনে স্ত্রীপুত্র-কন্যা আদি স্বজনের নিকট একরকম চিরবিদায় নিতে বাধ্য হ'য়েছিলাম।

কটকে দু'দিন যাবৎ অনেক চেষ্টা ক'রে গুপ্ত সমিতির কিছুই খুঁজে পেলাম না। সেখানে যাঁর নামে পরিচয়পত্র ছিল, তাঁর পরিচয়ে জেনেছিলাম, তখনকার চরমপন্থী বলতে যা বোঝায়, তিনি তাই ছিলেন। তাঁর মতাবলম্বী কয়েকটি ছাত্র ও অন্য ভদ্র-লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন "যুগা-ন্তরের" গ্রাহক ছিলেন, আর আগ্রহ সহকারে তা পড়্‌তেন। সেখানকার কলেজের কনকত উদার প্রকৃতি ছাত্রের আতিথেয়তায় বিশেষ বাধিত হ'য়েছিলাম। বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠন করবার উপদেশ আর স্বদেশপ্রীতির বচন দিয়ে আতিথ্যের ঋণ শোধ দিয়েছিলাম।

তা'র পরে মাদ্রাজে আর তুতিকোরিনে এক এক দিন ছিলাম। উল্লিখিত পরিচয় পত্রের ঠিকানা অনুযায়ী কোন লোকের সন্ধান পেলাম না। তুতিকোরিন হ'তে জাহাজে ক'রে কলম্বো পৌছে চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করবার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বোধ হয় ১৩ই আগষ্ট য়ুরোপে রওনা হ'য়েছিলাম।

য়ুরোপে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, তার অনেক বিষয় মনে হয়—আপাততঃ অপ্রকাশ থাকাই সমীচীন। অতঃপর সেখানকার ব্যাপার সংক্ষেপে সারবার চেষ্টা করব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

য়ুরোপের বৈপ্লবিক দলে যোগদান

স্বদেশ-প্রেমের লীলাভূমি ফ্রান্সের মার্শাই বন্দরে পৌঁছে, সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার প্রতীক, যা' দেখে এক দিন ভারতীয় দেশাত্মবোধের জন্মদাতা রাজা রামমোহন আনন্দে বিহ্বল হ'য়েছিলেন, সেই ত্রিবর্ণ পতাকাকে তখনকার মনোভাব অনুযায়ী শ্রদ্ধাবনত মস্তকে নমস্কার কর্‌লাম। সেই বন্দরে চার পাঁচ দিন অপেক্ষা কর্‌তে হ'য়েছিল। এক ফরাসী ভদ্রলোককে বিনা পারিশ্রমিকে "গাইড"রূপে পেয়েছিলাম। সে কোন রকমে ইংরেজীতে কথা কইতে পার্‌ত। আমার মত কালা আদমীর ওপর তার এত কৃপার কিন্তু কোন কুমৎলব শেষতক্‌ও ধর্‌তে পারি নি।

এই ভদ্র লোকটির সাহায্যে অনেক কিছু জেনেছিলাম এবং দেখেছিলাম; তার মধ্যে "সাতুদ'ইফ" (Chateau d'if") নামক একটা পুরোনো কেল্লার বিষয় এখানে কিছু লিখলে, নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না ব'লে মনে করি। সে কা'লে ফরাসী জাতির রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধী বা বিপ্লবপন্থীরা ধরা পড়লে, তাদের যে ভীষণ পরিণাম হ'ত, তার সঙ্গে আমাদের দেশের সেই অপরাধে ধৃত বন্দীদের অবস্থার তুলনাটা বোধ হয় কাযে লাগতেও পারে।

এই "ইফ" নামক প্রস্তরময় ক্ষুদ্র দ্বীপের ভগ্ন দুর্গটা বহুকাল যাবৎ ফরাসী রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধীদের জন্য কারাগাররূপে ব্যবহৃত হ'ত। বর্ত্তমানে দর্শনী বা fee নিয়ে সাধারণকে তা দেখান হয়; বিস্তর লোক প্রতিদিন দেখতেও যায়। প্রবেশের দ্বারে টিকিটের সঙ্গে

একটুখানি মোমবাতী দেয়। তা জেলে মেঝের নীচে, পাথর কেটে কেটে বন্দীদের থাকবার জন্যে যে কি রকম ভীষণ অন্ধকার গুহা আর সুড়ঙ্গ তোয়ের করা হ'য়েছিল, তাই দেখতে হয়। স্বনামধন্য বিশেষ বিশেষ বন্দীরা যে সকল গুহাতে ছিলেন, তাতে তাঁদের বিবরণ লিখিত আছে।

সে রকম চির-অন্ধকারময় ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ক্ষুদ্র গর্ত্তে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও অধিককাল, এই আমাদেরই মত জীব, কি ক'রে যে জ্যান্ত থাকতে পেরেছিল, তা ভেবে তখন একেবারে অবাক্ হয়ে গেছলাম। এ ছাড়া তাদের ভাগ্যে আরও কত উৎকট রকমের লাঞ্ছনা যে জুটেছিল, তা' সহজেই অনুমেয়। এর পরে অবশ্য মানুষের ওপর মানুষ যে কি রকম ভীষণ নির্য্যাতন করতে পেরেছিল, তার আরও বিকট নিদর্শন চোখে পড়েছিল পারিস, রোম ও নেপ্‌ল্‌সে।

এক দিন উক্ত "ইফ"এর চাইতে অনেক অধিক বিকটদর্শন—'সকোত্রা' দ্বীপে আমাদের জন্যও যে এই রকমই গুহাবাসের ব্যবস্থা হবে, এ আশঙ্কা তখন মনে জেগে ওঠাতে, আতঙ্কে আমার জ্ঞানলোপ হবার যোগাড় হ'য়েছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে জাহাজে যাবার সময় দেখেছিলাম,—এডেনের দক্ষিণে কোন রকম উদ্ভিদের লেশমাত্র নেই, কেমন যেন দাঁত-বেরকরা, কেবল কাল পোড়া পাথরের প্রকাণ্ড দ্বীপটা, জ্বলন্ত উনুনের ওপর তপ্ত খোলার মত রোদে দাউ দাউ করছে। তখুনি মনে হয়েছিল, যদি ধরা পড়ি, আর ফাঁসীটা যদি ফস্‌কেই যায়, তবে ঐ সকোত্রাতে অথবা আন্দামান দ্বীপের ঐ রকম কোন স্থানে নিশ্চিত নির্ব্বাসিত হ'তে হবে। চির-বসন্ত-বিরাজিত চির-শ্যামল বনরাজি-শোভিত আনন্দ-বন নামের অপভ্রংশ আন্দামান সম্বন্ধে তখন আমার এই রকম একটা ভীষণ ধারণাই ছিল।

আমার প্রথম ফরাসী বন্ধুর নিকট সে কালের ফরাসী রাষ্ট্রনৈতিক বন্দীদের হৃদয়-বিদারক কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম। এও তার কাছে শুনেছিলাম, ঐ রকম বন্দীদের স্মৃতিকে সে দেশের সাধারণ লোক ঘৃণার বদলে ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

যাই হোক, এখন মনে হচ্ছে, এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বন্দীদের সৌভাগ্যক্রমে, এ রকম নৃশংসভাবে কারাভোগের সম্ভাবনা এখন আর নেই। যে সময়ের কথা লিখছি, তখন বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অপরাধে ধৃত বিপ্লবপন্থীর ভাগ্যে, ঠিক কি রকম কারাভোগ জুটতে পারে, তার কোন রকম আন্দাজ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কালে হিন্দু-মুসলমান নরপতিদের আমলে এর চেয়েও নাকি আরও অধিকতর অমানুষিক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ কালে য়ুরোপের একটি সভ্য জাতি যে রকম দণ্ডের ব্যবস্থা কিছু দিন আগেও স্বজাতির ওপর অবারিতভাবে সংঘটিত হ'তে দিয়েছিল, সে রকম, চাই কি ততোধিক ব্যবস্থা যে য়ুরোপের আর এক সভ্য জাতি অর্থাৎ কি না ইংরেজ জাতি সর্ব্বতোভাবে অধীনস্থ কালা আদ্‌মীদের প্রতি করবে না, এ কথা কিছুতেই তখন বিশ্বাস করবার সাধ্য হয় নি।

এ রকম নিদারুণ দণ্ড কি ক'রে সহ্য করা যেতে পারে, তখন চিন্তা করতে গিয়ে ক্ষেপে যাবার যোগাড় হয়েছিলাম। তাই বিপ্লবরূপ আপদটাকে ইস্তফা দিয়ে, চিত্রকলা বা অন্য কোন শিল্প শেখবার খেয়ালও প্রাণে দেখা দিয়েছিল। দিন কয়েক এই দোটানা চিন্তার পর পূর্ব্বোক্ত কারাসঙ্কটের হাত হ'তে অব্যাহতিলাভের আর একটা খেয়ালও মাথায় এসেছিল। সেটা হচ্ছে আত্মহত্যা। কিন্তু প্রথমে জেলের মধ্যে ঢুকেই আত্মহত্যার তোড়-জোড় মেলাও যে মুস্কিল, তা তখন

জানতাম না। আন্দামানে নির্ব্বাসিত হবার প্রায় বছরখানেক পরে, যাই হোক্, লণ্ডনের "উইমেন সাফ্রেজেট্‌স"রা (অর্থাৎ পার্লামেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচনে নারীদের ভোট দেবার অধিকারপ্রাপ্তির জন্য আন্দোলন-কারিণী মহিলারা) একটা ভারী সহজ উপায় বাৎলে দিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে প্রায়োপবেশন অর্থাৎ hunger strike (যার মানে, না খেয়ে জেলখানাকে আত্মহত্যার ভয় দেখান)।

যাক্, তার পর গণতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ড হয়ে পারিসে গেলাম। দেশ ছেড়ে প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পথে একটি স্বদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। প্রথমে তিনি আমার জন্য অনেক কিছু করবেন ব'লে আমায় নেহাৎ বাধিত ক'রে ফেলেছিলেন। আমিও গোঁড়া ভক্তটির মত, তাঁর সযত্ন-প্রদত্ত এককাঁড়ি উপদেশ একবারে হজম ক'রে ফেলেছিলাম। শক্তি-সাধনার মন্ত্র (মনে নেই) দিয়ে, "হনুমান" আদি পঞ্চ প্রকার আসন যথাশাস্ত্র শুদ্ধভাবে অভ্যাস করিয়ে ছেড়েছিলেন। বিদায়ের কালে প্রত্যাশিত অনেক কিছু আনুকূল্যের বদলে পারিসের এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বরাবর একখানা পরিচয়পত্রমাত্র পেয়েছিলাম।

পারিসে ঐ ভদ্রলোকের বাড়ী উঠে তাঁর আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁকে আমার বিদেশগমনের আসল মৎলব সম্বন্ধে আঁচ দিলাম এবং পারিসে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি না জানতে চাইলাম। দিন কয়েক অনেক গবেষণার পর তিনি যা বলেছিলেন, তার মর্ম্ম যতখানি মনে পড়ছে, তা এই :—আমার missionএর ওপর তাঁর নিজের না কি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যদিচ তাঁদের ভারত উদ্ধারের অবলম্বিত প্রথা ছিল, না কি, সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমতঃ, যুদ্ধবিদ্যা শেখার সুযোগ, তাঁর বিবেচনায়, ভারতবাসীর পক্ষে কোথাও মেলা

প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, এনার্কিষ্টদের দলে ঢুকে পড়তে পারলে বৈপ্লবিক দল সংগঠনপ্রণালী, বিপ্লবতত্ত্ব, বোমা গুলীগোলা আদি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতপ্রণালী শেখার, আর যুদ্ধের যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে চালান দেবার সুবিধা না কি অন্য স্থান অপেক্ষা পারিসে বেশী হলেও হ'তে পারে। তিনি আশা দিলেন, দু'তিন মাস থাকলেই ফরাসী ভাষা নিশ্চয় আয়ত্ত হ'তে পারে। তখন আমাকেই সব কিছু খুঁজে পেতে নিতে হবে। তাঁরা ও সব কিছু পারবেন না। ইত্যাদি।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার য়ুরোপযাত্রার দুতিন মাস আগে এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা গেছলেন। এই ক মাসে, এ ব্যাপারের তিনি সেখানে কি রকম সুবিধা মনে কচ্ছেন, আমায় জানাবার জন্য তাঁকে লিখেছিলাম। তাঁর উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত পারিসে থাকাই স্থির করলাম।

কয়েক দিন পরে নিউইয়র্ক থেকে তিনি আমার চিঠির লম্বা-চওড়া উত্তর দিলেন। আমেরিকায় তখন যে সকল ভারতবাসী ছিলেন, তাঁদের কারুরই ভারত উদ্ধারকল্পে গুপ্ত সমিতির খেয়াল না কি ছিল না। অন্য দেশীয়দের দ্বারা গঠিত বৈপ্লবিক দলে ঢোকবার আশাও সেখানে নেই। কারণ, সেখানে তিনি তাঁর কালো চামড়া নিয়ে বড়ই বেগোছে ঠেকেছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন, পারিসে কালো চামড়া সাদা করবার কোন ব্যবস্থা যদি থাকে, তবে তিনি পারিসে চ'লে আসবেন।

সুতরাং আমেরিকার আশা ছেড়ে দিয়ে পারিসে মাস কয়েক থেকে, একবার চেষ্টা ক'রে দেখবার সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেললাম।

পারিসে তখন প্রায় পঁচিশ কি ছাব্বিশ জন ভারতবাসী ছিলেন। তার মধ্যে মাত্র দুজন পাঞ্জাব প্রদেশের। বাকী সকলেই

বম্বে প্রেসিডেন্সির ব্যবসায়ী। অনেকে সপরিবারে থেকে ভারতীয় ছুতমার্গের সনাতন কায়দা-কানুন বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করতেন।

এঁদের মধ্যে কয়েক জন মিলে "পারিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটী" নামক একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। সপ্তাহে প্রায় একবার যে অধিবেশন হ'ত, তাতে প্রবাসী ভারত-মহিলারাও যোগ দিতেন। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—ভারতের হিতসাধন।

স্বদেশপ্রীতি ব'লে জিনিষটার সেখানে মানব-মনের ওপর এমনই প্রভাব যে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করবার, অন্ততঃ ভাণ যে না করে, তাকে তাচ্ছিল্যের ভাগী হ'তে হয়। উক্ত সমিতির সভ্যদের মধ্যে তিন চার জন ছাড়া বাকী সকলে বোধ হয় ঐ কারণে কখন কখন ঐ সমিতিতে যোগ দিতেন। দেশের জন্য যে কজনের সত্যিকার একটু টান ছিল, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত এস, আর, রাণা, বি, এ, ব্যারিষ্টার সাহেব এক জন। ইনি ইংল্যাণ্ডে ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে পারিসে মোতি ও অন্যান্য জহরতের ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়েছিলেন। য়ুরোপে থেকে রাষ্ট্রনীতি শেখবার জন্য অনেক শিক্ষার্থীকে ইনি বৃত্তি দিতেন।

এঁদের সঙ্গে লণ্ডনের ভারতীয় সমিতির যোগ ছিল। ঐ সমিতির কর্ত্তা ছিলেন গুজরাতবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মা এম, এ। পূর্ব্বে ইনি কোন কোন করদ রাজ্যে মন্ত্রী ছিলেন। চাপেকার ভ্রাতাদের দ্বারা বম্বে সহরে ডাঃ র‍্যাণ্ডের হত্যার পরে, অনুমান ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ ক'রে ইংল্যাণ্ডে যান। বোধ হয়, ওখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, উপাধি লাভ ক'রে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এঁর পাণ্ডিত্যের সুনাম ছিল ব'লে শুনেছিলাম।

প্রায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইবেল পড়ানর বিরুদ্ধে এক তুমুল আন্দোলন সুরু হয়েছিল। এই উপলক্ষে প্রতিবাদস্বরূপ ট্যাক্‌স দেওয়া বন্ধ এবং সে জন্য সম্পত্তি ক্রোক নীলাম আদি হ'লে, নির্ব্বিরোধ বা নিষ্ক্রিয়ভাব অবলম্বন কর্‌বার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থাকে "passive resistance আন্দোলন" নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

এই পন্থা আগে না কি কাউণ্ট টলষ্টয় প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এ ছাড়া সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বৃটিশরাজ দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালেও ঐ রকম বোষ্টমী আন্দোলন ঘটেছিল। তা "non-resistance movement" নামে অভিহিত হয়েছিল।

যাই হোক, ইংরেজের কবল থেকে ভারত উদ্ধারের সহজসাধ্য পন্থারূপে "প্যাসিভ রেজিস্‌ট্যান্‌স" আন্দোলনের ব্যবস্থা, এই প্রকারে প্রথমে বোধ হয় এসেছিল পণ্ডিতজীর মাথায়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "হোমরুল লিগ" নামে একটি লিগ গঠন ও তার মুখপত্রস্বরূপ 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজী' নামক এক ছোট্ট খবরের কাগজ বের করেন। মোটামুটি তাঁদের পলিসিটা এই ছিল যে, বৃটিশরাজের অধীন "হোমরুলই" ভারতবাসীর পক্ষে আদর্শ শাসনপ্রণালী। আইন-সঙ্গত আন্দোলন অর্থাৎ আবেদন-নিবেদন আদি মামুলী কংগ্রেসী পন্থায়, ইংরেজের হাত থেকে ভারতবাসীর জন্য সুবিধামত কোন অধিকার আদায় করা যে অসম্ভব, তা কংগ্রেসের বিশ বছরের চেষ্টাতে প্রমাণিত হয়েছে। তার পর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কিছু আদায় করাও ভারতবাসীর পক্ষে আরও অসম্ভব। তাই পণ্ডিতজী বোধ হয়, অনায়াসলভ্য সোজা উপায়ের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন। হেন কালে বিলেতে পূর্ব্বোক্ত প্যাসিভ রেজিস-

ট্যান্স্ সুরু হ'ল; আর অমনই পণ্ডিতজী, অকূল পাথারে উপায় স্বরূপ, ভাসমান একগাছি তৃণ অবলম্বনের মত, ভারত উদ্ধারের জন্য উক্ত প্রকার আন্দোলনকে প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভারতে বিনামূল্যে প্রেরিত তাঁর "ইণ্ডিয়ান সোসিয়ালজীর" মারফৎ ইংরেজের কাছ থেকে ভারতের "হোমরুল" আদায়ের প্রকৃষ্ট পন্থাস্বরূপ "প্যাসিভ্ রেজিস্ট্যান্সের" বাণী বিলোতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর এই বাণীর প্রসাদাৎ যে ভারতে—বিশেষতঃ বাংলা দেশে তৎকালীন স্বদেশী (কার্য্যতঃ যার মানে না কি "প্যাসিভ্ রেজিস্ট্যান্স") আন্দোলন সম্ভব হয়েছে, তা ব'লে পণ্ডিতজী বেশ তৃপ্তি অনুভব করতেন।

তাঁর "প্যাসিভ্ রেজিস্ট্যান্সের" স্বরূপটা দু'এক কথায় একটু প্রকাশ ক'রে বলি। য়ূরোপে গিয়ে রাষ্ট্রনীতি শেখবার জন্য প্রতি বছর কয়েক জন ভারতীয় যুবককে তিনি তিন বছরকাল স্থায়ী মোটা বৃত্তি দিতেন। শিক্ষা শেষ হ'লে ভারতে এসে তাঁর এই আদর্শ প্রচার ক'রে, ক্রমে সমস্ত দেশকে তারা এমনভাবে প্রস্তুত করবে যে, এক নির্দ্দিষ্ট সু-প্রভাতে সমস্ত ভারতময় বিলাত-জাত দ্রব্যবর্জ্জন, রেল, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ইংরেজ সরকারের আর ইংরেজ বণিকদের যে কোন আফিস, আদালত, সৈন্য-বিভাগ, পুলিশ-বিভাগ ইত্যাদির দেশীয় কর্ম্মচারী, এমন কি, সাহেবদের খানসামা বাবুর্চি পর্য্যন্ত কায বন্ধ ক'রে দেবে, অর্থাৎ কি না সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গুজরাতী হরতাল সুরু ক'রে দেবে। অধিকন্তু রেল-লাইন, টেলিগ্রাফের তার আদিও কেউ উড়িয়ে দেবে। তা হলেই ইংরেজ সরকার এমনই কাবু হয়ে যাবে যে, ভারতবাসীকে "হোমরুল" না দিয়ে আর বাঁচবার উপায় থাকবে না।

ঠিক ঐ সময় কলকাতা কিংবা রাণীগঞ্জে মেসার্স বার্ণ কোম্পানীর কারখানার এবং ই, আই, রেলওয়ে ষ্টেশনের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা যে ধর্ম্মঘট করেছিল, তা না কি পণ্ডিতজীর উক্ত বাণীরই প্রভাবে। তিনি এই ঘটনাকে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী কার্য্যসিদ্ধির নিশ্চয়াত্মক পূর্ব্বলক্ষণ বলেই ধ'রে নিয়েছিলেন। তিনি যে রকম কঞ্জুস ছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁর উদ্ভাবিত পন্থা অনুযায়ী ভারতীয় "হোমরুল"-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকলে তিনি কখনও বছর বছর এত টাকা বৃত্তি দিতে পারতেন না। এ বিশ্বাস যেমনই হোক, ভারতের অন্যতম নেতাদের মত অনর্থক ত্যাগের চটক না দেখিয়ে, চাঁদার খাতার ওপর খাতা না খুলে, খালি বচনে চাঁদ হাতে দেবার প্রবঞ্চনা না ক'রে নিজের আদর্শকে কাযে পরিণত করবার জন্য, নিজের অর্জ্জিত অর্থ যে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন, স্বদেশ-প্রীতির এ বড় কম আদর্শ নয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর প্রদত্ত বৃত্তিভোগী বোধ হয় একজনও, আমরা যতদূর জানি, তাঁর আশা একটুও পূর্ণ করেন নি। বরং বেশীর ভাগ বৃত্তিভোগীরা শেষে তাঁর প্রতিকূলাচরণই করেছিলেন।

যাই হোক, এ হেন নেতার দক্ষিণ হস্তরূপ এক জন প্রধান কর্ম্মী উপনেতা ছিলেন, বম্বে প্রদেশের নাসিক সহরনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকার। ইনি বম্বে থেকে বি, এ, পাশ ক'রে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য ঐ (১৯০৬) খৃষ্টাব্দের বোধ হয় জুন মাসে বিলেত গেছলেন। পূর্ব্বোক্ত রাণা সাহেবের বৃত্তিভোগীদের মধ্যে বোধ হয় ইনিও এক জন।

লণ্ডনে উক্ত পণ্ডিতজীর কয়েকটা নিজস্ব বাড়ী ছিল। তার মধ্যে

"হাইগেটের" বাড়ীতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কম খরচে থাকবার জন্য তিনি একটা হোটেল খুলেছিলেন। এই হোটেলের নাম ছিল "ইণ্ডিয়া হাউস।" সাভারকার এই হোটেলেই থাকৃতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ কি তেইশ বছর।

বিনায়কের দাদা শ্রীযুক্ত গণেশ দামোদর সাভারকার এই সময়ের চার পাঁচ বছরের আগে ঢাকার অনুশীলন সমিতির ধাঁচে "মিত্রমেলা" নামক একটি সমিতি নাসিকে স্থাপন করেন। তার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল, যুবকদের শারীরিক শক্তির অনুশীলন অর্থাৎ কুস্তী, লাঠিখেলা ইত্যাদি। আর গুপ্ত উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, সময় হ'লে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবার মত মনোভাব, হিন্দুদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। দেশে থাকতে বিনায়কেরও এই মেলার সঙ্গে যোগ ছিল।

"গণপতি উৎসব", "শিবাজী উৎসব" আদিও এই মেলার অঙ্গ ছিল। এতে ক'রে সহজে অনুমেয়, অহিন্দু এবং ইংরেজবিদ্বেষ মারহাট্টিদের মধ্যে জাগাবার চেষ্টা হ'ত।

বিনায়কের বিলেত যাবার মাস কতক আগে "মহাত্মা শ্রী অগম্য গুরু পরমহংস" নামক এক জন পরিব্রাজক বিনায়কের নেতৃত্বে পুনা সহরে এক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির একমাত্র প্রধান কায ছিল না কি চাঁদা আদায় করা।* অবিশ্যি অন্য কায বোধ হয় "পরে বক্তব্য" ছিল।

যাই হোক, এ থেকে বোঝা যায়, বিনায়ক বিলেত যাবার আগেই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে নেতৃত্বের তালিম পেয়েছিলেন। তাই লণ্ডনে গিয়েই গুপ্তসমিতি গঠন করতে উঠে প'ড়ে লাগলেন। এইটেই বোধ হয় ভারতের বাইরে প্রথম ভারতীয় বৈপ্লবিক গুপ্ত

* রাউলাট কমিশন রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

সমিতি। বাংলায় গুপ্ত সমিতির সুরুতে যেমন ঘটেছিল, এঁদেরও তেমনই প্রধান কায ছিল চাঁদা আদায় করা, সভ্যসংখ্যা বাড়ান, ইংরেজ সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার করা, আর সেই উদ্দেশ্যে প্যামপ্লেট্ ছেপে ভারতের নানা স্থানে পাঠান।

সুপুরুষ বল্‌তে যা বোঝায়, ইনি তাই ছিলেন। মুখের ভাবটি খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। এই মুখের একটা এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, প্রথম দৃষ্টিতে লোককে আপন জন ক'রে ফেলতে পারতেন। দু' চার কথায় লোকের মনোরঞ্জন করবার বিদ্যাও তাঁর আয়ত্ত ছিল। আমাদের বারীনের মত, মুখে যা আসে, তাই ব'লে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভক্ত ক'রে নিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। "ইণ্ডিয়া হাউসে" আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনেও তিনি তাঁর ক্ষমতার পরিচালনা ক'রেছিলেন। দু'চার কথার পরেই আমায় মন্ত্র পড়িয়ে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ইতি মধ্যে তাঁর দু'এক জন বন্ধু তাঁকে যে B, B, (big bluff) উপাধি দিয়েছিলেন, তা আমি জান্‌তাম। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছিলাম কি না মনে নেই, কিন্তু তথাপি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম।

বিনায়ক যদিও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে পণ্ডিতজীর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন, তথাপি পণ্ডিতজী অপেক্ষা এঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত অপেক্ষাকৃত অনেক গরম ছিল ব'লে তখন মনে করতাম। পণ্ডিতজীর মতামত পূর্ব্বে কিছু উল্লেখ করেছি।

বিনায়কের ঠিক যে কি মত ছিল, তা বলা দুরূহ। কারণ, তিনি লোক বুঝে, যে যেমন, তার কাছে তেমন ধরণের মত প্রকাশ করতেন। য়ুরোপে থাকার সময়ে যা' জানতে পেরেছিলাম, আর তাঁর হিন্দুভাবাপন্ন এক জন মুসলমান ভক্তের সঙ্গে পারিসে

প্রায় আট নয় মাস একত্র থাকবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল; সেই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোকের কাছে যা শুনেছিলাম, তার যতটুকু এখন মনে পড়ছে, মোটামুটি তা এই যে :—"ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগাতে পারলে, নানা ঘটনা-চক্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'তে সুরু ক'রে ক্রমে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের মত দ্বিতীয় বিদ্রোহের উদ্ভব হবে। আজকালের উচ্চশিক্ষিত (অর্থাৎ বোধ হয় বিলেত-ফেরত) নেতাদের মত বিচক্ষণ নেতা ছিল না বলেই ৫৭র চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছিল। এখন কিন্তু সে রকম নেতার অভাব একেবারে নেই। তখন ভারতের সর্ব্বত্র বৈপ্লবিক ভাব প্রচারের চেষ্টা হয় নি; এখন সমস্ত ভারত গুপ্ত সমিতিতে ছেয়ে ফেল্‌তে হবে। এই সমিতিগুলির প্রধান কায হবে, নতুন নতুন বৈপ্লবিক সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রে এবং অন্য নানা উপায়ে আপামর জনসাধারণকে বিদ্রোহের ভাবে মোরিয়া ক'রে তোলা।

"তখনকার বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান একযোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল; এখন যে সকল মুসলমান, হিন্দুর সঙ্গে একযোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে অথবা হিন্দুকে সাহায্য করবে, অথচ হিন্দুর ধর্ম্ম মেনে নেবে, তারা নব অর্জ্জিত স্বাধীনতার ভাগ পাবে, নচেৎ ইংরেজের মত শত্রু ব'লে পরিগণিত হবে। এইরূপে আবার ভারত হিন্দুর দেশে পরিণত হ'লে আমাদের ভারতীয় রাজাদের মধ্যে যে বিশেষ ক'রে এই ভারতীয় স্বাধীনতা-সমরে সাহায্য করবে, সে, সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ইমানুয়েল যেমন সমগ্র ইতালীর রাজা হয়েছিলেন, তেমনই ভারতে একচ্ছত্র সম্রাট হবে। অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশগুলি তাদের সুবিধামত ঐ সম্রাটের অধীন গণতান্ত্রিক প্রদেশ (Republican States) অথবা আপন আপন প্রাদেশিক রাজার

অধীন রাজ্যে (Monarchical States) পরিণত হয়ে মজা লুটবে। দুনিয়ার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হ'লে যতদূর সম্ভব হয়, ততখানি সংস্কার ক'রে, সনাতন আর্য্যসভ্যতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সভ্যতার (বোধ হয় মনুসংহিতার মোতাবেক) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অবিশ্যি জাতি (Caste) ভেদ থাকবে না ; কিন্তু চতুর্ব্বর্ণ থাকবে। ব্রাহ্মণই থাকবে দেশের শাসনদণ্ডের শিরোমণি। অন্যান্য বর্ণগুলিও যথাবিধি আপন আপন কায করতে থাকবে। উজ্জয়িনী হবে রাজধানী, ভাষা হিন্দী, আর অক্ষর হবে নাগরী।"

আজকালকার অতি বড় নেতাদের পরিকল্পিত ভারত উদ্ধারের প্ল্যান অপেক্ষা এটা নেহাত অসম্ভব হ'লেও, আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে সহজবোধ্য ছিল।

পণ্ডিতজী ঐ গুপ্তসমিতির বেশী কিছু খবর রাখতেন ব'লে মনে হয় না। তবে ভারতীয় সকল নেতারমত ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারই ছিল তাঁরও প্রধানতম পন্থা। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাঁর কি মত ছিল, তা ঠিক বুঝতে পারি নি। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি, "হোমরুলই" ছিল তাঁর একমাত্র আদর্শ শাসন প্রণালী।

কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি এক হাজার কি ঐ রকম কিছু টাকার একটা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছিলেন। ভারত স্বাধীন হ'লে তার শাসন-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যে ভারতীয় লেখকের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হবে, তিনি সেই পুরস্কার পাবেন। ঐ সকল প্রবন্ধের ভালমন্দ বিচারের ভার ছিল একটি কমিটীর ওপর। তার কর্ত্তা ছিলেন স্বয়ং পণ্ডিতজী। তার সভ্য অর্থাৎ বিচারক দশ বারো জন ছিলেন; তাঁদের অধিকাংশেরই

এ বিষয় বিচারের অযোগ্যতা সম্বন্ধে এই মাত্র বললে যথেষ্ট হবে যে, তার মধ্যে ছিল এই লেখকও এক জন।

বোধ হয়, সাতটী মাত্র প্রবন্ধ সারা ভারত থেকে পাঠান হ'য়েছিল। তার মধ্যে বিশিষ্ট দু'জন প্রবন্ধ লেখকের নাম মনে পড়ছে। এক জন শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রিন্স আগাখান,* তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে সুন্দররূপে ছেপে পাঠিয়েছিলেন। এক কথায়, মনে হয় তার তাৎপর্য্যটি ছিল, ভারতের পক্ষে চিরকালের জন্য অর্থাৎ যাবৎ-চন্দ্র-দিবাকর একমাত্র বর্ত্তমান শাসন প্রণালীই বিধেয়। বিধেয় চিরকালের জন্য হোক বা না হোক, যতদিন এই অপ্রতিবিধেয় হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা বিদ্যমান থাকবে, আর যতদিন জাত (caste) অথবা বংশগত বর্ণভেদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্মতন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে অটুট থাকবে, ততদিন জনসাধারণের সুবিধাজনক অন্য কোন রকম শাসনপ্রণালী যে অসম্ভব, যারা সেকালের তথাকথিত অতিরঞ্জিত বৃথা গৌরবে গৌরবান্বিত হবার তৃপ্তিজনিত নেশাটাকে, অথবা অন্যকে এই তৃপ্তি দেবার ব্যবসাকেই স্বদেশ-প্রেমিকতার একমাত্র নিদর্শন না ক'রে, ভারতের বর্ত্তমান ভীতি-উৎপাদক সমস্যাগুলির উপায় চিন্তা করতে গেলে যে, রক্ত ঠাণ্ডা হবার অবস্থা আসে, তা বাস্তবিক (আধ্যাত্মিক নয়) রূপে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের এই মর্ম্মন্তুদ ধারণা না এসে পারে নি।

আর একজন ছিলেন কলকাতার শ্রীযুক্ত বি, সি, মজুমদার, যাঁর নাতিদীর্ঘ সুচিন্তিত প্রবন্ধ সকলের মতে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হ'লেও কেবল মনঃপূত হয় নি পণ্ডিতজীর। এজন্য এবং প্রবন্ধের

* বোধ হয় তখন ইনি কোন উপাধি লাভ করেন নি।

সংখ্যা নিতান্ত কম ব'লে, সে বছরের মত পুরস্কার স্থগিত রেখে, আরও প্রবন্ধের জন্য আবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'য়েছিল।

আমাদের প্রায় সকল বড় নেতা নেহাৎ দায়ে না ঠেক্‌লে, অন্যের মতামত বিচার সঙ্গত হ'লেও তদনুযায়ী নিজের মতের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করতে পারেন না। এই গোঁ পণ্ডিতজীর বড় একটা ছিল না। অন্য অভিজ্ঞদের সঙ্গত মতামত গ্রহণের জন্য তাঁর চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিলনা। তথাপি "হোমরুল" নামক কবন্ধ তাঁর ঘাড়ে রীতিমত চ'ড়ে বসেছিল ব'লে ঐ সাতটি মাত্র প্রবন্ধে বোধ হয় সেই কবন্ধের গন্ধ না পেয়ে পুরস্কার স্থগিত রেখেছিলেন ব'লে তখন মনে হ'য়েছিল।

যে বৈপ্লবিক নেতার নাম, যশ, লোকপূজা আদি লাভের বাসনা ক্রমে বলবতী হয়, সে নেতার ডবল রাষ্ট্রনৈতিক মতের দরকার হ'য়ে পড়ে। একটা আত্মপ্রকাশের জন্য প্রকাশ্য মত আর একটা গুহ্য, যা' আত্মত্যাগের চরম নিদর্শন। প্রকাশ্যমতটা হয় প্রথমে লোকমত সংগ্রহের অছিলামাত্র। ক্রমে এই লোক মত সংগ্রহ হ'য়ে দাঁড়ায় লোকপূজা সংগ্রহ। আর লোকপূজার স্বাদ একবার পেলে বা লোকপূজার নেশা একবার জমলে তখন কিছুতেই তা' ছাড়ে না। অন্যদিকে গুহ্য যেটা, সেটা আইনের চরম বিরোধী ব'লে বিপৎসঙ্কুল; নাম, যশ, লোকপূজার সম্ভাবনা তাতে সুদূরপরাহত। তাই এটা ক্রমশঃ তুচ্ছ ও ত্যাজ্য হয়ে যায়। এই দু'মতওয়ালা নেতারা যে শুধু বিপ্লবসমিতি নাশের কারণমাত্র হয়ে দাঁড়ান, তা নয়; লোকপূজার লালসায় এমনই হ্যাংলা হয়ে ওঠেন যে, বৃথা লোকতৃপ্তির জন্য দেশের অনিষ্টকর এমন অকার্য্য কুকার্য্য নাই, যা এরা করতে পারেন না। যাই হোক, পণ্ডিতজী

কিন্তু এ হেন দু'মতওয়ালা নেতা ছিলেন না। অনেক ঘটনার মধ্যে দু'টির এখানে উল্লেখ ক'রে তা দেখাব।

মাস চার পাঁচ পারিসে থাকবার পরও যখন সেখানকার কোন বৈপ্লবিক সমিতি কিংবা এনার্কিষ্টদের কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম না, তখন কোন কেমিষ্টের কাছে মাইনে দিয়ে একস্প্লোসিভ কেমিস্ট্রী শেখ্‌বার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। এক পাকা ফ্রেঞ্চ কেমিষ্ট জুটেও গেলেন। কিন্তু প্রথমে ক্লোরেট অব পটাশের একটা অতি সাধারণ বিস্ফোরক দেখিয়ে দিয়ে তিনি ব'লে বসলেন, এর চেয়ে আর নাকি সাংঘাতিক জিনিষ তয়ের হয় না। তার পর দাবী করেছিলেন, শিখিয়ে দিলে পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক। যাই হোক, তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, ও সব চলবে না। দু'খানা বই ('Nitro Explosives' এবং Modern High Explosives) দেখালাম। পরে মঃ বার্থোলোর একখানা বইও জোগাড় করা হয়েছিল। তার পর বন্দোবস্ত হ'ল, আমরা একটা ছোট্ট ল্যাবরেটারী করব। তাতে এক দিন অন্তর সপ্তাহে তিন দিন ঐ বই দু'খানার আলোচ্য প্রত্যেক একস্প্লোসিভটা হাতে কাযে তয়ের ক'রে দেখিয়ে দিতে হবে। তার দরুণ প্রতি দিন বিশ ফ্রাঙ্ক দিতে হবে। ছ'মাসের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু এত টাকা আসে কোথা থেকে? এইটেই মস্ত এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পণ্ডিতজীকে ধরাই স্থির করলাম। তখন তিনি লণ্ডনে। আমার পূর্ব্বোক্ত পরিচয়পত্র সমেত নিবেদন ক'রে পাঠালাম যে, টাকার অভাবে কোন বিশেষ কায হচ্ছে না। তিনি উত্তর দিলেন, পারিসে এসে টাকা দেবেন। কয়েক দিন পরে এলেন; ষ্টেশন থেকে তাঁর বোঁচকা বয়ে এক হোটেল পর্য্যন্ত নিয়ে গেলাম। খুব আপ্যায়িত

করলেন। এই প্রথম দর্শন। তাই বড় আশা হ'ল এই একটা লোকের মত লোক পেলাম। তার পরদিন গিয়ে টাকা কি হবে, তা যখন খুলে বললাম, তখন তাঁর চক্ষু একবারে চড়কগাছ। বললেন, খবরদার, যেন ও সব কায কেউ না করে। করলে তাঁর বড় সাধের 'হোমরুল' না কি ফস্কে যাবে।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে শুনলাম, উক্ত "ইণ্ডিয়া হাউসে" ম্যানেজার আর পাচক, এই দু' কাযে এক জন লোক দরকার। আবেদন পাঠালাম; মঞ্জুর ক'রে ডেকে পাঠালেন। লণ্ডনে গিয়ে শুনলাম, পণ্ডিতজীর মত তেমন কঞ্জুস ও খিট্খিটে লোক না কি ভূ-ভারতে আর একটিও জন্মায় নি। যা হোক, আদেশমত পুরোন ম্যানেজার-পাচকের সঙ্গে দু'দিন কায করলাম। কায পছন্দ হ'ল; কিন্তু য়ুরোপের কোন বৈপ্লবিক দলে যোগ দেবার চেষ্টাতেই লণ্ডনে গেছলাম জেনে অনেক অপ্রীতিকর ঝগড়াঝাটির পর "ইণ্ডিয়া হাউস" থেকে আমার প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই থেকে বোঝা যায়, পণ্ডিতজীর মতের প্রকাশ্য আদর্শ "হোমরুল" ছাড়া অন্য গুপ্ত মতলব কিছুই ছিল না।

যাই হোক, বিলেতে ভারতীয় কংগ্রেসের বড়কর্ত্তা নৌরজীর সঙ্গে তখন তাঁর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। যেহেতু, বৃদ্ধ নৌরজী ছিলেন কংগ্রেসী মডারেট; আর পণ্ডিতজী নিজেকে ঘোরতর একষ্ট্রিমিষ্ট ব'লে জাহির করতেন।

তাঁর চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া জমকাল রকমের ছিল; বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবির সঙ্গে এঁর চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। তিনি স্পষ্ট বক্তা অথচ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁর ধর্ম্মের বা আধ্যাত্মিকতার কোন রকম গোঁড়ামী

অথবা ভণ্ডামী ছিল না। জগতের কৃতকর্ম্মা রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরদের মত তিনিও ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদিকে ঐহিক ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ-সাধন-উপায়স্বরূপ গণ্য করতেন। ঐহিক উন্নতিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যাধ্যক্ষ বিনায়কও তখন কতকটা বোধ হয় এই মতাবলম্বী ছিলেন।

অর্থ ছিল তাঁর বিপুল। হিন্দু স্ত্রী তাঁর সঙ্গে থাকতেন, সংসারে না কি তাঁর আর কেউ ছিল না। তিনি বলতেন, তাঁর সমস্ত অর্থ স্বদেশের কাযে ব্যয় করবেন। ভারতীয় নেতার প্রধানতম বিদ্যা অর্থাৎ স্বদেশী কাযের নামে অন্যের কাছ থেকে টাকা আদায়ের শক্তি ছিল তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু গরীবের পকেটে বড় একটা হাত দিতেন না, লক্ষপতিরই স্কন্ধে আরোহণ করতেন। অনর্গল বচন দিয়ে তড়িঘড়ি ভক্ত বানিয়ে ফেলতে খুব পারতেন; কিন্তু অন্য নেতাদের মত অন্ধ ভক্তবাৎসল্যটা সুবিধামত ছিল না ব'লে ভক্তরাই শেষে তাঁর আপদ হয়ে দাঁড়াত। অনেক বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল নাকি অগাধ। ম্যাজিনীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে এবং পণ্ডিতজী ব'লে ডাকলেও ভারী খুসী হতেন; তাই আমরা তাঁকে পণ্ডিতজী বলেই উল্লেখ করলাম।

আর এক জন ভারতীয় ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন; তাঁর জহরতের কারবার সেখানকার ভারতবাসীদের মধ্যে সব চেয়ে ছিল ক্ষুদ্র রকমের; কিন্তু তাঁর প্রাণটি ছিল বোধ হয় সব চেয়ে বড়। তাঁর সহানুভূতিতে সুদূর বিদেশেও ঘরে আছি বলেই মনে হ'ত। অনেকের কাছে বিমুখ হয়ে, শেষে তাঁরই কৃপাতে একটি ছোট ল্যাবোরেটারী হয়ে গেল। পূর্ব্বোক্ত কেমিষ্টকে দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট সুরু ক'রে দিলাম। আর এক জন ভারতীয় সহকর্ম্মীও জুটিয়ে নিলাম।

এই সময়ে এক দিন একখানা খবরের কাগজে পড়লাম, "এনার্কী"

নামক পত্রিকার এডিটার, এনার্কীজমের ধুরন্ধর নেতা মঃ লিবার্ত্তার কি একটা আইন অমান্য করার জন্য সাত দিন কারাবাসের সৌভাগ্য হয়েছে। সেই পত্রিকাতে তাঁর ঠিকানা ছিল। সাত দিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এবং সাদরে গৃহীত হলাম। এখানে ব'লে রাখি, তখন আমি কায-চালান গোছ ফরাসী ভাষা বল্‌তে ও বুঝতে পারতাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনে এমন সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, আর এমন সব কথা বলেছিলেন, যা থেকে সে দিন আমি মনে করতে পেরেছিলাম, এঁদের দ্বারা আমার সকল আশাই পূর্ণ হবে। কিন্তু তখনও এনার্কীজম্ জিনিষটি কি, তার বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। রেভোলিউসনারী পার্টি আর এনার্কীষ্ট পার্টি, একই ব'লে তখন ধারণা ছিল।

যাই হোক, এই সর্ত্তে, তাঁদের দলের এক জন হ'তে পেরেছিলাম যে, সপ্তাহে দু' দিন, তিন চার ঘণ্টা ক'রে তাঁদের আড্ডার কোন কিছু কায ক'রে দিতে হবে, অথবা অন্য কোথাও কাযে নিযুক্ত থাক্‌লে, সপ্তাহে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য কর্‌তে হবে। আমাদের দেশের গুপ্ত সমিতির বা অন্য কোন সমিতির সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হবার ব্যবস্থা, ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ কাযকর্ম্ম সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, ভরণপোষণটা সমিতির ঘাড়ে চেপে করবার মত অবস্থা না হ'লে, দলভুক্ত হবার যোগ্যতা জন্মায় না। যাই হোক, আমরা সপ্তাহে দু'দিন তিন চার ঘণ্টা ধ'রে "এনার্কীর" প্রেসে কায ক'রে দিয়ে আস্‌তাম। এই কর্ম্মভোগ করেছি, দু'মাসেরও অধিক।

এনার্কীজ্‌ম্ জিনিষটা যে কি, দু'চার কথায় এখানে তা বল্‌বার চেষ্টা করি। এঁদের মতে রাষ্ট্রীয় শাসনের, ধর্ম্মের, সমাজের, অথবা অন্য কোন কিছুর আইন-কানুন, বিধি, নিষেধ ইত্যাদির দ্বারা মানুষকে

চালিত করা, এবং এই সকল লঙ্ঘনে দণ্ড, পালনে কিছু না, কিন্তু অন্যকে পালনে বাধ্য করানতে পুরস্কার ইত্যাদি নেহাৎ অস্বাভাবিক, আত্মমর্য্যাদা-হানিকর, জনসাধারণের উন্নতির অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়, মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, এবং বেশীর ভাগ মানুষের ওপর মাত্র জনকয়েকের প্রভুত্ব রক্ষার উপায় ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে এনার্কীজ্‌মের উদ্দেশ্য। এঁদের আদর্শ, মানুষমাত্রেই "যার যা খুসী, সে তাই করবে।" এই যা খুসী তা করবার মত অবস্থায় মানুষকে আনতে হ'লে, মানুষ না কি এমন উন্নত রকমের কর্ত্তব্যপরায়ণ হবে যে, নিন্দা, স্তুতি অথবা দণ্ড-পুরস্কারের অপেক্ষা না ক'রে অন্যের অনিষ্টজনক কিছু কেউ করবে না— অন্যের বাৎলে দেবার বা হুকুম করবার অপেক্ষা না রেখে, আপন আপন কর্ত্তব্য, নিক্তির ওজনে পালন করতে পারাই হবে মানুষের পক্ষে চরম আনন্দদায়ক কায।

এ শুন্‌তে বেশ উচিত কথা বলেই মনে লাগে; কিন্তু এ আদর্শে পৌঁছবার পথ খুঁজে দেখতে গেলে দেখি, আমাদের নেতাদের আদর্শের অনুযায়ী আধ্যাত্মিক স্বরাজে পৌঁছবার পথের মত অসম্ভব না হ'লেও কেবলই অন্ধকার।

এঁদের মধ্যেও মতভেদ আছে; আদর্শের তারতম্য আছে; অত্যাচারী রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকে গুপ্ত হত্যার দ্বারা দণ্ড দেবার ব্যবস্থা আছে; আর আছে সমিতি বা আড্ডা-ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এনার্কীজ্‌মের আদর্শে স্বাধীনতার লীলা প্রকট। সেখানে free loveএর অভিনয় হয়; স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ব'লে কিছু নাই; আর না কি আত্মপর ভেদও নাই। এঁদের মধ্যেও বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত, কবি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক আদি আছেন। নাইট স্কুল, সুলভ সাহিত্য, সংবাদপত্র,

ব্যঙ্গচিত্র, বক্তৃতা, সভাসমিতি আদি দ্বারা প্রচারকার্য্য ও লোকশিক্ষার চেষ্টা করা হয়।

পারিসের অলিতে গলিতে বিস্তর সমিতি আছে। শুধু পারিসে নয়, সমস্ত য়ুরোপে না কি এই রকম। আমরা অনেকগুলি সমিতিতে যোগ দিয়েছি। এর সভ্যদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অথবা যাদের সম্বন্ধে কিছু জান্‌বার সুবিধা হয়েছিল, তাদের প্রায় অনেকেরই একটু না একটু মাথার গোলমাল ছিল ব'লে তখন মনে হয়েছিল। এদের পনের আনা স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর লোক। মঃ লিবার্ত্তা কিন্তু এক জন বড় দরের নেতা, বক্তা ও চতুর লোক। ইনি ছিলেন খোঁড়া; কাণা খোঁড়া একগুণ বাড়া হয়েই থাকে।

এই দলে ঢুকে আমার প্রথম অনুসন্ধানের বিষয় হয়েছিল—এদের মধ্যে কোন ইংরেজ আড্ডাধারী ছিল কি না। প্রায় সব দেশের লোক অল্পবিস্তর ছিল; কিন্তু এক জনও ইংরেজ খুঁজে পাই নি। কারণ অনুসন্ধান ক'রে যা জেনেছিলাম, তার আসল তথ্যটা এই যে, ইংরেজের অতি দুঃস্থও বর্ত্তমান বৃটিশ শাসনপ্রণালীর ওপর বেশী বীতশ্রদ্ধ নয়। এইটেই ইংরেজ শাসনের মাহাত্ম্য।

যাই হোক, মাসখানেক পরে আবিষ্কার করলাম, আমাদের অনুষ্ঠিত বিপ্লববাদের জন্য কিছুই এদের কাছে শেখ্‌বার মত নেই। গুপ্ত সমিতি-গঠনপ্রণালী সম্বন্ধেও শেখবার কিছুই ছিল না; কারণ, এদের সমিতিগুলোকে গুপ্ত সমিতি ব'লে মনে করবার কিছুই দেখতে পাই নি। কাযেই ক্রমে সেখানে যাতায়াত বন্ধ ক'রে দিলাম।

ইতিমধ্যে আমেরিকাবাসিনী এক মহিলা এনার্কিষ্ট, আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হ'তে পারেন, এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন য়ুরোপের কোন বিশেষ

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বন্দী হবার পর পলাতক। সেদিনকার আলাপের পর অনেক দিন যাবৎ তাঁকে খুঁজে পাই নি। কারণ, তিনি আমাদের সন্দেহ ক'রে তাঁর ঠিকানা ভাঁড়িয়েছিলেন।

মাসখানেক পরে হঠাৎ এক দিন তাঁকে একটা মিউজিয়ামে ধ'রে ফেল্‌লাম। সেবার তাঁর হোটেল পর্য্যন্ত গিয়ে অনেক ক'রে তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করতে পেরেছিলাম। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় পারিসের তখনকার (১৯০৭) কোন এক বিশিষ্ট সোসিয়ালিষ্ট দলের এক জন নেতার সাক্ষাৎ লাভ করলাম।

পারিসের লুকসেম্‌বার্গ গার্ডেনে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই নেতার সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর সৌম্য সুন্দর মুখখানি দেখেই শ্রদ্ধা আপনি জেগে উঠেছিল। আজও তাঁর সেই মুখখানি হুবহু মনে পড়্‌ছে। যাই হোক, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, বিশেষ ক'রে আমাদের বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলাম, যেন তা শুনে তিনি বড়ই হতাশ হয়েছিলেন। মনে হ'ল, আমার বদ্‌খত চেহারা আর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বোধ হয় সেই হতাশার কারণ। কিছুকাল পরে যখন বেশ আত্মীয়তা জন্মেছিল, তখন এই হতাশার কারণ খুলে বলেছিলেন; এবং তা সত্ত্বেও যে কেন এত সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, তার কারণ না কি আমাদের আন্তরিকতার ত্রুটি দেখেন নি।

তিনি যা বলেছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, তার সার মর্ম্ম ছিল এই যে, তাঁদের সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত না হ'লে তাঁদের সাহায্য মিল্‌বে না। আর সভ্য হ'তে হ'লে তিন জন খ্যাতনামা সোসিয়া-লিষ্টের জামিননামা চাই। আমি পরে বুঝে ব'লব ব'লে সেদিনকার মত বিদায় নিয়েছিলাম।

এমন তিন জন জামিন খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে যে কি রকম অসম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সোসিয়ালিজম্ বলতে জিনিষটা প্রকৃতপক্ষে যে কি, তার খোঁজ আমাদের দেশের খুব কম লোকই রাখত। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই এক কথাতেই যেমন সমস্ত চার্ব্বাক দর্শনের বিশদ তাৎপর্য্য আমাদের বুঝিয়ে রাখা হয়েছে, সেই রকম "সমস্ত লোকের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, সকলকে সমানভাবে ভাগ ক'রে দেবায়" নাম যে সোসিয়ালিজম, সেই ধারণাই আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে তখন প্রায় বদ্ধমূল হয়েছিল। হয় ত কারও এ ধারণাটা একটু অন্য রকম ছিল। কিন্তু এই ধারণার বালাই নিয়ে য়ুরোপে প্রসিদ্ধিলাভের যোগ্য হবার জন্য কোন কিছু করাটা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানর মত অকারণ কষ্ট ব'লেই বোধ হয় তখন গণ্য হ'ত। কাযেই ভারতে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য য়ুরোপে খ্যাত সোসিয়ালিষ্ট পাওয়া যেতে পারে ব'লে বিশ্বাস করতে পারি নি। তার পর যে সকল ভারতবাসী য়ুরোপে ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও তেমন কাউকে তখন খুঁজে পেলাম না। তথাকথিত ভারত-বন্ধু ইংরেজ সোসিয়ালিষ্ট নেতাদিগকে, আমাদের সমস্ত গুপ্ত সমিতির ব্যাপারটা জানান কারুরই সমীচীন ব'লে বোধ হ'ল না। নিরুপায় হয়ে অগত্যা মাঝে মাঝে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে আস্তাম, আমরা চেষ্টা করছি।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্রমে বেশ আলাপ জমে উঠল। এঁর নাম আমরা জান্তে পারিনি। কারণ, এই ব্যাপারের লোকদের মধ্যে নাম-ধাম আদি জিজ্ঞেস করা বা বলা একটা মস্ত বড় অপরাধের মধ্যে গণ্য ছিল। তাই আমরা, Ph. D. বা দার্শনিক ব'লে এর

নামকরণ করেছিলাম। ইনি য়ুরোপের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনের স্কলার ছিলেন। তার পর বেনারসে তিন বছর থেকে সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে এ দেশের নানাবিধ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাও পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে য়ুরোপে একজন orientalist ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এই কারণে আমাদের সঙ্গে আলাপের জন্য উক্ত সোসিয়ালিষ্ট সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন।

এই সময় জার্ম্মাণীর ষ্টুটগার্টে বিশ্ব সোসিয়ালিষ্ট কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে, পারিস থেকে ভারতীয় ডেলিগেটরূপে দু'জন প্রেরিত হয়েছিলেন। এঁদের এক জন ছিলেন পূর্ব্বোক্ত রাণা সাহেব। আর এক জন স্বনামধন্যা মাদাম্ কামা। ইনি পার্শি ধর্ম্মাবলম্বী হয়েও নিজেকে হিন্দু মহিলা ব'লে সেখানে পরিচয় দিতেন। এঁর অর্থ ছিল প্রচুর। দেশের কাযে সর্ব্বস্ব পণ করেছিলেন। আর উনি উক্ত "পারিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর" একজন সংস্থাপয়িতা। কয়েকমাস যাবৎ এঁর সঙ্গে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এক টেব্‌লে ব'সে খাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইনি আমায় চিত্রকলা-শিক্ষার্থী ব'লেই জান্‌তেন। বিপ্লববাদী ব'লে তখন বুঝতে পারেন নি। ভারতপ্রসঙ্গে, বিশেষতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আলাপ করতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। দুনিয়ার নানা দেশে ভারতীয় রাজনীতির অবৈধতা দেখিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি অন্য দেশবাসীর সহানুভূতি উদ্রেক করানই ছিল এঁর প্রধান কায।

মাদাম কামা উক্ত বিশ্ব মহাসভাতে ভারতবাসীর পক্ষ হ'তে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তা না কি খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

বক্তৃতাকালে তাঁর হাতে ছিল ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের জন্য নির্ম্মিত এক ত্রিবর্ণ পতাকা। তাতে ছিল লাল, গেরুয়া ও নীল, পর পর এই তিনটি রং। ওপরে লাল রং, তাতে আটটি আধ-ফোটা সাদা পদ্ম; মাঝখানে গেরুয়ার ওপর দেবনাগরে লেখা ছিল,—"বন্দে মাতরম্"; তলায় নীল রংএর ওপর এক ধারে সূর্য্য, অন্য ধারে অর্দ্ধচন্দ্র ও তারা।

এ হেন পতাকা, তার ওপর পর্দ্দানসীন সাড়ী পরিহিতা হিন্দু মহিলার বিশ্ব সভায় দাঁড়িয়ে বর্ক্তৃতা, য়ুরোপের পক্ষে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাই সেখানকার বিস্তর কাগজে, মায় পতাকা তাঁর হরেক রকম ফটো এবং বর্ক্তৃতার অনুবাদ বেরোবার পর বেশ হৈ-চৈ প'ড়ে গেছল।

এই ঘটনাটি আমাদের পক্ষে কাকতালীয়বৎ হয়েছিল। ঐ দু'জনের কাছ থেকে, ঠিক কি জন্য দরকার, তা না জানিয়ে সহজে জামিননামা আদায় করে নিয়েছিলাম। তার পর উক্ত Ph D মশায়ও তখন অসঙ্কোচে আমাদের জন্য জামিন হয়েছিলেন। এইরূপে আমরা উক্ত সোসিয়ালিষ্ট দলে প্রবেশলাভ করেছিলাম। আমাদের স্বদেশ প্রীতি যে আন্তরিক, আমরা যে প্রতারক বা বিশ্বাসঘাতক নই, আর ভবিষ্যতে আমরা যে কোন রকম বিশ্বাস-ঘাতকতা করব না, জামিননামাতে সেই কথাই লিখিত ছিল।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হয়েছিল, তাঁদের দলের একজন বিশিষ্ট ডাক্তারের সঙ্গে আর ঐ দলের লোক দ্বারা চালিত এক হোটেলে পরিচিত হয়ে থাকা। তারপর ছিল, হরেক রকম গোয়েন্দার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করা ও তাতে অভ্যস্ত হওয়া। কত রকম গোয়েন্দা ছিল, তার একটা আন্দাজ দিই।

১। তাঁদের দলের বিরুদ্ধে নিযুক্ত তাঁদের দেশের গভর্ণমেন্টের এক বিশাল গোয়েন্দা বিভাগ।

২। ফরাসী সরকারের জগৎ বিখ্যাত গোয়েন্দা পুলিস।

৩। আমাদের বিরুদ্ধে বৃটিশরাজের গোয়েন্দা (ছিল বলে ধরে নিয়েছিলাম)।

৪। দলভুক্ত প্রত্যেক লোকের চালচলন লক্ষ্য করবার জন্ত নিজ দলের গোয়েন্দা।

৫। বিরুদ্ধ দলের গোয়েন্দা।

৬। দলের বিরুদ্ধে উক্ত শত্রুপক্ষীয় বা সরকার পক্ষীয় গোয়েন্দারা কি করছে না করছে, তার সন্ধান নেবার জন্ত নিজ দলের তরফ থেকে নিযুক্ত গোয়েন্দা। এ ছাড়া অন্ত অনেক বিদেশী গভর্ণমেন্টের নানা রকমের গোয়েন্দা সর্ব্বত্র বিরাজিত। সেখানকার গোয়েন্দাদের একটা নমুনা দিই।

এক দিন পারিসের সীমার বাইরে পরিখার পাড়ে নির্জ্জনে ঘাসের ওপর ব'সে আমার এক জুড়ীদারের সঙ্গে গল্প কচ্ছিলাম। হঠাৎ এক দল লোক এসে অতি বাড়াবাড়ি রকমের ভদ্রতার সহিত জানালে, তারা ফরাসী গোয়েন্দা পুলিস। প্রমাণ-স্বরূপ সরকারী তকমাও দেখালে। এই কারণে আমাদের ওপর সন্দেহ হয়েছিল যে, আমরা পারিসের সামরিক বন্দোবস্তের নাকি প্ল্যান যোগাড় কচ্ছিলাম। তাই আমাদিগকে তালাসী করতে চাইলে। সম্মতি নিয়ে তালাসীর পর কিছু না পেয়ে নেহাৎ বিনয়ের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা এবং করমর্দ্দন ক'রে চ'লে গেল।

পরক্ষণেই আরও দু'জন এসে জানতে চাইলে, কি হয়েছিল? তারপর পুলিসকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে এবং আমাদের প্রতি

অশেষ প্রকার সহানুভূতি জানিয়ে আর মাঝে মাঝে অনেক কিছু জিজ্ঞেস ক'রে চ'লে গেল। তারা দু'এক পা যেতে না যেতেই আরও এক জন এসে, আগের দু'দলের কথা শুনে দ্বিতীয় দলও পুলিস, ছলনা করতে এসেছিল, এই ব'লে খুব এক চোট গালা-গালি দিলে। আর পূর্ব্বের মত সহানুভূতি দেখিয়ে ও সাবধান ক'রে দেবার ছল ক'রে আমাদের ভেতরকার কথা বে'র করবার চেষ্টা করেছিল। আমরা কিন্তু তখন কিছুই বুঝতে পারি নি। পরে আমাদের গুরু মশায়দের কাছে শুনেছিলাম, উক্ত তিন দলই না কি একই পুলিসের লোক।

সে যাই হোক, এইবার আমাদের অর্থাভাবটা বড়ই তীব্র আকার ধারণ করল। রোজগারের জন্য যে সকল কায করতাম, সবই তখন ছেড়ে দিতে হয়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, এক জন জুড়িদার জুটিয়েছিলাম। তা ছাড়া সকল প্রদেশের লোককে শিক্ষিত করতে হবে, এই দাবীতে এখন আবার লণ্ডন সমিতি থেকে আর এক জনকে নেওয়া হ'ল। তাদের খরচ যোগান ত আবশ্যক হলই, অধিকন্তু সেখানকার বন্ধুবান্ধবদের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ ক'রে, কোনরকম পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই, এমন এক নির্জ্জন পল্লীতে গিয়ে বাস করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। অথচ লণ্ডন গুপ্ত সমিতির সংগৃহীত চাঁদার টাকা সেখানকার কোন কোন সভ্যের ব্যক্তিগত বাজে খরচের ঋণ শোধ করতে নাকি শেষ হয়ে গেছল। তাই স্থির হ'ল, পণ্ডিতজীকে আমাদের মতে আনতেই হবে। Ph. D মশায়, এই মতে আনবার ভার সাগ্রহে নিলেন। তখন পণ্ডিতজী, পার্লামেণ্টে তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠাতে, লণ্ডন ছেড়ে পারিসে এসেছিলেন।

তার পর এক দিন পণ্ডিতজীর সঙ্গে Ph. D. মশায়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সেকালে এ দেশের শ্রাদ্ধবাড়ীতে তথাকথিত পণ্ডিতদের ব্যাকরণের তর্ক-যুদ্ধের প্রহসন যেমন হ'ত, সে দিন সেখানেও তাই হ'ল। একমাত্র দম্পতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে তিন চার ঘণ্টা কেটে গেল। উপভোগ্য হলেও আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু Ph. D. মশায় আমাদের ধৈর্য্য ধরতে ইঙ্গিত করলেন। ঐ ব্যাকরণ-যুদ্ধে হার স্বীকার ক'রে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে তিনি বলেছিলেন, সহজে কার্য্য সিদ্ধ হবে।

দিন কয়েক পরের মিটিংএ কাযের কথা সুরু হয়েছিল এবং পণ্ডিতজী Ph. D. মশায়ের প্রদর্শিত ভারত উদ্ধারের পন্থা যে শ্রেষ্ঠ, তা অম্লান বদনে স্বীকার ক'রে নিজের পূর্ব্বমত একবারে ত্যাগ করে-ছিলেন, এবং তার প্রমাণস্বরূপ খুসী হয়ে শ' পাঁচেক টাকার একখানা নোট ভারতীয় প্রথায় Ph. D. মশায়কে দান করেছিলেন। তিনি দানগ্রহণে নারাজ হলে পর, তাঁদের সমিতিকে সেই টাকা সাহায্য স্বরূপ দেওয়া হ'ল। সেই দিন থেকে তাঁর 'সোসিওলজীর' সুর বদলে গেল। এই বাদানুবাদের ফলে প্রভূত জ্ঞান লাভ হয়েছিল আমাদের।

তাঁর এই মত পরিবর্ত্তনের আরও কতকগুলি গৌণ কারণ ঘটেছিল এই সময়ের কিছু আগে হ'তে এ দেশে, বৃটিশরাজের সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন স্বাধীনতার দাবী, প্রকাশ্যভাবে জাহির করা হচ্ছিল এবং "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে লিখিত এই দাবীর পোষক যুক্তি-তর্কও সেখানকার ভারতীয়দের মনের ওপর যথেষ্ট কায করেছিল। কারণ, মাস কতক আগে বিপিন বাবুর "নিউ ইণ্ডিয়া" তাঁদের চরম রাষ্ট্রিয় মতামতের খোরাক যোগাত। তার পর "বন্দে মাতরম্"

পেয়ে অবধি "নিউ ইণ্ডিয়া"কে আর বড় একটা আমল দিতেন না। হেনকালে "বন্দেমাতরমে"র এডিটার ব'লে অরবিন্দ বাবু সিডিসনের দায়ে ফৌজদারী-সোপরদ্দ হ'লেন। দেশেও যেমন অরবিন্দ বাবুর নাম চরমপন্থী ব'লে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হ'ল, পারিসের ভারতীয়দের মনেও তেমনি বিপিন বাবুর স্থানে অরবিন্দ বাবু প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। তার আগে "যুগান্তরের" প্রথম সম্পাদক ভূপেন বাবুর গ্রেপ্তার এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁর নির্ভীক উক্তি, ভারতের রাষ্ট্রীয় গগনে সম্পূর্ণ পৃথক রকম আব-হাওয়ার সৃষ্টি ক'রেছিল। ফল কথা এ দেশের হঠাৎ রাষ্ট্রনৈতিক মতপরিবর্ত্তনের প্রভাব পণ্ডিতজীর মতকে পরিবর্ত্তনোন্মুখ ক'রে ফেলেছিল। এমন সময়ে Ph. D. মশায়ের অকাট্য যুক্তি, পরিবর্ত্তনের কাযটা সুসম্পন্ন ক'রে ফেল্‌ল।

ভারতীয় নেতারা হাতকড়ার ভয়ে বা কোন রকমের বেগতিকে না পড়লে, মত কখনও প্রায় বদলান না। যদিও বা এইরূপে কখনও বদলেছেন, তাও প্রায় গরম থেকে নরমের দিকে। সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বড় নেতা কখনও অন্যের যুক্তি-তর্কের প্রভাবে, অন্তরের সহিত হঠাৎ নরম থেকে গরমে উঠেছেন ব'লে প্রায় শোনা যায় নি। তাই মনে হয় পণ্ডিতজীর হঠাৎ এ রকম নরম থেকে গরমে পরিণতি, ভারতীয় নেতার পক্ষে অভিনব ব্যাপার; বিশেষ করে সন্ত পণ্ডিতজীর ওপর খোদ বৃটিশ-মজলিস (Parliament) থেকে রাজ-সরকারের চোখরাঙ্গানীর পর। এই খানে পণ্ডিতজীর বৈশিষ্ট্য।

যাক্‌, আমরা পারিসের কোন নির্জ্জন পল্লীতে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে উঠে গেলাম। ছ' মাসের জন্য সেখানে আমাদের অজ্ঞাত-বাস হ'ল।

Ph. D. মশায় এবং তাঁর দলের আর একজন ভূতপূর্ব্ব সামরিক কর্ম্মচারী আমাদের শেখাবার ভার নিয়েছিলেন। শেষোক্ত ভদ্রলোক, তাঁদের দেশের রাজ-সরকারের তরফ থেকে "মিলিটারী এতাসে" বা "এটাচি" হ'য়ে ভারতে বহুকাল ছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তিনিও একজন বিশেষজ্ঞ ব'লে তাঁদের সমিতি থেকে এ কাযে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এঁরা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাতে এক রকম ক'রে কথা বলতে পারতেন।

আমাদের শিক্ষা সুরু হ'ল। ক্রমে জগতের তুলনামূলক ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্ম ইত্যাদি তত্ত্বথেকে সুরু ক'রে সোসিয়ালিজম, কমিউনিজম আদি হরেক রকম চিজ একসঙ্গে খিঁচুড়ী পাকিয়ে গিলে ফেলতে লাগলাম; পরে পেট ফেঁপে মারা যাবার আশঙ্কা তখন করি নি। অবশেষে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতি গঠন-প্রণালী ও তার বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সাধন-কৌশল সম্বন্ধে আমাদের লব্ধজ্ঞান নোট-বুকে লিখিত হ'তে লাগল। এইভাবে চার পাঁচ মাস অতীত হ'য়ে গেল। তখনও উক্ত ফ্রেঞ্চ কেমিষ্টের কাছে এক্সপ্লোসিভ কেমিষ্ট্রী শেখা পূর্ব্বের মতই চল্‌ছিল; কিন্তু বোমা তৈরী অথবা বৈপ্লবিক বা সামরিক নানাপ্রকার কাযে তার যথাযোগ্য ব্যবহার শিখতে তখনও বাকী ছিল। সে কায শুধু কেমিষ্টের দ্বারা কিছুতেই নাকি সম্ভব নয়। এক্সপ্লোসিভ কেমিষ্ট্রী-জানা এক জন খুব হুসিয়ার মিস্ত্রীর সে কায। আমাদের বিশেষ অনুরোধে ও জেদে উক্ত সোসিয়ালিষ্ট সমিতি হ'তে, এক জন বৃদ্ধ এঞ্জিনিয়ার ঐ সকল শেখাবার কাযে নিযুক্ত হ'লেন। ইনি একজন পলাতক রাজনৈতিক অপরাধী। তখন আমরা পূর্ব্বোক্ত ফ্রেঞ্চ কেমিষ্টকে বিদায় দিয়ে শোবার ঘরটাকেই মিস্ত্রীখানা

ও ল্যাবরেটারীতে পরিণত ক'রে নতুন গুরুর কাছে বিদ্যারম্ভ ক'রে দিলাম। ইনি গোয়েন্দার ভয়ে দিনমানে ঘরের বাইর ত হতেন না, রাত্রেও ছদ্মবেশ ভিন্ন বেরোতেন না। কাযেই দিনরাত আমাদের কায চলত।

গোয়েন্দা পুলিস হঠাৎ এসে পড়লে বা জিজ্ঞাসাবাদ করলে, কি করা বা বলা উচিত, তাও শেখাবার জন্য নিজেদের লোকই আগে না জানিয়ে গোয়েন্দা সেজে হঠাৎ এসে পড়তেন এবং প্রত্যেককে পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করতেন।

এই ভাবে আমাদের ঐ সকল লব্ধ বিদ্যাও বিশদরূপে নোট-বুকে লিখে গুরুজীর দ্বারা শুধ্‌রে নেওয়া হ'ত। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে তাঁর একখানি বিস্তৃতভাবে লিখিত সচিত্র সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি ছিল। তার হুবহু অনুবাদ ও লিথো করাতে, অনেক ফিকির-ফন্দী ও অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক হ'য়েছিল। সে কথা এখন থাক্‌। যদি কখনও সুবিধে হয়, তবে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাগুলোর উপন্যাসের মত রহস্যজনক অংশটা পরে পৃথক প্রবন্ধে লেখবার চেষ্টা করব।

কিন্তু আমাদের এই বোমা শেখার ব্যাপারে উক্ত সোস্যালিষ্ট গুরুমশায়রা প্রথমে রাজী ছিলেন না। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, ভারতবাসী তখন বৈপ্লবিক তাণ্ডব কাণ্ডের (terroristic work) জন্য প্রস্তুত হ'তে পেরেছে। সমস্ত ভারত জুড়ে বিশালভাবে সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্তসমিতি গ'ড়ে তোলবার আগে, বিশেষ ক'রে এই সমিতির গোয়েন্দা বিভাগ, সরকারী পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ হবার আগে, বৈপ্লবিক তাণ্ডব-ব্যাপার আরম্ভ করলে, তার ফল যে মারাত্মক

হবেই তা অকাট্য যুক্তি ও নানা দেশের নজীর দ্বারা বুঝিয়ে, আমাদের ঐ কায থেকে আপাততঃ নিবৃত্ত ক'রতে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন। আর বুঝিয়ে দিলেন, বোমা, গুলীগোলা আদি তৈরী করতে শেখার ব্যাপারটা, গুপ্ত সমিতির অন্য শিক্ষণীয় কাযের তুলনায় না কি নগণ্য।

এই সময়ের দশ বারো বছর আগে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তখন ভারতের যে অবস্থা দেখেছিলেন, তা' থেকে এটা বিশ্বাস ক'রতে পারছিলেন না যে, হঠাৎ কি ক'রে ভারতের মত দেশে, জনসাধারণের মনোভাব এমন ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের পোষক হ'য়ে গ'ড়ে উঠল। চীনে বহুকাল থেকে গুপ্ত সমিতি এমন দক্ষতার সহিত পরিচালিত হচ্ছিল যে, তার তুলনা নাকি তখন দুনিয়াতে ছিল না। গুপ্তসমিতি-গঠনে যে চীনারা কত দূর সিদ্ধ হয়ে'ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের প্রতিবেশী চীনারা, আমাদের দেশে এসে গুপ্তসমিতি গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করছে কি না? করছে ব'লে শুনলে হয় ত, নিঃসন্দেহ বিশ্বাস করতে পারতেন, আমাদের দেশ বোমা-কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে।

এ সকল ধর্ম্মের কাহিনী শোনবার মত মনের অবস্থা আমাদের মোটেই ছিল না। কোন রকমে তাঁদের রাজী করা আবশ্যক হ'য়েছিল। আমার জুড়ীদার দু'টির এক জন ছ'বছর আর এক জন প্রায় দু'তিন বছর আগে ভারত ত্যাগ ক'রেছিলেন। তার পূর্ব্বে তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে বোধ হয় বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। কাযেই ভারতে, বিশেষতঃ বাংলার সে সময়কার স্বদেশী আন্দোলন আর বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির অবস্থা

সম্বন্ধে যা' আওড়ে যেতাম, তা' মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন করবার, এমন কি, মিথ্যা ব'লে বোঝবার বা সন্দেহ করবার ক্ষমতাও সেখানে কারও ছিল না। আমাদের গুপ্তসমিতির কাজ সম্বন্ধে, বহ্বারম্ভে বেপরোয়া ভাবে কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যার গোঁজা-মিল দিয়ে যা' মুখে আসে, তাই শুনিয়ে খুসী ক'রে দেবার বিদ্যেতে, আমার ওস্তাদ 'খ'-বাবু আর বারীনকে তখন হার মানিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার মধ্যে এ রকম মিথ্যা বচন দেবার প্রবৃত্তি প্রধানতঃ এই সব কারণে গজিয়ে উঠেছিল:—(১) আমি সত্যই এ কথা মনে করতাম যে, অন্ততঃ আট কি দশ বছরের মধ্যে, আমরা উঠে প'ড়ে লাগলেই বিপ্লব সার্থক হ'তে পারে। সুতরাং যত শীঘ্র হয়, বোমা আদি তয়ের করতে দেশকে শেখান উচিত আমাদের দেশবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বা ভ্রান্ত ধারণাই এইরূপ মনে করবার কারণ।

(২) সেকালে গ্রেপ্তারের দায় হ'তে সমিতির রক্ষার জন্য মন্ত্র-গুপ্তি বিদ্যায় সিদ্ধ হ'তে অথবা নিজেদের গোয়েন্দা বিভাগ গ'ড়ে তুল্‌তে যে রকম দীর্ঘকালসাপেক্ষ শিক্ষা ও অভ্যাস য়ুরোপে আবশ্যক হয়ে'ছিল বা হচ্ছে ব'লে ওঁদের কাছে শুনেছিলাম, আমাদের দেশে আদৌ সে রকম দরকার নেই ব'লেই মনে করতাম; কারণ, আমাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, এ দেশের টিকটিকির কান বেজায় লম্বা, আর আমাদের সনাতন ধর্ম্মের দেশের লোক য়ুরোপের লোকের মত অত বিশ্বাসঘাতক হ'তেই পারে না।

(৩) বোমা-কাণ্ড সুরু ক'রে দেবার জন্য যে, বাংলার বিশেষ কতকগুলি লোক অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন, আর সে জন্য আমাদের সমিতির সাহায্যে টাকা দিতেও চেয়েছিলেন, তা' আমরা

পূর্ব্বেই বলেছি। তাঁ'দের বাসনা চরিতার্থ করতে পারলে সমিতির আয়ের পথ সুগম হবে ব'লেই মনে করতাম।

(৪) আগে এও লিখেছি, আমার য়ুরোপে যাবার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধবিদ্যা ও সেই সঙ্গে কামান, রাইফেল, পিস্তল আদি তয়ের করতে শিখে এসে "আনন্দ-মঠের" মহেন্দ্রের পালা অভিনয় করা। অধিকন্তু তখন নিজের সম্বন্ধে এ ধারণাটাও কেমন ক'রে হ'য়ে প'ড়েছিল যে, আমার মত নিপুণভাবে এ সকল কাজ আর কেউ করতে পারবে না। ও সব শেখা যখন হ'লই না, তখন বোমার, আর পিস্তল, রাইফেল, এমন কি, কামান আদি গোপনে সরবরাহ করবার হিকমত্‌টা শিখে এলে যে, উক্ত মহেন্দ্রের মত একটা অতিবড় কাযের-লোক ব'লে পরিগণিত হব, এ রকম আশাটাও তখন গজিয়ে উঠেছিল।

কাযেই সেই সময়ে ভারতে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ক'রে আমাদের গুরু মশায়দের বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছিলাম যে, ভারত তাঁদের অভিপ্রায়মত উক্ত terroristic workএর জন্য প্রস্তুত আছে। অগত্যা তাঁরা মনে ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন যে চীনের প্রায় সমান সনাতন সভ্যতাবিশিষ্ট ভারত হয় ত বা প্রাচ্য-সুলভ বৈপ্লবিক জিনিয়াসের দেশ।* ভারত যে এ বিষয়ে একেবারে উল্টো সে জ্ঞান তখন জন্মেনি।

যাই হোক, দেশ যে প্রস্তুত হ'য়েছে, তার প্রমাণস্বরূপ যে সকল ঘটনা তাঁদের কাছে বিবৃত ক'রেছিলাম, তার কয়েকটা নমুনা এখানে দিই।

১। সেই সময়ের ভারতীয় অনেক সংবাদপত্র সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎ খুব চোখো চোখো এমন অনেক ধৃষ্টতা-সূচক বচনবাণ প্রয়োগ করতে

* এই ঘটনার চার বছর পরে চীনের রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হ'য়েছিল।

সুরু ক'রেছিল—যাতে ক'রে বাইরের লোকের পক্ষে ধ'রে নেওয়া খুব সহজ হ'ত যে, এ রকম বচনের পেছনে নিশ্চয় একটা বিপুল শক্তি গোপনভাবে গঠিত হ'য়েছে। এই ভাবটা সেখানকার সাধারণ পলিটিসিয়ানরা, এমন কি, আমাদের গুরুমশয়ও লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তাঁদের বোঝান সহজ হয়েছিল যে, আমাদের শত শত গুপ্তসমিতির হাজার হাজার সভ্য বৈপ্লবিক terroristic workএর জন্য কি রকম হা-পিত্তেশ ক'রে অকারণ ব'সে আছে।

২। 'যুগান্তরের' প্রথম সম্পাদক ব'লে বিদিত স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন বাবুর পূর্ব্বোক্ত সিডিসনের দায়ে গ্রেপ্তার আর প্রকাশ্য আদালতে তাঁর নির্ভীক উক্তি যে, গুপ্ত সমিতির প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিচায়ক আর আমি যে, ভূপেন বাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গ সহযোগী কর্ম্মী, তাঁর গ্রেপ্তারের পর লিখিত চিঠি আর অন্য কাগজপত্রের দ্বারা তা' প্রমাণ ক'রে দিলাম।

৩। "বন্দেমাতরমে" রাজদ্রোহ-সূচক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ বাবুর গ্রেপ্তারের উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। সুবিধা মত মাল-মসলার সঙ্গে এটাকেও প্রমাণ ব'লে চালাতে তখন ছাড়িনি।

৪। তার পর পাঞ্জাবে শ্রীযুক্ত লালা লজপৎ রায়, সর্দ্দার অজিৎ সিং ও সুফী অম্বালাপ্রসাদের হঠাৎ ডিপোর্টেসন সেই সময়ের কিছু আগে হ'য়েছিল, এ বিষয় পারিসের "তাঁ" ("Times") নামক সুবিখ্যাত দৈনিকে এক কলমব্যাপী একটি প্রবন্ধ বে'র হ'য়েছিল, তাতে লালাজীর নামটি ভুলে 'লপজৎ' রায় ক'রেছিল; আর একটা বিশ্রী রকমের ভুল করেছিল,—লালাজীর ছবি ব'লে চাপকান-পরা, বুকে চাপরাস আঁটা কোন এক পঞ্জাবী চাপরাসীর ছবিও ছেপেছিল। আমরা অবশ্য তার প্রতিবাদ ক'রে সত্যিকার ছবি বার

করেছিলাম। সে যাই হোক, "তাঁ" অনেক কথাই লিখেছিল ; ভারতে আবার ১৮৫৭র সূচনা হ'য়েছে ব'লে আতঙ্কও প্রকাশ করেছিল ; এমন আরও অনেক কাগজে অনেক কথা ছিল, যা' না কি ভারতে বিপ্লব যে উন্মুখ হ'য়ে এসেছে, তার প্রমাণ ব'লে আমরা তখন দেখাতে পেরেছিলাম।

৫। বাংলা দেশে তখন তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন-ব্যাপারে এত ধর-পাকড় চলছিল, বয়কট ও পিকেটিং নিয়ে এমন হুলুস্থূল প'ড়ে গেছল, অনেক স্থানে 'পিটুনী' পুলিসের কীর্ত্তিকথা এমন ক'রে বর্ণিত হ'ত, কয়েকটা সাহেব ব্যবসায়ীর * বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা এমন ষ্ট্রাইক চালিয়ে ছিল যে, তা প্রমাণস্বরূপ দেখিয়ে, আমাদের দেশ যে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিপুলশক্তি সঞ্চয় ক'রে terroristic work এর জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিল, আমাদের গুরু মশায়দের অবশেষে তা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলাম।

তাই প্রথমে সন্দিহান হ'লেও, তাঁদের মনও যেন এই প্রস্তুত হবার কথাটা বিশ্বাস করবার জন্য কতকটা উন্মুখ হয়েছিল। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল—তখন থেকে দশ বছরের মধ্যে না কি জার্ম্মাণদের সঙ্গে ইংরেজ আদির ভীষণ যুদ্ধ অনিবার্য্য। সেই যুদ্ধে দক্ষিণ-আফ্রিকা, মিশর ও আয়রল্যাণ্ড নিশ্চয় বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু ভারত বিদ্রোহী হয়ে না লড়লে, ইংরেজ কিছুতেই নাকি কাবু হবে না। তা' না হলে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হ'য়ে শিল্প-বাণিজ্যে অন্য দেশের মত আত্মনির্ভরশীল না হ'লে, না কি দুনিয়ায় কোথাও সোসিয়ালিষ্টদের কামনা

* ই, আই রেল—ওয়ে ও বার্ণ কোম্পানীর বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের strike প্রথমে ৺প্রেমতোষ বসু মহাশয়ের চেষ্টায় ঐ সময় সুরু হয়েছিল।

সিদ্ধ হবে না। তাই তাঁদেরও মন বোধ হয় চেয়েছিল, ঐ দশ বছরের মধ্যে কোন রকমে ভারত যেন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়। সাত বছর পরে সত্যই প্রত্যাশিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল।

এই মনোভাবের বশীভূত ছিলেন ব'লেই বোধ হয়, তাঁদের কাছে আমাদের এত আদর, যত্ন ও সহানুভূতি; আমাদের সাহায্য করবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এমন কি, আমাদের দেশে আসবার জন্যও বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন।

সে যাই হোক, সেই সময় নাকি পর্ত্তুগালে বিপ্লবের বিপুল অনুষ্ঠান চলছিল। আর নাকি ছ' মাসের মধ্যে বিপ্লব সংঘটন অর্থাৎ রাজতন্ত্র শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ ক'রে তার যায়গায় গণতন্ত্র শাসন প্রণালা প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ হব হব কচ্ছিল। হাতে-কাযে করে শেখবার জন্য আমাদিগকে সেখানে যেতে আমাদের Ph. D. মশায় বিশেষ করে বলেছিলেন। আমাদের কারুরই কিন্তু তাতে মত হয় নি। যাই হোক পর্ত্তুগালে কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে সত্যই বিপ্লব সিদ্ধ হ'য়েছিল।

সদ্য অর্জ্জিত বিদ্যেটা স্বদেশে জাহির করবার বাসনা নেহাৎ উৎকট হ'য়ে উঠেছিল; বিশেষ ক'রে পর্ত্তুগালে এমন ভীষণতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমাদের একটুও শঙ্কা যে হয় নি, এ কথা বলতে পারি না।

অবশেষে অগত্যা এই স্থির হ'ল, আপাততঃ আমরা দেশে এসে সদ্যোলব্ধ বিদ্যার মোতাবেক, সমস্ত ভারত জুড়ে গুপ্তসমিতির পত্তন দিয়ে, এক বছরের মধ্যে আবার ফিরে যাব। তখন পারিসে নিখিল ভারতীয় গুপ্ত-সমিতির প্রেরিত যোগ্য শিক্ষার্থীদের বিপ্লব-বিদ্যার যাবতীয় বিষয়, মায় শেষকালের প্রযোজ্য সমরবিদ্যাও শিক্ষা দেবার

জন্ত একটা গুপ্ত বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তার অবৈতনিক অধ্যাপনার কায করবেন উক্ত সোসিয়ালিষ্ট দলের বিশেষজ্ঞরা। আর শিক্ষার্থীদের নিজ ভরণ-পোষণের জন্য কায-কর্ম্ম করবার আবশ্যক হবে ব'লে একটা কোন ব্যবসায়ের কারখানাও প্রকাশ্যভাবে খোলা থাকবে।

এই সব করতে-কর্ম্মাতে টাকার কোন অভাবই যে হবে না, সে ধারণা আমাদের নিশ্চিত ছিল। কারণ, সেইখানেই অনেক টাকায় যখন অযাচিত প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, তখন ভাঁরতের ধনকুবের দেশ-প্রেমিকরা এমন কাযেরমত কাযের জন্য যে একবারে মুক্তহস্ত হবেন না, তা' বিশ্বাস করতে তখন প্রবৃত্তি হয় নি।

তার পর আমাদের লণ্ডন সমিতির প্রেরিত জুড়ীদার আরও দু'এক মাসের জন্য লণ্ডনে গিয়ে থাকলেন, বাকী আমরা দু'জন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ইতালীর নেপল্‌স্‌ বন্দরে জাহাজে চ'ড়ে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হ'লাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহারাষ্ট্রীয় গুপ্ত সমিতি

পারিস থেকে দেশে ফিরে আসবার মতলব স্থির হ'য়ে গেলে একটা ট্রাঙ্কে কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে বিপ্লবের কাযে আবশ্যক অনেক কিছু পুরে পারিস থেকে ক'লকাতায় কোন বন্ধুর নামে সেটা মাল-চালানী জাহাজে পাঠিয়েছিলাম। ঐ বন্ধুটি বেশ সুবিধাজনক ছিলেন, কারণ, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মাত্র কয়েক দিন আগে পেয়েছিলাম, আর তিনি পুলিস অফিসে কায করতেন। এ ছাড়া সঙ্গে নিয়েছিলাম, একটা ছোট 'ব্যাগ',—তাতে পুরেছিলাম এমন কিছু, যা' নাকি খোয়া গেলে তখনকার মনোভাব-অনুযায়ী মনে ক'রে ফেল্‌তাম, ভারত উদ্ধারের অর্দ্ধেক মাল-মসলা নষ্ট হ'য়ে গেল। আর তা' যদি আবার কাষ্টম্‌স্‌ হাউসে ধরা পড়ত, তা হ'লেই ফাঁসী, অথবা তার চেয়েও ভীষণ ব'লে যা' তখন মনে করতাম, সেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ছিল নিশ্চিত। যাই হোক্‌, ট্রাঙ্ক আর ব্যাগ এ দু'টোতেই ধরা পড়বার আশঙ্কা ছিল পনের আনা; তা' সত্বেও এত সাহস করতে পেরেছিলাম—শুধু স্বাধীন দেশের আবহাওয়া মাস কতক গায়ে লেগেছিল ব'লে।

কিন্তু নেপল্‌স্‌ থেকে বম্বে আসবার পথে যে ক'দিন জাহাজ-বাস করতে হ'য়েছিল, সেই ক'দিনের মধ্যেই ঐ স্বাধীনতার প্রভাব ক্রমে ঘুচে গিয়ে, বম্বে যত নিকট হ'তে লাগল, ততই আমাদের পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক অধীনতার উপসর্গ—সেই ভীরুতা—আমাদের মনকে ক্রমে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌তে লাগল। সব চেয়ে যা' আমাদের মনকে

বেশী কাবু ক'রে ফেলেছিল, সেই দুর্ভাবনাটা হচ্ছে, ভারত উদ্ধার-কল্পে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানরূপ এত বড় গুরুতর ব্যাপারটা ধরা পড়বার এমন দারুণ দুর্ভাগ্যের একমাত্র প্রধান ও প্রথম কারণ হওয়া।

বহুদিন পরে স্বদেশদর্শনের আনন্দটা কাষ্টম্‌স্ হাউসের বিভীষিকার চাপের মধ্যে উপভোগ্য হয় নি। যাই হোক্, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন এক দিন বেলা ১২টার সময় বম্বের জেঠিতে জাহাজ ঠেক্‌ল। তীর্থের পাণ্ডাদের মাসতুত ভাই—হোটেল-ওয়ালাদের এজেণ্টরা ছিনে জেঁাকের মত যাত্রীদের ধরতে লাগল। আমার জুড়ীদারের সঙ্গে এই পরামর্শ স্থির হ'য়েছিল যে, যখন ধরা পড়বার সম্ভাবনা এতই অধিক, তখন দু'জন একসঙ্গে ধরা পড়া কোনমতে সঙ্গত নয়। তাই তিনি আগে কাষ্টম্‌স্ হাউস পার হ'য়ে গিয়ে দূরে অপেক্ষা কর্‌তে লাগলেন। আর আমি দু'জনের বামাল সমেত এক সাহেবী হোটেলের এজেণ্টের সঙ্গে কাষ্টম্‌স্ হাউসে ঢুকলাম। আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কিছু না কিছু ছিল। ব্যাগে ত' ছিলই, অধিকন্তু একটা বালিসের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট।

তখন সব চেয়ে বেশী মুস্কিল হ'য়েছিল—মুখের ভাবটা সহজ ও নির্ভীক রাখা; প্রাণপণ চেষ্টায় তা' কর্‌তে গিয়েই যে বরং আরও বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল, তা-ও বেশ বুঝতে পারছিলাম। একটা অনুকূল ঘটনা তখন না ঘটলে কি কাণ্ডটাই না হ'ত!

কাষ্টমস্ হাউসে ঢুকে দেখি, দু'জন ইতালীয় পাদ্রীর সঙ্গে কাষ্টম্‌স্ অফিসারের বেশ হাস্যজনক ব্যাপার চলছে। পাদ্রীদের ইংরেজী জানা ছিল না; ঐ অফিসারও ইতালীয় ভাষা বোঝেন না। দু'পক্ষই ব'কে যাচ্ছেন, অথচ কেউ কারও বক্তব্য বুঝ্‌তে

পারছেন না। অনেক যাত্রী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, আর প্রাণ খুলে হাসছিলেন। ভাগ্যে হাসি পেয়ে গেছ্‌ল, তাই আমার আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল। এই সুবর্ণ-সুযোগে এগিয়ে গিয়ে কথা ব'লে বুঝলাম, পাদ্রীরা ফরাসী ভাষা বেশ জানেন, তাই অফিসারকে পাদ্রীদের কথা বুঝিয়ে দিলাম। অফিসার নেহাৎ খুসী হ'য়ে পাদ্রীদের ফরম্‌ পূরণ ক'রে দিতে আর ফর্ম্মের লিখিত কোন নিষিদ্ধ বস্তু তাঁদের এক রাশি তল্‌পি-তল্‌পার মধ্যে ছিল কি না, জেনে দিতে অনুরোধ করলেন। তাঁদের ফর্ম্মের সঙ্গে নিজেরও একখানা ফর্ম্ম পূরণ ক'রে দাখিল করলাম। আমার যে কিছুই তদন্ত হ'ল না— সে কথা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু খুব উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ লাভ ক'রে আমিও ধন্য হ'য়ে গেলাম।

এই রকমে কাষ্টম্‌স্‌ হাউসের বালাই কেটে যেতেই তখন টের পেয়েছিলাম, কি দুরন্ত ক্ষিধেটাই পেয়েছিল। আমার জুড়ীদার— কোন এক দাতব্য মুসাফেরখানার খোঁজে চল্‌লেন। কারণ, যত কমে চলতে পারে, তার বেশী এক কপর্দ্দকও খরচ করা না কি ওঁর বিবেকবুদ্ধিসম্মত নয়; অথচ দানগ্রহণটাও যে বিধেয় নয়, তা' তাঁকে বোঝাতে পারিনি। পরন্তু সে রকম ভীষণ জিনিষ নিয়ে আজে-বাজে যায়গায় থাকা নিরাপদ নয়, এই অজুহাতে আমার নিজের বিবেকবুদ্ধিকে ধামা চাপা দিয়ে, বিজয়ী বীরের মত মহা-স্ফূর্ত্তিতে গিয়ে উঠেছিলাম এক বড় হোটেলে। বহুকাল পরে যে পরম ভোজনানন্দ উপভোগ ক'রেছিলাম, তা' আর কি বলব! স্বদেশ যে কত মনোরম, তা' তখনই উপলব্ধি করেছিলাম।

বম্বেতে আমাদের হাতে প্রধান কায ছিল দু'টি; প্রথমটি বাংলার সঙ্গে বম্বের গুপ্ত-সমিতির যোগাযোগ স্থাপন ক'রে একটা নিখিল

ভারতীয় কেন্দ্রসমিতি স্থাপন করা; তার পর তার অধীনে সমস্ত ভারত জুড়ে নানা-স্থানে শাখা-সমিতি গ'ড়ে তোলা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মহারাষ্ট্র গুপ্ত-সমিতি সম্বন্ধে বাংলার গুপ্ত-সমিতির সুরু থেকে আমরা যত সব শুনে আসছিলাম, তা' কত দূর সত্য, নিজে দেখা।

পূর্ব্ব-বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেখানে ঐ সমিতি খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়নি। তার পর কয়েক জন নেতা ও কর্ম্মীর সঙ্গে পরিচিত হ'লাম। তাঁদের কাছে যা' শুনেছিলাম, তার মর্ম্ম যত দূর মনে পড়ছে, তা' এই যে, ভারতের যেখানে যেখানে মারহাট্টাদের বাস সেখানেই না কি বৈপ্লবিকসমিতির শাখা ছিল। তার ওপর কেন্দ্রসমিতি ছিল নাসিক আর পুণাতে। ভারতের অন্য প্রদেশে সমিতি গঠনের জন্য না কি তাঁদের কোন কোন কর্ত্তা চেষ্টা ক'রেছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও আবার তাঁরা বাঙ্গালীর সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করতে রাজী ছিলেন। তবে এ সম্বন্ধে প্রধান কেন্দ্রের কর্ত্তাদের সঙ্গে যে বোঝাপড়া করা দরকার—তাও ব'লেছিলেন। তার পর বম্বে থেকে বাংলায় বৈপ্লবিক কর্ম্মী বা শিক্ষার্থী পাঠাতে আর বাংলার কর্ম্মীকে তাঁদের সমিতিতে নিতে তাঁরা খুবই রাজী হ'লেন।

বম্বে হ'তে কয়েক মাইল দূরে উক্ত সমিতির এক জন ধনী নেতার বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রিত হ'লাম। সেখানে মারহাট্টা সমিতির সংগৃহীত বহুৎ কিছু দেখবার প্রত্যাশা ক'রেছিলাম। বাংলা দেশে যে দিন থেকে গুপ্তসমিতির পত্তন হ'য়েছিল, সেই দিন থেকে অর্থাৎ পাঁচ কি ছ' বছর ধ'রে মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতির বিশাল অনুষ্ঠান-আয়োজনের গাল-ভরা গল্পই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন বাঙ্গালীকে বিপ্লব-বাদীতে পরিণত করবার প্রধান সম্মোহন-মন্ত্র।

যাই হোক, সেই ভদ্রলোকের বাড়ীর নিকটে সন্ধ্যের পর রেলওয়ে-ষ্টেশনে নেমে দেখলাম, জুড়ীগাড়ী নিয়ে কয়েক জন ভদ্রলোক অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁদের বাড়ীতে পৌছে যা' আদর-আপ্যায়ন পেয়েছিলাম, তার ওপর ভূরিভোজনের পারিপাট্য যে রকম ছিল, তা' কোন গুরুঠাকুর বা যে কোন নিখিল ভারতীয় নেতার পক্ষেও লোভনীয় হ'ত। আমাদের পক্ষে ঐ সকল একেবারে অপ্রত্যাশিত হ'য়েছিল। তাই বড় বড় নেতার মত অহং ব্রহ্ম বা অহং ভারত জ্ঞান (যার মানে আমিই ভারত, ভারতই আমি) আমাদের বুকের ভেতরও জেগে উঠেছিল। সেই নেতৃসুলভ তৃপ্তিতে যা' দেখতে গেছলাম, তার নেহাৎ হাস্যজনক অভাব দেখেও দু' একটা বিদ্রূপের মোলায়েম বুলী ঝাড়বার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাও চাপা প'ড়ে গেছল।

সেই সকল ভারতীয় বিপ্লবের ভাবী যুদ্ধ-সম্ভারের একটা নিখুঁত তালিকা এখানে দিতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু নিখুঁত ক'রে দিতে পারলাম না এই জন্য যে, যা ছিল, তা না থাকারই মধ্যে ধ'রে নিয়েছিলাম। সেগুলি তাই বিশেষ ক'রে না দেখে অন্য কাযে মন দিয়েছিলাম। প্রায় দেড় দিন সেখানে ছিলাম, সমস্তক্ষণটা গেছল সেখানকার অতগুলি গুণগ্রাহী ভক্ত শ্রোতাকে আমাদের সঙ্গের যাবতীয় বামাল বিশদ ব্যাখ্যার সহিত দেখিয়ে বুঝিয়ে, এই কথাটি তাঁদের স্বীকার করাতে যে, সমস্ত ভারত উদ্ধারের জন্য যে সকল তোড়-জোড় আর হিকমতের দরকার, তার কিছুই আমরা বাকী রেখে বা ত্রুটি ক'রে আসিনি। ভারতে তাঁরাই ছিলেন আমাদের পারিসের কীর্ত্তি-কাহিনীর সর্ব্বপ্রথম ভক্ত শ্রোতা।

উক্ত অস্ত্র-শস্ত্রের সম্বন্ধে এইমাত্র মনে পড়ছে যে, রিভলবার আর বন্দুক মিশিয়ে পাঁচ ছ'টার বেশী ছিল না। তা-ও ছিল সেকেলে

পুরোতন। ভারতবাসী আমরা পুরোতনের এত বেশী ভক্ত যে, এ বিষয়ে আমাদের জুড়ীদার এখন দুনিয়ায় আর নাই। আবিসিনিয়াও না কি নতুনের ভক্ত হ'য়েছে। এই হিসাবে ঐ পুরোতন অস্ত্রগুলিও ভালই ছিল বলতে হবে। আর—নানা রকমের কার্ত্তুস ছিল, আন্দাজ শ-দুই।

বৈপ্লবিক কাযে যা কিছু দরকার, তা' যখন খুসী হুকুম করলেই আমাদের কাছে তাঁরা তখনই পাবেন, এই চুক্তি ক'রে আর আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যার লিখিত নমুনা কয়েকখানা, তাঁদের বিশেষ অনুরোধ ঠেলতে না পেরেই যেন দিয়ে ফেললাম। তার পর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বম্বে ফিরে এসেছিলাম।

সপ্তাহখানেক পর আমার জুড়ীদার বন্ধু গেলেন পুণা, আর আমি বাংলায় ফিরে আসবার পথে নাসিক এবং নাগপুর সমিতির কায-কর্ম্ম দেখবার জন্য বম্বে ত্যাগ করলাম। নাসিক ষ্টেশনে মারহাট্টা গুপ্ত সমিতির এক জন, একাধারে প্রধান কর্ম্মী ও নেতা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর বাড়ীতে দু' দিন ছিলাম। তাঁর আন্তরিকতা আর অমায়িকতাতে যেমন মুগ্ধ হ'য়েছিলাম, সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক সমিতির কাযকর্ম্মের মোটামুটি একটা সঠিক বিবরণ জানতে পেরে তেমনই, এত কালের সঞ্চিত আশা একদম হতাশায় পরিণত হ'য়েছিল। অগত্যা বুঝে ফেলেছিলাম, আমাদিগকেই অর্থাৎ বাঙ্গালীকেই সমস্ত ভারতে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার ভার নিতে হবে। নাসিকে দু' এক জন চরমপন্থী নেতার সহিত আলাপেরও সৌভাগ্য হ'য়েছিল।

যাই হোক্, সুদূর-ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের সহায় হ'তে পারে, এমন একটা বিশেষ জিনিষ সেখানে দেখেছিলাম—যা' ভারতের অন্য কোন প্রদেশে নাই। মেয়েদের পর্দ্দানসীন বল্লে যা বোঝায় মহ

মধ্যে তা' নেই। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের আলোচনায় কয়েক জন মহিলা আমাদের সঙ্গে প্রায় সমানভাবে যোগ দিতে পেরেছিলেন।

খোঁজ ক'রে যতদূর জেনেছিলাম, তাতে তখন মনে হ'য়েছিল, তথাকথিত ভারত-উদ্ধারের জন্য সেখানেও কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্র তখনও সংগৃহীত হয়নি। আমার সঙ্গে যা' ছিল, তা' দেখে এবং তার কেরামতির বর্ণনা শুনে, তাঁরা এমন ভাব দেখিয়েছিলেন যে, ঐ সকল জিনিষ, ভারত-উদ্ধার যুদ্ধের জন্য না হ'লেও বৈপ্লবিক কাযের জন্যও যে আবশ্যক হ'তে পারে—তা তাঁরা আগে কখনও যেন উপলব্ধি করেন নি। অথচ এ ধারণাও তাঁদের মধ্যে ছিল না যে, এ দেশে বিপ্লব ঘটাতে হ'লে অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা তা হবে না অর্থাৎ violent method এখানে খাটবে না, কেবল আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারাই বিপ্লব সিদ্ধ হবে; কিংবা এও ভাবতে পারেন নি যে, আপাততঃ দশ বিশ বছর ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতির সেই হেতু অস্ত্র-শস্ত্রের আবশ্যক হবে না, যেহেতু, বিপ্লবের যে অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার আবশ্যক হয়, সে অবস্থায় ভারত আসেনি এবং আসতে যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

অবশ্য বহুকাল যাবৎ বিপ্লববাদ প্রচার তাঁরা করছিলেন, আর লোকমতও বিপ্লবের উপযোগী ক'রে তাঁরা গ'ড়ে তুলেছিলেন ব'লে ব'লেছিলেন। পরন্তু সেখানকার সব দেখে শুনে যা' বুঝেছিলাম, তার সোজা কথা যতদূর মনে প'ড়ছে, তা' এই যে, ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগানর নাম ছিল—বিপ্লববাদ প্রচার। অন্য দিকে অতীত গৌরবে গৌরব অনুভব করতে শেখান, আর হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামী বাড়ানর নাম ছিল স্বদেশ-প্রেম জাগান।

বস্তুতঃ এখানে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, বাংলাতে এই দু'টি জিনিষের কোন রকম অভাব বা অন্যথা ছিল। বরং সে-কাল থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তা' বেড়েই চলেছে। দুঃখ এই, যা' কিছু অকল্যাণকর তার অনুকূল কোন মতবাদের যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশে কখনও আসে নি। উক্ত দু'টি মতের প্রতিক্রিয়া কখনও আসবে ব'লে এখনও কোন লক্ষণ দেখা দেয় নি।

যাই হোক, এই বিপ্লববাদ আর স্বদেশপ্রেম প্রচারের জন্য সেখানে যে সব নতুন সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে ছিল, স্বদেশী গান, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের ইতিবৃত্ত, মহারাজ শিবাজী, মহাত্মা রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষগণের আর ম্যাজিনী, গ্যারিবাল্‌দি প্রভৃতি বিদেশীয় মহাপুরুষদের কীর্ত্তি-কাহিনী, সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি যে, ঐ সকলের কতকগুলি আমি উপহার-স্বরূপ পেয়েছিলাম। আরও পেয়েছিলাম ভারতমাতার এক অতি বিকট রঙ্গীন প্রতিকৃতি এবং চাপেকারদের ফটো।

মোট কথা, মহারাষ্ট্রীয় গুপ্তসমিতির আসল ভাবটা ছিল ভারতে হিন্দুর প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে মারহাট্টা প্রাধান্য পুনঃপ্রবর্ত্তনের বাসনা ছিল ব'লে তখন বুঝতে পারিনি।

নাসিক থেকে বিদায় নিয়ে নাগপুরে দু'দিন ছিলাম। মহারাষ্ট্রীয় ছাত্রদের মধ্যেই বেশ আন্তরিকতা ও বৈপ্লবিক ভাবের উচ্ছ্বাস সেখানে দেখলাম। দু'এক জন বড় নেতার সঙ্গে অল্প-স্বল্প আলাপও হয়েছিল। বুঝেছিলাম, কয়েক দিন মাত্র আগে সুরাট কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে অরবিন্দবাবু নাগপুরে যে বক্তৃতা '[illegible] তার প্রভাবে নাগপুরে শিক্ষিত মহলের রাষ্ট্রনৈতিক

মতটা একটু উগ্র হয়ে উঠেছিল। সে বক্তৃতায় বিশেষ ক'রে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী, অর্থাৎ কি না ভারত ভারতবাসীরই জন্য, আর ইংরেজের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক না রাখা। বিপ্লববাদের সুরুতে বাংলায় যেমন বৈপ্লবিক গুরু ব'লে মারহাট্টাদের ওপর আমাদের একটা বড় রকমের ধারণা ছিল, নাগপুরে বিপ্লব-বাদী আর চরমপন্থী যে কজন ছিলেন, তাঁদের সেই রকম বাঙ্গালী-দের ওপর একটা ভারী আশাপ্রদ ধারণা জন্মেছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে সাধারণ হিন্দু দেবদেবীর পরিবর্ত্তে হনুমানের প্রতিমূর্ত্তির পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত। বিপ্লবপন্থীদের এক কুস্তির আখড়া দেখ্‌তে গিয়ে হনুমান-মূর্ত্তি-পূজা, তাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম, আর তার প্রসাদ গ্রহণরূপ মুস্কিল যখন আমার ওপর এসে পড়েছিল, তখন সাধ্যমত আমার মনোভাব চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও, আমার বিদ্রোহী ভাব লক্ষ্য ক'রে, উপস্থিত সকলে বোধ হয় আমার ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। তাই তাঁরা হয় ত আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারেন নি। হনুমানের প্রতি আমার অভক্তির জন্য আমার পরিচয়-পত্রের (introduction letter) ওপরও তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। আমাদের ভক্তির দেশ কি না! আমিও তাই আমার ঝুলির মধ্যে যে মূর্ত্তিমান বিপ্লব ছিল, তা তাঁদের দেখাবার সাধ মেটাতে পারি নি।

যাই হোক্, বৈপ্লবিক ব্যাপার শেখ্‌বার জন্য তাঁদের কয়েক জনকে বাংলায় পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে নাগপুর ত্যাগ করেছিলাম।

পরের দিন মেদিনীপুরে পৌঁছে, পেছনে টিক্‌টিকি লেগেছে কি না, তা জানবার যে সকল কায়দা পারিসে শিখে এসেছিলাম, দু'।তন দিন যাবৎ তা খাটিয়ে বুঝেছিলাম, তখনও কোন রকম সন্দেহ কেউ করে নি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাংলায় বোমার সূচনা

কয়েক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর বাংলার লাট ফ্রেজার "সাহেবের" গাড়ী বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল—আমারই বাড়ীর কাছে। তাই বম্বেতে এই খবর পেয়ে একটু বিব্রত হয়েছিলাম। মেদিনীপুরের বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ শুন্‌লাম। বারীণের এও একটা honest attempt। "রণনীতির" ধারা অনুযায়ী, জান্রেলের না কি রণক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘটনাস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ; তাই বুঝি বারীন খড়্গপুরে থেকে শ্রীমান্ বিভূতীকে খড়্গপুরের প্রায় দশ কি বার মাইল দূরে নারায়ণ গড় থানার অন্তর্গত একটা নির্জ্জন স্থানে রেল লাইনের তলায় কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পুতে দিয়ে আস্‌তে পাঠিয়েছিল। লাট "সাহেবের" গাড়ীটা না কি জখম হয়েছিল। যাই হোক, এই অপরাধের অপরাধীকে ধ'রে দিতে পারলে সরকার থেকে এক হাজার আর বি, এন, রেল কোম্পানী থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে এ ঘটনা ঘট্‌তে পারে, অথবা বিপ্লববাদী ব'লে কোন জীবের অস্তিত্ব যে বাংলা দেশে থাক্‌তে পারে, সে ধারণা তখন বেঙ্গল পুলিসের গজায় নি। তার প্রমাণ, তাঁরা নাগপুরী কুলীদের ভেতর থেকে, কি রকম ক'রে এক দল আসামী বে'র ক'রে আইন-কানুন মোতাবেক তাদের অপরাধ সাব্যস্ত ক'রে ফেলেছিলেন।

উক্ত ৬ই ডিসেম্বরের পরের দিন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছিল। তাতে মধ্যপন্থী আর চরমপন্থীদের যে রকম উৎকট ঝগড়া-ঝাটি বেধেছিল এবং চরমপন্থীদের পৃথক কনফারেন্সে ইংরেজ সরকারকে যে রকম, বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে না কি মেদিনীপুরের পুলিস কল্‌কাতায় আর মেদিনীপুরে গুপ্তসমিতির গন্ধ পেয়েছিল ব'লে, ছ' সাত মাস পরে, মেদিনীপুর বোমার মামলার এজাহারে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু গন্ধ পেলে এই ঘটনার অনেক দিন পরে উক্ত নির্দ্দোষ কুলী বেচারাদের অকারণ দণ্ড দিয়ে, অক্ষয় কলঙ্কের কালীমা ব্রিটিশ জাষ্টিসের গায়ে আর এমন করে লেপে দিত না। পরে কিন্তু ঐ কুলীদের নির্দ্দোষ ব'লে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সেই ডিসেম্বরের ২৩শে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট "এলেন (Mr Allen) সাহেবকে" অকারণে কে পিস্তল দিয়ে গুলী করেছিল। যদিও না কি বিপ্লববাদীদের প্রায় সবগুলি দল এই কীর্ত্তির অধিকারী ব'লে নিজেদের মধ্যে দাবী করেছিল, তথাপি ঐ জন্য কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ড পায় নি।

এই ঘটনার সপ্তাহখানিকের মধ্যে সুরাট কংগ্রেসে যে বিলেতী কায়দায় তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়েছিল, তাতে স্পষ্টই লক্ষিত হবার কথা ছিল—বাঙ্গালী এক নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও খড়্গপুরের উক্ত কুলীদের দণ্ড দেওয়াতে, এইটে প্রমাণিত হয় যে, পুলিস তখনও বৈপ্লবিক সমিতির খোঁজ পায় নি, এমন কি, সন্দেহও করে নি।

এই সব দেখে শুনে নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায় এসেই—দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা করলাম আর শুনলাম, কলকাতায় বিপ্লববাদীরা অনেক ছোট ছোট দলে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। তার মধ্যে

চার পাঁচটা দল প্রধান ছিল। 'ক'-বাবু তখন কলকাতায় ছিলেন না। কাযেই বারীনের কাছে খবর দিতে—দেবব্রতবাবুকে অনুরোধ ক'রে অন্য এক জন বড় নেতার খোঁজে গেলাম। এঁকে পূর্ব্বে 'গ'-বাবু ব'লে উল্লেখ করেছি। ইনি 'ক'-বাবুর বিশেষ বন্ধু ব'লেই সে যাবৎ জানতাম। এঁরই উৎসাহ এবং সহানুভূতিতে আর অনেকটা এঁরই অভিপ্রায়মত, দেশ উদ্ধারের তথাকথিত একটা পাকা পন্থার সন্ধান করতে বিদেশে গেছলাম। ইনি আর এক জন নেতার সঙ্গে থাকতেন। যাই হোক, প্রথমেই অত্যন্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে এঁরা বলেছিলেন, আমি যেন বারীনের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না করি অর্থাৎ বারীনের দলের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্কও না রাখি কেন রাখব না, তার একটা খুব সঙ্গত কারণ কিন্তু তাঁরা তখন আমায় বাৎলে দেন নি। এইমাত্র বলেছিলেন যে, 'ক'-বাবু বারীনের কথা ছাড়া আর কারও কথা কানে তোলেন না। আর অন্যে যে suggestion দেয়, ঠিক্ তার উল্‌টো করাই বারীনের স্বভাব। বিশেষতঃ বারীন না কি গুপ্ত সমিতির বিশেষ গোপনীয় কাযগুলা এমন ভাবে তখন করছিল, যেন তা সাধারণে প্রকাশ করাই তার উদ্দেশ্য। কাযেই সে অবিলম্বে পুলিসের খপ্পরে যাবেই। আর তার সঙ্গে যারা যোগ দেবে' তারাও সেই খপ্পরে যেতে বাধ্য। আসল কথা গুপ্ত সমিতির কাযে 'ক'-বাবুর ওপর তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু বিলেত যাবার আগে 'ক'-বাবুর প্রতি কেন যে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। তখন 'গ'-বাবুকেই অধিকতর যোগ্য নেতা ব'লে বুঝেছিলাম। অথচ বিলেত থেকে ফিরে এসে সে কথা একেবারে ভুলে গেছলাম। এর বিশেষ কারণ

এই ছিল যে শিষ্য বা চেলাদের যখন নিজেকে বড় বলে জাহির করবার সাধ গজায়, তখন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গুরুর হরেক রকম অতিরঞ্জিত মহিমা কীর্ত্তন করলেই অনেক স্থলে সে সাধ পূর্ণ হয়। আমারও দশা তাই হয়েছিল। পারিসে 'ক'-বাবুকে শুধু ভারতের, একমাত্র আদর্শ নেতা ব'লে ক্ষান্ত হতাম না, সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ ব'লে, বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অদ্বিতীয় ব'লেও, জাহির করতাম; আর লোকের কাছে আমার কদর বেড়ে যেত। সেই লোকগুলি অবশ্য ভারতবাসী।

তাঁর পর বিদেশ থেকে 'ক'-বাবুর যত কাছ পানে আস্‌তে লাগলাম, বেহুঁসে ততই ভক্তিটাও ক্রমে বেড়ে আস্‌তে লাগল। বিদেশ যাবার আগে, কুইক্‌ষোটসুলভ স্বভাববিশিষ্ট ব'লে, বারীনের প্রতিও যে একটা বিদ্রূপের ভাব জেগে উঠেছিল, বিদেশ থেকে দেশে ফিরে, তাও ভুলে গেছলাম। তার কারণ কলকাতায় যতগুলি বৈপ্লবিক দল ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র বারীনই, ভালই হোক বা মন্দই হোক, বিশেষ কিছু বৈপ্লবিক কায করবার চেষ্টা (যা honest attempt ব'লে অভিহিত হয়েছিল) কচ্ছিল; দেশে ফিরে তা দেখে মনে হ'য়েছিল, যাই হোক, বারীন ত তবু কিছু কর্‌ছে, অন্য সকলে ত খালি বুকনি দিয়েই ক্ষান্ত আছে। তা' ছাড়া পারিসে থাক্‌তে বারীনের এক চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে অনেক কিছু ছিল; সব মনে নেই, খালি এইটে মনে পড়ছে যে, আমি ফিরে এলে "কায" (action) আরম্ভ কর্‌তে যত টাকা চাই, তা' বারীন দেবে। আমি ফিরে এসে বুঝেছিলাম, আমার পারিসে আঁটা মতলব কাযে পরিণত কর্‌তে হ'লে আমার এক জন "গৌরীসেন" দরকার, অথচ আমি বিলেত যাবার আগে নিজের এক কপর্দ্দকও

থাকতে, অন্যের কাছে হাত পাত্‌ব না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছিলাম। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় ভারত জুড়ে বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিতে ছেয়ে ফেল্‌তে বিপুল অর্থের ছিল প্রয়োজন। কাযেই রূপেয়া দেনেওয়ালা চাই-ই। বারীন যে টাকার কথা লিখেছিল, তা' যে সবটাই ফাঁকী, তা 'ক'-বাবু আর বারীনের প্রতি নতুন ক'রে গজান বাড়াবাড়ি ভক্তির চাপে ধরতে পারি নি।

আরও একটা কথা, মনে মনে একটা বিপুল আশা পুষেছিলাম; বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতিকে পূর্ণ সাফল্যে মণ্ডিত করব ব'লে যে সকল হিক্‌মৎ শিখে এসেছিলাম, তা নেতাদের—বিশেষতঃ 'ক'-বাবু আর তাঁর বিশেষ কর্ম্মী বারীনকে দেখালেই এমন খুসী হ'য়ে যাবেন যে, আমার আশা পূর্ণ করতে তাঁদের অদেয় কিছুই থাক্‌বে না। সেই জন্যই কলকাতায় এসেই আগে 'ক'-বাবু অথবা বারীনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছিলাম।

কিন্তু অন্য দু'জন বড় নেতার নিষেধ শুনে বারীনের সঙ্গে তখন-কার মত দেখা না করাই স্থির করলাম। তখুনি দেবব্রত বাবুকে নিষেধ করতে গিয়ে কিন্তু শুনলাম, বারীন পরদিন সকালে দেখা করবে বলেছে। পরদিন সকালে বাড়ী থেকে সরে পড়্‌বার আগেই বারীন এসে হাজির।

দেশ থেকে আমার অনুপস্থিতির দেড় বছর যাবৎ, বারীন কত শত কায করেছিল, তার বিবরণ দিতে লাগল। মানিকতলার মুরারিপুকুর গার্ডেনে প্রকাণ্ড এক বোমার কারখানা খোলা হয়েছে, তাতে সব বোমার খোল ঢালাই হচ্ছে। দেওঘরে, না ঐ রকম কোন একটা যায়গায়ও বোমার কারখানা খোলা হ'য়েছিল ইত্যাদি আরও অনেক কিছু শুনেছিলাম।

পূর্ব্বদিন উক্ত নেতাদের কাছেও শুনেছিলাম, বারীনের দ্বারা সে যাবৎ বিদেশীকে ইহলোক হতে সরাবার ও ডাকাতি করবার প্রায় শতাধিক সঙ্কল্প ও চেষ্টা হয়েছে; সবই পূর্ব্বোক্ত honest attempt এ পরিণত হ'য়েছিল। নিজেরও কাযের হিসেব দিয়ে বারীনকে খুসী করতে, কম চেষ্টা করেছিলাম ব'লে মনে হয় না। সে খুব খুসী হ'য়েছিল ব'লে ত বুঝতে পারি নি। য়ুরোপীয় ধরণে বৈপ্লবিক দল গঠনের কথাতেও তার আগ্রহ একটুও দেখতে না পেয়ে বড় আশ্চর্য্য বোধ হ'য়েছিল।

তাঁর পর আমি সপ্তাহখানেক ধ'রে অনেক দলের নেতাদের মতামত অনুসন্ধান ক'রে বুঝলাম, সবাই নিজেদের দলগঠন প্রণালীতে কোন রকম বিশেষ পরিবর্ত্তন করতে নারাজ। এটা আমার পক্ষে বড়ই হতাশার কারণ হ'য়েছিল। এটা তখন জানতাম না যে, এ দেশের অতি বড় নেতা হ'তে সুরু ক'রে গেঁয়ে মোড়ল পর্য্যন্ত সকলেই অন্যের প্রদর্শিত কোন নতুন মত বা পন্থা, যতই যুক্তিসঙ্গত হোক, অথবা হাতে কাযে ক'রে ফল দেখিয়ে দিলেও, তা নিতে একেবারে অনভ্যস্ত।

যাই হোক্, এই সব মুস্কিলে পড়েই পূর্ব্বোক্ত 'গ'বাবুর অভিমত অনুযায়ী পৃথক্‌ভাবে দল গঠন করতে সঙ্কল্প করলাম। বারীন খুব কাযের লোক ব'লে তখন জানলেও, কোন্ চেষ্টা সফল কি ক'রে করতে হয়, তা' সে কিছুতেই জানতে চাইত না, অথবা তার সকল চেষ্টা আখেরে ব্যর্থ হয় ভেবে অগত্যা 'ক'-বাবু ও বারীনকে ছেড়ে দিতে মনস্থ করেছিলাম। অবশেষে সকল দল থেকে কর্ম্মী ভাঙ্গিয়ে নিয়ে একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমিতি গঠন করা স্থির হ'ল। তদনুযায়ী 'গ'-বাবু এক জন ধনী নেতার হাতে আমায় তুলে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চ'লে গেলেন।

সেই অতিবড় ধনী মশায় তখন দানশীলতার পরাকাষ্ঠা হঠাৎ দেখিয়ে ফেলেছিলেন, তাই বাংলা দেশে এক জন বড় স্বদেশপ্রেমিক নেতা ব'লে ষোড়শোপচারে পূজা পাচ্ছিলেন। তাঁকে আমার সমস্ত মতলব খুলে ব'লে ফেলেছিলাম। বেশ বুঝেছিলাম, তা' শুনে তিনি বিলক্ষণ ভয় পেলেন। প্রায় পনের দিন তাঁর কাছে যাওয়া আসা করেছি। অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়েছিলেন, বচনও দিয়েছিলেন অনেক। তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল 'ক'-বাবুর নিন্দা। অথচ আসল কাযের জন্য টাকাকড়ি দেবার নামটিও করতেন না। তখন বুঝলাম, ইনি সত্যই বারীনের বর্ণিত আরামকুর্সীতে ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেনেওলা ভারত-উদ্ধারকারী অকালকুষ্মাণ্ড নেতা।

এই ব্যাপারের পর সদ্য বিলেতে অর্জ্জিত আমার উদ্যম, উৎসাহ, কর্ম্মপ্রবণতা আদি সবই আরও ওধাও হ'য়ে গেছল। এর পরে ধার-কর্জ্জ করেও অত টাকার যোগাড় করতে না পেরে, অগত্যা নতুন দল গড়বার খেয়াল তখনকার মত ত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়েছিলাম।

এই রকম বৃথা কাযে আর তারপর কলকাতায় থাকার ছুতোস্বরূপ একটা ব্যবসার সাজগোজ ক'রে নিতে প্রায় এক মাস কেটে গেল। ইতি মধ্যে 'ক'-বাবুও কলকাতায় এসে পড়লেন। দেখা করতে গেছলাম ভক্তি উপহার দিতে। তিনিই ছিলেন শেষ আশার স্থল; দুর্ভাগ্য এই যে, অতি কষ্টে দু' চারটি মাত্র কথার উত্তর দিয়ে বিদায় দিলেন; দেখে তখন অবাক্ হ'য়ে গেলাম। অবিনাশ ভায়াকে আড়ালে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম, তিনি ধ্যান-ধারণা নিয়েই না কি সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন, কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না।

যাই হোক, আমি কি করব, জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন—বারীনের কাছে যেতে। অগত্যা বারীনের দলে আবার যোগ দেওয়া

ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বারীন কিন্তু এর আগেই কয়েকবার আমার বাড়ী এসেছিল, আর আমার বিলেতে অর্জ্জিত "বিদ্যে চটপট মেরে নিতে" স্বনাম-ধন্য উল্লাস ভায়াকেও পাঠিয়েছিল। য়ুরোপ থেকে বৈপ্লবিক কাযের জন্য নিতান্ত আবশ্যক যত সব বই আর কাগজপত্র এনেছিলাম, সে সমস্তই বারীন ক্রমে আদায় ক'রে নিয়েছিল। আমার খুবই আশা হ'য়েছিল, বারীন ঐ সকল প'ড়ে পাশ্চাত্য প্রথায় তা'র গুপ্তসমিতিকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলবে। কিন্তু তা' হ'ল না। একমাত্র বোমা তৈরীর হিকমত ব্যতীত বাকী যত কিছু, এমন কি, বৈপ্লবিক দল গঠনের কায়দা-কানুন পর্য্যন্ত এ দেশের পক্ষে একেবারে নিরর্থক, শুধু তাই নয়, অনিষ্টকর ব'লেই শিষ্যমহলে জাহির ক'রেছিল। তা'র মতে ও সব জড়বাদীদের দেশেই খাটে। এ দেশ ধর্ম্মের দেশ, এখানে কিছুতেই পাশ্চাত্য কোন কিছু খাটবে না। আমাদের দেশে এবংবিধ dogmaর কাছে যুক্তিতর্ক খাটে না। অথচ বিপ্লবের সমস্ত ব্যাপারটাই বিদেশীয় অনুকরণ।

তবে আমি বারীনের গোঁড়া ভক্ত হ'তে পারলে এই বিলাতী প্রণালীটা নিলেও সে নিতে পারত। ভক্তের মত ভক্ত সাজতে পারলে, ব্যক্তি বিশেষকে, এমন কি suggestion-phobia গ্রস্ত গুরুকেও যে স্বমতে আনা যায় বা তাকে দিয়ে আবশ্যক মত কোন কিছু করিয়ে নেয়া যেতে পারে, আমার সে জ্ঞান তখনও গজায় নি।

সে যাই হোক আমার কাছে খালি বোমার বিদ্যেটা মেরে নেবার জন্য যে বারীন একটু বেশী রকম ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিল, তার কারণ—বোমা ফাটাতে পারলে হাজার হাজার টাকা পাবার অঙ্গীকার দু'তিন বছর যাবৎ পেয়ে আসছিল, কিন্তু

বোমাও ফাটে না, টাকাও আসে না। অথচ টাকার অভাবটা হ'য়েছিল বড় বেশী।

যে সময়ের কথা লিখছি (১৯০৮) তার মাসকতক আগে শ্রীমান্ উল্লাসকর প্রেসিডেন্সী কলেজে "সাহেব" ঠেঙ্গিয়ে কোন গতিকে বারীনের হাতে এসে পড়েছিল। আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনেই, গান গেয়ে হেসে-খেলে নেহাৎ আপন জন হ'য়ে গেছল। যাই হোক্, আমার মনে হয়, উল্লাসের মত এত সরল, মহৎ, কপটতার লেশমাত্রহীন, ভাবপ্রবণ যুবককে বৈপ্লবিক তাণ্ডবলীলার কর্ম্মী করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার ও নির্ব্বুদ্ধিতার কায হ'য়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উল্লাস ভায়ার সঙ্গে আলাপের দু'এক দিন পরে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অদ্ভুতবেশে দেখা দিলেন। তাঁর শ্রীচরণ দু'খানি ছিল পাদুকাহীন। শ্রীঅঙ্গের অধোভাগে ছিল, মুক্তকচ্ছ ক'রে পরা গৈরিক বাস; তদূর্দ্ধে গৈরিক পাঞ্জাবী, আর সযত্নে মুণ্ডিত-মস্তকে ছিল টিকী। দাড়ী-গোঁফ যে ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। এহেন ভণ্ডামীর ঠাট দেখে ভক্তি উথলে না উঠ্‌লেও, (সত্য বলতে কি, বরং ভয়ঙ্কর বিট্‌কেল ব'লে মনে হ'লেও), একটুখানি আলাপের পর মনে করতে বাধ্য হ'য়েছিলাম যে, বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতির সভ্য হবার মানুষ যদি কেউ থাকে ত এই ইনিই তাদের মধ্যে উপযুক্ততম। আলাপের পর দেখেছিলাম, অন্য বিষয়ে যেমন, ভোজনেও ওঁর tolerationএর অন্ত ছিল না। অহিন্দুর স্পৃষ্ট, প্যাঁজ দিয়ে রাঁধা মাছ-মাংস, কিছুতেই তাঁর অরুচি বলতে শুনিনি। উপেন ১৯০৭ সালের গোড়াতে বৈপ্লবিক ব্যাপারে যোগ দিয়েছিল।

কলকাতায় তখন যে ক'টা বৈপ্লবিক দল ছিল, তার কোনটাই কাযের কোন ধার ধারত না। বিপ্লব-সম্বন্ধীয় কাযের মধ্যে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বা "আনন্দ মঠের প্রথায় terroristic কায করবার যাকে বলে ভয়ঙ্কর চেষ্টা, তা বারীনেরই ছিল। দেশে বিপ্লব সংঘটিত করতে হ'লে terroristic কায ছাড়া অবশ্যকরণীয় সত্ত্ব আবশ্যক অন্য কায যে থাকতে পারে, তা হয়ত বারীন মনে করত না, কাযেই বোধ হয়, 'ক'-বাবুও করতেন না; অথবা করণীয় ব'লে যা' কিছু মনে করতেন, তা কেবল স্বদেশী সনাতন আধ্যাত্মিক প্রথায় সুসম্পন্ন হবে মনে করেই মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীতে কর্ম্মীদের ধর্ম্মের সাধন-ভজন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার গুরু নিযুক্ত হ'য়েছিলেন উপেন ভায়া। এই ব্যবস্থা কতকটা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ compulsory ছিল।

যাই হোক terroristic কর্ম্মের চেষ্টা থাকলেও তা' সফল করবার মত ইচ্ছা যে বারীনের খুব ছিল, তার প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায়নি। Honest attempt তক্ করবার অধিকার আমাদের আছে তার পর "মা ফলেষু কদাচন"। গুপ্ত সমিতির অতি গুহ্য কাযের জন্য মুরারিপুকুরের যে বাগানবাড়ী মনোনীত করা হ'য়েছিল, (১৯০৭ সালের মাঝামাঝি) তা এমন স্থানে অবস্থিত ছিল, যেখানে নতুন লোক কেউ গেলে-এলে, নিকটবর্ত্তী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না। তা' ছাড়া সেখানে বসতি এমন বিরল যে, ঐ বাগানে কে কি করছে না করছে, স্থানীয় লোকের তা জানবার কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু আরও অসুবিধা অনেক সেখানে ছিল। তার পর যে সকল জিনিষ সেখানে তয়ের করবার চেষ্টা হচ্ছিল, সে সমস্তই অকারণ কষ্ট ব'লে তখন বিবেচিত হ'য়েছিল।

এই সকল কারণে সহরের যেখানে ঘন বসতি, সেইখানে একটা সুবিধামত বাড়ীতে বোমা তৈরীর আড্ডা বা স্কুল করতে বারীনকে অনেক কষ্টে রাজী করা হ'ল।

বাড়ী খোঁজা হ'তে লাগল। ইতি মধ্যে চন্দননগরের মেয়রকে মারবার জন্য একটা বোমার ফরমায়েস বারীন ক'রে পাঠাল। প্রথমতঃ আমি কিছুতেই তখন বুঝতে পারি নি যে, নতুন ছাঁচে আমাদের সমিতিকে রীতিমত গড়বার, terroristic কাযে যথেষ্ট লোককে সুচারুরূপে শিক্ষা দেবার, সমস্ত ভারতে ঐরূপ শিক্ষিত লোকের দ্বারা গুপ্ত সমিতি গঠন করবার এবং সকল প্রদেশে একসঙ্গে terroristic work করবার মত সামর্থ্য লাভ করবার আগে, কেন বৈপ্লবিক হত্যা করবার খেয়াল 'ক'-বাবুর মত মানুষের মাথায় জেগে উঠেছিল। এখন মনে হচ্ছে, ভারতের মত ধর্ম্মের দেশে ঐ সব ব্যাপার যে একেবারে অসম্ভব, সে জ্ঞান তখনও কর্ত্তাদের গজায় নি। গজালে নিশ্চয় তখন তাঁরা বোমা-ব্যাধিগ্রস্ত হতেন না। যাই হোক, মাসকতক পরে কিন্তু অনেকের সে জ্ঞান বিলক্ষণরূপে হ'য়েছিল জেলে।

দ্বিতীয়তঃ, এত লোক থাকতে বেচারা ফরাসী মেয়র মঃ তার্দিভিলের ওপর পছন্দটা গিয়ে পড়ল কেন? মনে হচ্ছে, তখন এর প্রতিবাদ করেছিলাম। কারণটা যা' শুনেছিলাম তা বিশেষ কিছু নয়;*

---

* চন্দন নগরে বিনা পাশে যে কেউ না কি রাইফেল, পিস্তল আদি যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে পারত। এ অধিকার হতে বঞ্চিত করবার জন্য ঐ সময়ে, ফরাসী মেয়র—মঃ তার্দিভিল এক আইন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁকে দণ্ড দেবার জন্য বোমার ব্যবস্থা হয়ে ছিল। এ বোমা যখন তৈরী হয় তখন অন্য অনেকের সঙ্গে সেখানে নরেন গোসাঁই'ও ছিল।

তবু কেন ঐ হত্যা-ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম, তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। সত্ত পারিসে অর্জ্জিত বিদ্যেটা জাহির করবার প্রবৃত্তি এমন উৎকট হ'য়ে উঠেছিল যে, তার প্রকোপে অন্য সব আদর্শের ধারণা অর্থাৎ বিপ্লববাদের উদ্দেশ্য প্রচার, নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদির খেয়াল সব তলিয়ে গেছল। তার পর 'ক'-বাবুর ওপর অন্ধ বিশ্বাস; অত বড় জ্ঞানী লোক যখন আদেশ দিয়েছেন, তখন এটা উচিত না হ'য়ে যায় না। পরে এই কাষটার অন্যায্যতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করতে গিয়ে শুনেছিলাম, 'ক'-বাবুর কাছে "বাণী" এসেছিল। সেই "বাণী" বারীন জারী করেছিল। এই "বাণীর" কথা পরে বলব।

যাই হোক, আমার তখন খুব জ্বর, আর তখনও বোমা তৈরীর তোড়জোড় কিছুই জোগাড় করা হয়নি, অথচ বোমা চাই সন্ধ্যের আগে। যে মাল-মসলা মুরারিপুকুরে ছিল আর, ডি, ওয়াল্ডীর দোকানে যা পাওয়া গেল, তাতেই একটা বোমা তৈরী হ'ল। বোমা ফেটেও ফাটল না; কিন্তু এর ফল হ'ল উল্টো।

নারায়ণগড়ে লাট সাহেবের গাড়ীর তলায় যে বোমা ফেটেছিল, তার তদন্ত ও আদালতে তার বিচার বিভ্রাট ঐ সময়ের কিছু আগে খতম হয়ে গেছল। আগেই লিখেছি, জনকত নাগপুরী কুলী, অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিল। ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা ঐ বেঙ্গল পুলিসের নির্দ্ধারণে সন্দিহান হয়ে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে নামক এক জন ভারতীয় পুলিস বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টরকে বিশেষ-ভাবে তদন্তের জন্য, বোধ হয়, এই চন্দননগরের ঘটনার পরেই পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, শশীবাবু বোধ হয়, চরমপন্থী নেতাদের ওপরই আগে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। রজনী মিত্র কি ঐরকম নামের

এক জনকে, দেশের দুঃখে তার বিগলিতপ্রাণটা, দেশের জন্ত উৎসর্গ করতে 'ক'-বাবুর কাছে না কি পাঠান হয়েছিল। তিনি মুরারিপুকুরে বারীনের কাছে তাকে পাঠান ;

এই সময় কলকাতায় যে কটা দল ছিল, প্রায় সব দলেরই কর্ম্মী অপেক্ষা নেতা-উপনেতার সংখ্যা অধিক ছিল। তাই কর্ম্মীর জন্ত সব দলই হ্যাংলা হ'য়েছিল। বারীনের দলেরও সেই দশা। বারীন উক্ত রজনীকে পেয়ে লুফে নিয়েছিল। অর্থাৎ "আনন্দমঠে'র সত্যানন্দী কায়দায়, সম্মোহিত করবার জন্ত কারখানা দেখাতে লেগে গেল,—কোথায় বোমা মজুত ছিল, কোথায় রিভলবার, কোঁথায় রাইফেল, কোথায় বোমার খোল ঢালাই হয় আর কোথায় সিদ্ধি-লাভের জন্ত নাক টিপে সাধনা করা হয়। সে কিন্তু আর দ্বিতীয়বার বাগানে দেখা দেয় নি। তার পর থেকে যারা বাগানে যাতায়াত করেছিল, তাদের পেছনে বা বাগানের মানুষরা যেখানে যেখানে যেত, সেইখানেই পুলিসের চর বিরাজমান থাকত।

অনেক চেষ্টার পর ভবানীপুরে একটি বাড়ী পাওয়া গেল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের বোধ হয় মার্চ্চের মাঝামাঝি বোমা শেখাবার স্কুল হ'ল সেইখানে। চার পাঁচজন ছাত্র প্রথম জুটেছিল। তার মধ্যে এক জন কানাইলাল। তার সঙ্গে এইখানে প্রথম আলাপ হয়। মুখে কথা ছিল না বল্লেই হয়, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান্ অথচ ম্যালেরিয়া রোগী। আর ছিল শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ রায়, যে পোর্টব্লেয়ারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা ক'রেছিল এবং পূর্ব্ব-উল্লিখিত নিরাপদ ওরফে নির্ম্মল রায়। সেও নাকি এখন আর ইহলোকে নেই। এখানে চাকর-বাকর রাখা হ'ত না। সকলে পালা ক'রে রান্নাবান্নার কায সেরে নিত। আমি দু'একদিন কখনও কখনও ঐ আড্ডাতে থেকে যেতাম।

সকালে অদ্ভুত রকমের—হালুয়া নামের অপভ্রংশ খানিকটা—দিয়ে জলযোগ হ'ত। দু'বেলা ভাতের যা' ব্যবস্থা, তার চেয়ে জেলখানার সাধারণ কয়েদীদের যা' খেতে দেয়, তা অনেক ভাল বলতে হবে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যা', তা' হচ্ছে থালার প্রতিভূ মাটীর সান্‌কি; খাওয়া হ'য়ে গেলে সব ক'খানা সান্‌কি তুলে নিয়ে পায়খানা আর চৌবাচ্চার মাঝখানকার সংকীর্ণ স্থানটাতে ফেলে রাখা হ'ত। তরকারীর তেল মেখে সান্‌কিগুলো এমনি হয়ে থাকত যে, জলে ধুতে গেলে পরিষ্কার ত হ'তই না, অধিকন্তু তেলে-জলে মিলে-মিশে বিতীকিশ্রী হ'য়ে যেত। তাই একখানি ন্যাকড়া রাখা হ'য়েছিল, যা' দিয়ে দিন দিন ঐ সান্‌কিগুলো মোছা হ'ত। তবে একটা বিশেষ সুবিধে এই ছিল যে, সান্‌কিগুলোর রং ছিল মিশ্‌মিশে কালো। যা-ই হোক, এই প্রথা মুরারিপুকুর বাগান থেকে আমদানী করা হ'য়েছিল। বিছানা ছিল কত কালের তেল চিটা মাখান বালিস আর মাদুর।

বোমা দিয়ে মানুষ মারবার কেরদানী শেখাবার জন্য বারীনের নিকট দু' এক জন যুবক চেয়েছিলাম। প্রথমে পাঠিয়েছিল শ্রীমান সুশীলকে। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবকে মার্‌বার আদেশ দিয়েছিলেন কর্ত্তারা। তাঁর অপরাধ—তিনি স্বদেশী মোকর্দ্দমার আসামী-দের দণ্ড দিতেন। সাহেব কোন্ হোটেলে থাকেন, কোন্ পথে কখন্ আদালত যান, কোন্ পথে আসেন, আর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়—যাঁকে আমরা গোয়েন্দা বিভাগের আসল মালিক ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম, তিনি কোথায় থাকেন, সন্ধ্যার পর কোথায় যান, তাঁর গতিবিধি ইত্যাদি, অনুসন্ধানের কাযে সুশীল যে রকম বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল, তা দেখে মনে হ'য়েছিল, এমন ছেলে

বেঁচে থাকলে এক জন প্রকৃত কাযের নেতা হবে। তবে কেন এরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যতের আশাস্থল এমন এক জনকে বারীন মনোনীত করল? কারণটা যা' শুনেছিলাম, তার মর্ম্ম এই—মেদিনীপুর সমিতির এক জন পুরোন সভ্য নিরাপদ ওরফে নির্ম্মল রায় বৈপ্লবিক কাযের কি রকম যোগ্য কর্ম্মী ছিল, তা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলেছি। যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় সে মুরারিপুকুর বাগানে এক জন বিশেষ কর্ম্মী ছিল। তাকেই প্রথমে আমাদের সমিতির কে কি করছে না করছে, আমায় জানাবার জন্য বৈপ্লবিক দলের গোয়েন্দাস্বরূপ নিযুক্ত করেছিলাম। এত লোক থাক্‌তে সুশীলের মত ছেলেকে হত্যাকারী মনোনীত করবার কারণ তাকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম যে, যারা মুরারিপুকুরের মঠে ধর্ম্মসাধনা করত না, তারা যত কাযের লোকই হোক না কেন, বৈপ্লবিক কাযে অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'ত। সুশীলও কদিন নাক টিপেছিল, কিন্তু তার ফলাফলটা না কি সহজ সত্য কথায় প্রকাশ ক'রে ব'লে ফেলত। কাযেই তার নাম খরচের খাতায় উঠেছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঘটনাচক্রে বাংলার আধুনিক ইতিহাসে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন নব্য বাঙ্গালী হৃদয়ের ভাব-প্রবণতা প্রাণপণ ক'রে নতুন কিছু করবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। সেই শুভক্ষণের যোগ্য আদর্শ ও তাতে যথাযথ প্রেরণা পেলে, গতানুগতিকতারূপ কারাগারের সুদৃঢ় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে, এমন কি, তা' ধূলিসাৎ ক'রেও বাংলা যা' পেত, তা' রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না-ও হ'তে পারত, কিন্তু হাজার হাজার বছর ধ'রে, শত শত প্রকারে কোটি কোটি মানুষকে যে, অমানুষে পরিণত করা হ'য়েছে, তা' থেকেই হ'ত মুক্তি। এই মুক্তি সম্যক্ না পেলে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একেবারে অসম্ভব, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে ঐ মুক্তি-সাপেক্ষ, সে কথা আমাদের তথাকথিত প্রেরণাদাতা নেতারা সবাই অগ্রাহ্য করে আস্ছেন। তাঁদের ধারণা হ'য়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেলেই আপনা হ'তে অন্য সব অমঙ্গল চ'লে যাবে। অর্থাৎ কি না, জনসাধারণ যে তিমিরে চিরটা কাল আছে, সেই তিমিরেই যে এখনও থাকবে, সে বিধান ত শাস্ত্রের মারফৎ বিধাতাপুরুষ দিয়েই রেখেছেন। তবে বাস্তববাদী ইহকালসর্ব্বস্ব বিদেশীয়দের শাসন-প্রভাবে এদের মতি-গতি যে অ-ভারতীয় Destructive স্বাধীনতার পক্ষপাতী হ'য়ে উঠেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেলে শাস্ত্রানুমোদিত Constructive আইন-কানুনের কয়নির চোটে আবার ভারতীয় সভ্যতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে—এই হ'ল নেতাদের প্রাণের কথা। ফল কথা, যাদের জন্য স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক এবং যারা সামাজিক স্বাধীনতা না পেলে Nationality ব'লে জিনি

এ দেশে সম্ভবই হ'তে পারে না, নেতারা নিজেদিগকে তাদের শ্রেণীভুক্ত ব'লে মনে করতেই পারেন না। পরন্তু কোটি কোটি লোককে দাসে পরিণত ক'রে রাখবার এবং নিজেদের অপেক্ষা তাদের হীন ব'লে ঘৃণা করবার সুখ ও সুবিধা ভগবান্ শাস্ত্রের মারফৎ যাদের দিয়েছেন ব'লে দাবী করা হয়, নিজেদিগকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত ব'লে মনে করতে নেতারা অভ্যস্ত।

কাযেই আমরা যে প্রেরণার কথা আগে বলেছি, সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তা না এসে, এলো ঠিক তার উল্টো—সেই ধর্ম্মভাব বা হিন্দুয়ানী, যা কয়েক বছর আগে বিপ্লববাদ-প্রচারকে সার্থক করবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ ব'লে গৃহীত হ'য়েছিল,—আনন্দমঠের অনুকরণে এখন তা' উদ্দেশ্যে পরিণত হ'তে চলল, অর্থাৎ এখন সনাতন হিন্দু সভ্যতার উদ্ধার এবং হিন্দুধর্ম্মের একাধিপত্য (শুধু ভারতে নয়, সমস্ত জগতে, বিশেষ ক'রে য়ুরোপ ও আমেরিকাতে) স্থাপন করাই হ'ল উদ্দেশ্য, আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই হ'ল তার উপায়। এই বৃথা স্পর্দ্ধার কথা বলতে বোধ হয় প্রথমে শিখিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এখন রামা, শ্যামা সকলেই সে কথা ব'লে আদর কাড়ায়। যাই হোক, এখন আমরা দেখাব, সেই উপায় কি রকম ক'রে উদ্দেশ্যে পরিণত হ'তে চলেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে কি ভাবে এই হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী প্রসারলাভ করেছে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হ'তে দু বছর যাবৎ বাংলায় বিপ্লববাদপ্রচার পাশ্চাত্য উপায়ে সহজসাধ্য নয় দেখে, 'ক'-বাবু বিপ্লববাদে ধর্ম্মের খোলস পরাবার জন্য ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হন। তার পর স্বদেশী আন্দোলন যখন বিরাট আকার ধারণ করে, তখন এর সুযোগে বিপ্লববাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচার কার্য্য অপেক্ষাকৃত একটু বেশী হ'লেও ইচ্ছার অনুরূপ একবারেই হয় নি। বারীন, 'খ'-বাবু প্রভৃতি উপনেতা ও কর্ম্মীদের মধ্যে

প্রাধান্য নিয়ে ঝগড়াঝাটি, অন্য নেতা ও উপনেতাদের অন্যায় পক্ষপাতিতায় আর মতের অনৈক্যতার জন্য নেতাদের মধ্যে ভীষণ দলাদলি আরম্ভ হ'ল। এত দিন যিনি বাংলায় সমস্ত বৈপ্লবিক সমিতির নামে মাত্র প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, সেই ব্যারিষ্টার "সাহেবের" অনুশীলন-সমিতি সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'য়ে গেল। অন্য নেতা উপনেতারা —ইন্দ্র, চন্দ্র, নিখিল, সতীশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তুললেন। তার মধ্যে ঢাকার অনুশীলন-সমিতি উল্লেখযোগ্য। ডাকাতীর "honest attempt" করাই ছিল এঁদের তখনকার উদ্দেশ্য, আর কাযের মধ্যে ছিল নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খলে চেলাদের ক'সে বাঁধার চেষ্টা।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে জিলায় জিলায় নানা প্রকার নাম দিয়ে স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের এক একটি সমিতি ও তার কর্তৃত্বাধীনে অনেকগুলি স্বদেশী ভাণ্ডার বা দোকান স্থাপিত হ'য়েছিল; এ কথা পূর্ব্বে বলেছি। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত করবার জন্য নেতারা চেষ্টা করেছিলেন।

'ক'-বাবুর দলে বারীন তখন প্রধান কর্ম্মী। 'ক'-বাবু না কি এক সিদ্ধপুরুষের মন্ত্রশিষ্য হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের জন্য যোগসাধনা কর্‌ছিলেন। যে অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে দলে দলে চেলা সংগ্রহের আশা ক'রেছিলেন, সে রকম শক্তিলাভ করতে না পেরেই বোধ হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুরাট কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে বারীন ও উপেনকে এক জন বাস্তব চক্ষুতে দ্রষ্টব্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ খুঁজতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পাঠান হ'য়েছিল। নানা স্থানে ঘুরে ফিরে তারা যে ক' জন সিদ্ধপুরুষের দেখা পেয়েছিল, তার মধ্যে "লেলে মহারাজ" নামক এক জন ছাড়া কারুর না কি আশানুরূপ অলৌকিক শক্তি না থাকাতে অগত্যা তাদের ফিরে আস্‌তে হ'য়েছিল। এই "লেলে মহারাজ"

যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তখন বারীনের মন ওঠে নি। অথচ এখানে দলে চেলা জোটে না; যারা জোটে, তারাও অনন্য-পরায়ণ হ'য়ে মাথা গুঁজে বেশী দিন থাকে না; আর দু' এক জন যারা থাকে, তারাও একদম পোষ মান্‌তে চায় না। এই সকল কারণে আবার একটি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন গুরু পাকড়াও করবার জন্য expedition পাঠান হয়।

কি ক'রে জানি না, 'ক'-বাবু শুনেছিলেন, নেপালের কোন্ এক পাহাড়ের ওপর এক জন এমন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, যিনি শালগাছে কদলী, আর কলাগাছে মূলো, না এই রকম একটা কিছু ফলাতে পারতেন। তাঁরই কাছে expedition যাত্রা করল। ঐ expeditionএ ছিল বারীন, উপেন, উল্লাস প্রভৃতি ১০।১২ জন কলকাতা থেকে, আর বাঁকীপুর থেকেও ছিলেন কয়েক জন। তার মধ্যে একজন মহিলাও নাকি ছিলেন। এঁর জন্য পাল্কী-বেহারাও সঙ্গে সঙ্গে ছিল। কিন্তু সেই পাল্কী মদ্দপুরুষদের কাযেই বেশীর ভাগ লেগেছিল। আমি তখন পারিসে। নইলে নিশ্চয় এঁদের সঙ্গ হ'তে বঞ্চিত হ'তাম না। অনেক রকম কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগের পর এঁরা পরমবাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছে দেখেছিলেন, এঁদের সেই সাধু বাবাজী কয়েক মাসের জন্য অন্যত্রে গেছেন। অনেক অনুসন্ধানে শুধু শালগাছে কেন, কোন গাছেই কদলীর অন্বেষণ পেলেন না। অগত্যা ফিরে এলেন।

তখন অনন্যোপায় হ'য়ে পূর্ব্বোক্ত 'লেলে মহারাজ'কেই ডেকে পাঠান হ'ল। তিনি কয়েক দিন পরে এসেছিলেন। আমি পারিস থেকে আসবার পর এক দিন গিয়ে দেখলাম, 'ক'-বাবুর বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘরে খাটিয়ার ওপর লম্বা হ'য়ে তিনি শুয়ে আছেন; এক জন তাঁর ভুঁড়িতে, আর এক জন পায়ে ঘি মালিস করছে।

তাঁর অলৌকিক শক্তি 'ক'-বাবু কিছু দেখেছিলেন কি না, তাঁর কাছে শুনি নি; কিন্তু বারীন ও উপেনের কাছে শুনেছি, তাঁকে স্পর্শ করলে একটা আধ্যাত্মিক শক্তির অনুভূতি হ'ত। যে অলৌকিক শক্তির দ্বারা সম্মোহিত হ'য়ে লোক দলে দলে এসে বৈপ্লবিক দলে যোগ দেবে, আর চক্ষু বুজে নেতাদের যে কোন আদেশ পালন ক'রে ধন্য হয়ে যাবে ব'লে কর্ত্তারা আশা করেছিলেন, সে রকম শক্তি তিনি দেখাতে পারলেন না।

যাই হোক, তিনি আমাদের বিপ্লবপ্রচেষ্টার সমস্ত বিবরণ শুনে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইংরেজের কবল থেকে ভারত স্বাধীন করতে ভারতবাসীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হবে না। ভারতের সিদ্ধ দেহী ও বিদেহী মহাত্মারা তার ব্যবস্থা করেছেন; তাতে ক'রে পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটবে, যার ফলে ভারত বিনা যুদ্ধে (এমন কি, বিনা কলমবাজী ও বিনা বক্তৃতাতে) আপনা হ'তে স্বাধীন হয়ে যাবে। সে জন্য বিপ্লববাদ প্রচার বা বিপ্লবের আয়োজন অকারণ কষ্টমাত্র। তাঁর মতে বিপ্লববাদীদের উচিত তাঁর সঙ্গে গিয়ে স্বর্গের পরম বাঞ্ছিত ধাম গোলোক-প্রাপ্তির জন্য যোগ-সাধনা করা। গত মহাযুদ্ধের সময় আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে জেলখানার ভেতর ব'সে ব'সে তথাকথিত এই সিদ্ধ মহাপুরুষের বাণী সত্য যে হবে, তা' ভেবে ক বছর বৃথা আশায় বেশ তৃপ্তিলাভ করেছিলাম।

কিন্তু কেউ তাঁর এ সদ্‌যুক্তির সারবত্তা তখন উপলব্ধি করিতে পারে নি। আমাদের কর্ত্তারা বড়ই হতাশ হয়ে অগত্যা বাবাজীকে বিদায় দিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কর্ত্তারা হতাশ হ'লেও চেলাদের হতাশ হ'তে দেওয়া হয় নি। তাদের মধ্যে realisation এর competition জাগিয়ে তোলা হ'য়েছিল। কে কতদূর progress করল, তার হিসেব

নিত্য সকালে নেওয়া হ'ত। 'ক'-বাবু "আদেশ" (ভগবানের?) পাচ্ছেন ব'লে চেলাদের মধ্যে প্রচার করাও হ'য়েছিল। যে সকল চেলার সঙ্গে তখন আমার একটু বেশী মেলামেশা করবার সুযোগ হ'য়েছিল, তাদের কাছে শুনেছি, তারা কিন্তু ঐ আদেশের ব্যাপারটাকে একটু রহস্যের ভাবেই দেখত।

তখন শুধু যে বৈপ্লবিক আন্দোলন হিন্দুয়ানীর আন্দোলনে পর্য্যবসিত হ'য়েছিল, তা' নয়, বাংলা দেশে হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী যদিও সেই সময়ের প্রায় ২৫।৩০ বছর আগে হ'তে, রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদের (Rationalism) প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরম্ভ হয়েছিল, তথাপি তথাকথিত ঐ স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই এর প্রভাব চরমে উঠেছিল। এ দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভাব ও খবরাখবর আদান-প্রদানের ক্রমবর্দ্ধিত সুবিধার ফলে, সেই সকল দেশের তুলনায় প্রায় সর্ব্ববিষয়ে যে আমরা হীন অবস্থাপন্ন, সে বিষয়ে ক্রমে আমরা সচেতন হ'য়ে পড়ছি। আর সেই সঙ্গে ক্রমে তার তীব্র বেদনা ও জ্বালায় আমরা এমনই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছি যে, সেই বেদনা ভুলবার জন্য হিন্দুয়ানীর অতিরঞ্জিত অতীত গৌরবের নেশায় বিভোর হ'তে বাধ্য হ'য়েছি।

এই অতীত গৌরব হচ্ছে সেই সনাতন আর্য্য-সভ্যতার, যা' সম্ভব করতে এখনকার কোটি কোটি জনসাধারণের পূর্ব্বপুরুষদিগকে চিরক্রীত-দাসে পরিণত হ'তে হ'য়েছিল। আর যে শাসনতন্ত্রের দ্বারা এত অসংখ্য মানুষকে এতকাল ধ'রে অমানুষে পরিণত ক'রে রাখা সম্ভব হ'য়েছে, সেই অভূতপূর্ব্ব শাসনতন্ত্রের নাম হচ্ছে সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম (religion)। অথচ বড় বড় নেতারাও এই ব'লে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আজও যে সেই সনাতন হিন্দু জাতি জগতে বেঁচে আছে, সে না কি কেবল এই হিন্দু-ধর্ম্মেরই মহিমায়।

সনাতন হিন্দু জাতি বেঁচে আছে মানে এই হয় যে, মুসলমান ও ইংরেজ, এই দু'টী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী জাতির শাসনতন্ত্রের প্রভাব অতিক্রম ক'রেও, হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রের বা তার শাসনের মহিমায় সেকালের দাসদের বংশধর বা তাদের শ্রেণীভুক্ত একালের জনসাধারণ, এখনও নিজেদিগকে দাস ব'লেই কথায় না মানলেও কার্য্যতঃ মেনে নেয়। এটা জীবনের লক্ষণ যে মোটেই নয়, যারা জীবিত, কেবল তারাই সাক্ষ্য দিতে পারে, কারণ, মৃত যে, সে বলতে পারে না, সে মৃত কি জীবিত। এতে হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রের বাহাদুরী থাকলেও, হিন্দু-জাতি শুধু নয়, হিন্দুর সঙ্গে যারা এক স্বার্থে হিন্দুস্থানে বাস করে, তারা সকলেই ম'রে আছে; এমন কি, হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রের প্রবর্ত্তকদের বংশধররাও সমানভাবে ম'রে আছে।

বাঁচন-মরণের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-পরখদার আচার্য্য জগদীশ বোস সকল বস্তুর (উদ্ভিদ ও অচেতনেরও) প্রাণ আছে ব'লে নাকি প্রমাণ করতে পেরেছেন। কিন্তু হিন্দুর যে জাতি হিসাবে প্রাণ আছে, তার প্রমাণ, তাঁর থিওরী (theory) বা তাঁর আবিষ্কৃত বাস্তব যন্ত্রের সাহায্যে হ'তে পারে ব'লে আশা হয় না। তবে আধ্যাত্মিক কোন যন্ত্রের সাহায্যে হয় কি না, জানি না। সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক ঘা (shock) দিলে না কি গাছ-পাথরও যে বিচলিত হ'য়ে প্রাণের সাড়া দেয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্ততঃ বাস্তব যন্ত্র-সাহায্যে যে কেউ দেখতে পায়। কিন্তু এই বাঙ্গালী জাতি কেবল নয়, কোটি কোটি হিন্দু নামধারী জনসাধারণ যে কত কাল ধ'রে বাইর ও ভেতর থেকে কত shockএর ওপর shock পেয়ে আসছে, তার অন্ত নেই; তবু বেঁচে আছে ব'লে প্রমাণ করবার মত বিচলিত কখনও হয় নি। এত সুদীর্ঘকালের মধ্যে এক আধ বার

হয় ত বিচালত হ'য়েছিল ব'লে ভ্রম হয় মাত্র। এ রকম একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে ম'রে থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত করার চাইতে, বা দুনিয়ার শেয়াল-শকুনির আবহমানকাল ভূরি-ভোজন যোগানর চাইতে, হিন্দু নামটার অহেতুকী মায়া ত্যাগ ক'রে মানবজাতির সঙ্গে মিশে গেলে, আর যাই হোক, আমাদের দাস বা কুলীর জাতিতে পরিণত হওয়ার এত বেদনা ভোগ করতে হ'ত না। আর আমাদের এই ভারতমাতা মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের এবং ধর্ম্মের (Religion and virtue) নামে মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের নারকীয় কারখানায় (factory) পরিণত হ'য়ে না থেকে, মনুষ্যত্বের বিকাশজনিত ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা হ'তেন। হিন্দুধর্ম্মের মায়াকে অহেতুকী বল্‌ছি এই জন্য যে, যারা জনসাধারণকে চির-দাস চির-অস্পৃশ্যে পরিণত করেছে, তাদের গৌরব সত্যিই হোক্ বা মিথ্যাই হোক্—সেই জনসাধারণ কেন অনুভব করে, তার হেতু খুঁজে পাই না ব'লে।

এতে আমরা কারুরই দোষ দিচ্ছি না। যারা সেকালে বা একালে জনসাধারণকে চিরদাসে পরিণত ক'রে রাখবার এ হেন অকাট্য কৌশল সৃষ্টি ক'রেছে, সেই কৌশলীদের অথবা সেই কৌশলের উত্তরাধিকারী—কাউকে দোষ দিই না। আর অন্য পক্ষে জনসাধারণকে আমরা এ জন্য দায়ীও কর্‌ছি না। এত কথা বলছি শুধু এই দুঃখে যে, এই সকল তথ্য জেনে শুনে এই বিংশশতাব্দীতেও সেই সনাতন কৌশলকে শ্রেষ্ঠ ব'লে আমাদের বৈপ্লবিক নেতারাও অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আরও দুঃখ, এখনও তাঁদের কেউ চিন্‌তে পাচ্ছে না। কেন এমন হ'ল, তার কারণ খুঁজলে দেখতে পাওয়া যায়, রোগকীটাণু (Bacilli) যেমন শরীরে প্রবেশ ক'রে শরীরকে নানা প্রকারে সংক্রামক রোগগ্রস্ত করে,

সেই রকম ভাবরাজ্যেও হয়ত অনেক রকম ভাবের কীট আছে, যা আমাদের ভাব-কোটরে ঢুকে বা সৃষ্ট হ'য়ে আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে সংক্রামক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে ফেলে। ইচ্ছা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা সবই ওলট-পালট ক'রে দেয়।

এই প্রবন্ধের গোড়াতে নানা রকম নেতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছি। তদনুযায়ী প্রথমে প্রতিহিংসা-কীটের আক্রমণে 'ক'-বাবু হ'য়েছিলেন প্রতিহিংসা-পরায়ণনেতা, তাতে তিনি প্রথমে পেলেন লোকের শ্রদ্ধা। তার পর যদি অন্য কোন ব্যাধি না ধরত, তা হ'লে দেশের চিন্তাধারাকে স্বাধীনতার উপযোগী ক'রে গড়বার জন্য নতুন আদর্শে এক বিরাট জাতীয় সাহিত্যের বা দর্শনের সৃষ্টি করতে পারতেন।

কিন্তু তা হ'ল না। অন্য এক রোগের কীটাণু মাথায় ঢুকল। ইংরেজ তাড়াবার ইচ্ছাটা দু' চার বছরে পূর্ণ ক'রে তার ফলভোগ করবার অথবা তা' লাভ ক'রে অবতার বন্‌বার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়লেন। সেকালে যেমন মহম্মদ, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি অবতাররা ধর্ম্মের সাহায্যে লোককে অন্ধভাবে চালিত ক'রেছিলেন, 'ক'-বাবু দেখলেন, সে রকমটি না হ'লে চলছে না। প্রথমে তাই ধর্ম্মকে উপায়-স্বরূপে ধ'রে নিয়ে বিপ্লববাদপ্রচারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সুরু করলেন। তখন হ'লেন আবার ধোঁয়াময় নেতা; তাতে পেলেন লোকের ভক্তি। ফলে পলিটিক্‌সের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মিলন করতে গিয়ে করলেন ধোঁয়ার সৃষ্টি।

এতেও কিছু হ'ল না। তখন আর এক ব্যাধি এসে জুটল। তার ফলে 'ক'-বাবু বুঝে ফেললেন, অলৌকিক শক্তির পরিচয় না দিতে পারলে, অর্থাৎ লীলা প্রকট না করতে পারলে লোক অন্ধভাবে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে পাচ্ছে না। তখন আবার হ'লেন লীলা-ব্যাধিগ্রস্ত অর্থাৎ লীলাময় নেতা। পারিসের এক

মহা পণ্ডিতজীর প্রদত্ত এই লীলা শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা অনেক পূর্ব্বে দিয়েছি।

এই লীলার হিকমৎ শেখাবার জন্যই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষদের খোঁজে expedition পাঠান হ'য়েছিল। তার ফল যা' হ'য়েছিল, তা' বলেছি। তার পর নিজেরাই অলৌকিক শক্তিসাধনায় উঠে পড়ে লাগলেন। নেতাদের এ হেন সাধ পূর্ণ করবার জন্য দেশের অবস্থা কতদূর লীলার পোষাক হ'য়ে উঠেছিল, তাই এখন দেখা যাক।

"বন্দে-মাতরম্" নামক ইংরেজী দৈনিকখানি ছিল চরমপন্থীদের প্রধান মুখপত্র। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে একে বাঙ্গালী বা ভারত-বাসীর জাতীয় পত্রিকা ব'লে দাবী করত। অথচ তার সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপর ছিল একটা মঙ্গলঘটের ছবি। বিপিন বাবুর ইংরেজী "নিউ ইণ্ডিয়া"ও ছিল ঐ রকম একখানি চরম রাজনৈতিক সাপ্তাহিক। তারও সুরুতে মনে পড়ছে, যেন ছিল জগদ্ধাত্রীর ছবি। বাংলা কাগজের মধ্যে যে ক'খানি রাজনৈতিক চরম মত প্রচার করত, তাদেরও শিরোনামায় হিন্দুশাস্ত্রীয় শ্লোক লেখা থাকত। তা' ছাড়া ঐ সকল পত্রিকা অত্যন্ত হিন্দু-ভাবাপন্ন ত ছিলই। তাতে হিন্দুর অতীত গৌরব ও অলৌকিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত হ'ত। আমার মনে পড়ছে, "নবশক্তিতে" এ রকম একটা খবর বেরিয়েছিল যে, কলকাতা সহরেই এক গেরস্তের মেয়ের ওপর কালীর "ভর" হ'য়েছিল এবং তার মুখ দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কিছু কালী প্রত্যাদেশ ক'রেছিলেন।

পারিস থেকে ফিরে এসে দেখেছিলাম, মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির পূর্ব্বের আড্ডা তুলে দিয়ে সত্যেনের বাড়ীর পাশে একটা ঘর

"আনন্দমঠ" নাম দিয়ে তাতে একটি হাতখানেক লম্বা কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করা হ'য়েছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় সত্যেন উত্তর দিয়েছিল, "সকলেই এই রকম একটা কিছু চায়। হঠাৎ কি জানি কেন, দেশটা বেশী রকম কালীভক্ত হ'য়ে উঠেছে।" ক্ষুদিরাম বলেছিল, "আর যাই হোক, কালীর কৃপায় বেশ পাঁঠা খেতে মিলে, আর পাঁঠার লোভে ভক্ত জোটে।" মুরারিপুকুরের আড্ডাতে আর আমাদের ভবানীপুরের নতুন আড্ডাতে কালীর প্রতি-মূর্ত্তি ঝোলান ছিল। অন্য আড্ডাতে এবং অনেক লোকের বাড়ীতে এই রকম ছবিকে ফুলচন্দন দিয়ে নিত্য পূজা করা হ'ত। এই সময়ের ছু' তিন বছর আগে কিন্তু এ রকম দেবভক্তির নিদর্শন শিক্ষিত-মহলে কচিৎ চোখে পড়ত। শিক্ষিত ভদ্রলোকশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ ক'রে কোন ছাত্রমহলে মাথায় টিকি, গলায় তুলসীর মালা স্বদেশী আন্দোলনের আগে দেখ্তেই পাওয়া যেত না। ঐ সময় অনেক উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, হাকিম, কেরাণীও, শুধু মালা-টিকি নয়, উপরন্তু ছিটা-ফোঁটা কেটে কোর্টে, স্কুল-কলেজে, আফিসে যেতে আর লজ্জাবোধ করতেন না। ব্রাহ্মরা—অনেকে ব্রাহ্ম ব'লে পরিচয় দিতে—লজ্জাবোধ করতেন এবং হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে গৌরব অনুভব করতেন; এমন কি, দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির সামনে মস্তক অবনত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। অনেক পৈতেধারী যুবক পৈতেটা অকারণ জঞ্জাল বোধে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে তা তুলে রেখে দিতেন; তাঁদের ঐ সময় আবার তা' ধারণ করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। ব্রাহ্মণেতর অনেক জাতের (caste) মধ্যে নতুন ক'রে পৈতে প'রে দ্বিজত্বের বা আর্য্যত্বের দাবী করা সংক্রামক-ব্যাধিতে পরিণত হ'য়েছিল; আবার অনেক জাত অন্য জাত

অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য কি রকম ভীষণভাবে শাস্ত্রের পিণ্ডি চটকেছিল, তা বোধ হয় কারও অবিদিত নেই। বৈপ্লবিক সমিতির কর্ম্মীরা জাতভেদ বা অস্পৃশ্যতা বড় একটা মানতেন না; কিন্তু ছাত্রদের মেসে, হোটেলে, সামাজিক ভোজনে, জাতভেদের মাত্রা একটু যেন বেড়ে উঠেছিল। মনে পড়ছে, যেন রিপণ কলেজের একটা মেসে এই নিয়ে খবরের কাগজে লেখা-লেখিও চলেছিল।

হিন্দুর অতীত কীর্ত্তির বৃথা গৌরবপূর্ণ অতিরঞ্জিত বিবরণে এই সময়কার বাংলা সাহিত্য ভ'রে গেছল। কাব্য, পুরাণ, সংহিতা আদি শাস্ত্রের যত কিছু উপাখ্যান অভ্রান্ত ইতিহাস ব'লে শিক্ষিত মহলেও বিবেচিত হ'তে লাগল। হিন্দুশাস্ত্র থেকে জ্ঞান অপহরণ করেই পাশ্চাত্যবাসীরা যত কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছে, এ কথার প্রতিবাদ করা তখন বিপজ্জনক হ'য়ে পড়েছিল। মহাভারতের মধ্যে বিশেষ ক'রে শান্তিপর্ব্বেই দুনিয়ার সার রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব যে নিহিত আছে, এ কথা আমাদের বৈপ্লবিকদলের মধ্যেও অস্বীকার করলে উত্তম-মধ্যমের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। তা' ছাড়া যে সকল নেতা বা উপনেতা যত অধিক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এবং politics বলতে যা বোঝায়, সে সম্বন্ধে যিনি যত বড় মূর্খ, তিনি তত অধিক শাস্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করতে বাধ্য হতেন। মজার কথা, এই শাস্ত্রেও ছিল তাঁদের সমান পাণ্ডিত্য। টিকি, তুলসীমালা, গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ, গোবর, গোমূত্র প্রভৃতি হরেক রকম দ্রব্যের পবিত্র করবার ক্ষমতা এবং পরলোকে মঙ্গলদায়ক ক্রিয়া-কলাপ, যা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে কুসংস্কার ব'লে কয়েক বছর পূর্ব্বে বিবেচিত হ'তে সুরু ক'রেছিল, সে সকলের মহিমা সম্বন্ধে এমন সমস্ত গবেষণা-

পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বক্তৃতায় ও ছাপার অক্ষরে প্রকট হ'য়েছিল, যার প্রতিবাদের জন্য কয়েক বছর পরে আচার্য্য পি, সি, রায়কে "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক পুস্তিকাপ্রচারে বাধ্য করেছিল। তখন বাংলার মনোভাব এমন হ'য়েছিল যে, যত বড় নেতাই হোন্ না কেন, সেই vain-glorious মনোভাবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁকে 'দূর ছি' ভোগ করতেই হ'ত। আর যারা এই vain-gloryকে যত অবোধ্য বাক্যচ্ছটায়, মনোহর বাক্‌চাতুরী দ্বারা, সত্য মিথ্যা নির্ব্বিচারে মহিমান্বিত করতে পেরেছিল, তারাই তত স্বদেশ-প্রেমিক ব'লে লোকপূজা পেয়েছে। আবার অনেকে সেই সঙ্গে ইহলোকের এমন সংস্থান ক'রে নিয়েছে যে, "পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবেক।"

আমাদের 'ক'-বাবুও এই রকম অনায়াসলভ্য লোক-পূজার মোহিনী মায়া কাটাতে পারলেন না। তখন অবতারত্বলাভের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। বৈপ্লবিক নেতার পক্ষে, বিশেষ ক'রে ভারতের মত দেশে, লোকমত সংগ্রহের জন্য প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বা প্রকাশ্যভাবে লিখে আত্মপ্রকাশ করা যে, বৈপ্লবিক দলের সর্ব্বনাশের কারণ, তা তিনি লোকপূজার খাতিরে এক বার ভেবেও দেখলেন না। তার ফল যে কি রকম বিষময় হ'য়েছিল, তা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি।

নেতার পক্ষে লোকপূজ্য হওয়া দেশের হিতের জন্যই যে নিতান্ত দরকার, তার একটা অজুহাত এই দেখান হয় যে, সেনানায়কের আদেশ যেমন লক্ষ লক্ষ সৈন্য বিনা আপত্তিতে অবনতমস্তকে পালন করে, তেমন দেশের কোটি কোটি লোককে নির্ব্বিচারে সেই রকম অবনত-মস্তকে আদেশ পালন করাবার জন্যই নেতাদের প্রতি দেশের লোকের অন্ধ ভক্তি না জাগালে দেশ-উদ্ধাররূপ সংগ্রামে জয় অসম্ভব। কিন্তু

যে ক'টি কারণে এত সৈন্য এক জন বা মাত্র কয়েক জন সেনা-নায়কের আদেশ অবনত মস্তকে পালন করে, সে ক'টি কারণ কিন্তু নেতাদের প্রতি অন্ধভক্তির দাবীর বেলায় খাটে না। যে জন্য সৈন্যকে আজ্ঞাপালন করতে হয়, সেই উদ্দেশ্যটা কত মহৎ এবং তা সফল হ'লে তাদের কি লাভ, আর না হ'লে কি ক্ষতি, তা' তাদের স্পষ্ট ক'রে বোঝান হয়। আর সেই আদেশ করবার একটা আইন-কানুন আছে, যার একটু ব্যতিক্রম হ'লেই সেনানায়ককে লোকনিন্দা বা বিবেকের গ্লানি ছাড়া কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হয়। ঐ সব আইন-কানুনও এমন যুক্তিসঙ্গত ক'রে গড়া হয় যে, তার আবশ্যকতার বিরুদ্ধে বলবার কিছু থাকে না। সেই আইন-কানুন আবার দেশের লোকের নির্ব্বাচিত বহুসংখ্যক প্রতিনিধির দ্বারা বিশেষ বিবেচনা ক'রে গঠিত। বস্তুতঃ যুদ্ধবিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেনানায়ক আদেশ পালন করবার ও করাবার যন্ত্রবিশেষ। তা' সত্ত্বেও সৈন্যদের মধ্যে কোথাও একটু অসন্তোষ বা আদেশপালনে অনিচ্ছার ইঙ্গিত পেলেই, তার প্রতীকার সঙ্গে সঙ্গে করবার ব্যবস্থা হয়। এ ছাড়া আদেশ পালন করবে, এই সর্ত্তে তারা মাইনে পায়। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিশেষ করে ভালমন্দ জ্ঞান আর বিবেকবুদ্ধি ব'লে জিনিষটা মোটামুটি অন্য সকল দেশের সৈন্যের মাথায় ঢোকান হয়। (যদিও ভারতীয় সৈন্যের পক্ষে আদেশ পালন করাবার জন্য কেবল মাইনে আর কোর্ট মার্শেলই যথেষ্ট)। অন্য পক্ষে আমাদের নেতাদের আদেশ করবার আর তা' পালন করাবার বেলায় কোন নিয়ম-কানুন নেই। অথবা যদি থাকে, তবে তা ব্যক্তি বা নেতৃবিশেষের খেয়াল-প্রসূত। যে জন্য আদেশ পালন করতে হবে, তার আদর্শ কখনও যুক্তিসহ বা সম্ভবপর কথায় পরিস্ফুট করা হয় না। কখনও শুনি

স্বরাজ, কখনও স্বাধীনতা; এ দু'টি কথার সঙ্গত ব্যাখ্যা বা ঐ দু'টি জিনিষের কোন একটা পেলে দেশটা কি রকম হবে, তার স্পষ্ট ধারণা লোকের মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা কখনও হয় নি। কেন নেতাদের আদেশ পালন করতে গিয়ে যথাসর্ব্বস্ব, মায় প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রে লোক ধন্য হবে, তারও একটা সঙ্গত হেতু অথবা হেতুস্বরূপ একটা তেমন লোভনীয় আদর্শ তাঁরা দেশের সামনে স্থাপন করতে পারেন নি। সংগৃহীত চাঁদার, সাধারণের বোধ্য করে হিসেব দেওয়া beneath their dignity ব'লে নেতারা মনে করেন— অথবা হিসেব চাওয়াটা তাঁদের সততার ওপর সন্দেহ করা ব'লে আব্দার করেন। দোষ প্রমাণিত হ'লেও বা দেশের বিশেষ ক্ষতি করলেও নেতাদের দণ্ডের বদলে পূজার ব্যবস্থা হয়, গেরুয়া নিলে ত তার কথাই নেই। নেতাদের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ-পালন-কারীদের অসন্তোষ বা আদেশপালনে অনিচ্ছার বিশেষ লক্ষণ দেখেও তার প্রতীকারের ব্যবস্থা হয় না। এ ক্ষেত্রে আদেশপালনের জন্য মাইনে নেই, তেমন কোন সর্ত্তও নেই। কাযেই সৈন্যাধ্যক্ষের মত আদেশপালন করিয়ে নেয়ার অজুহাতে, শব্দবিন্যাসকলার যাদুশক্তিতে বোকা বুঝিয়ে, ত্যাগের চটক দেখিয়ে বা ধর্ম্মের ভণ্ডামী ক'রে অন্ধ লোকপূজা পাবার দাবী যেমন নিরর্থক, তেমনই মারাত্মক।

এই ত গেল নেতাদের কথা। এখন কর্ম্মীদের কথা বলি। মুরারিপুকুর বাগানে তখন যে ক'টি কর্ম্মী জুটেছিল, তার সংখ্যা প্রায় ১৫।১৬ জনের বেশী হবে না। তা' ছাড়া অন্যত্রও দু'চার জন ছিল। সমিতির নিয়মে এদের উচ্চ-নীচ শ্রেণীর, নামে না থাকলেও, কাযে দু'টো স্তর ছিল। যারা ধর্ম্মচর্চ্চা আর ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকত, তারা পড়ত আধ্যাত্মিক স্তরে। আর তারাই বৈপ্লবিক কাযে

শ্রেষ্ঠ অধিকারী ব'লেই গণ্য হ'ত। এরা পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতিফলে শ্রেষ্ঠতর মানুষ হ'য়ে আধ্যাত্মিকতার না কি একমাত্র পুণ্যভূমি ভারতে জন্ম নিয়েছিল। এরা ভাবরাজ্যের বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের (Idealistic or Spiritualistic world) লোক। বৈপ্লবিক ব্যাপারে একমাত্র বোমা তৈরী আর বোমা ছোড়া ছাড়া না কি আর সবই আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তর্গত। এমন কি, "বিধবার ঘটি চুরিও" না কি কতকটা আধ্যাত্মিকতার এলাকাভুক্ত। সেই হেতু তথাকথিত রাষ্ট্রনৈতিক ডাকাতিতে এদের অনেককে যোগ দিতে, কাউকে বাঁ'তাতে কৃতকার্য্য হ'তে, কাউকে বা সেজন্য জেলে যেতে আর informer হ'তে দেখেছি।

সাধারণতঃ এদের স্বভাব বড়ই মধুর; এরা সর্ব্বত্র ভাল মানুষ বা সুবোধ ও সুশীল বালক ব'লে পরিচিত। নিজেদিগকে সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চস্তরের লোক ব'লে মনে করা এদের স্বভাব। এই উপলক্ষে একটা ঘটনার উল্লেখ করলে এদের স্বভাবটা বোঝবার পক্ষে সুবিধা হ'তে পারে।

আমরা যখন আলিপুর জেলে বিচারাধীন অবস্থায় একসঙ্গে ছিলাম, তখন এক দিন এক জন সাধারণ কয়েদী আমাদের বন্দেজী দুধ খাওয়াতে এসেছিল। চুরি অপরাধে (বিধবার ঘটি চুরি নয়) তার জেল হ'য়েছিল। সে গান গাইতে পারত ব'লে বিছানায় বসিয়ে গান গাওয়ান হচ্ছিল। বিছানাটা ছিল সাধারণ কয়েদীর ব্যবহৃত জেলখানার পুরোণ কম্বল। এতেই আধ্যাত্মিক স্তরের অনেকের সেই কাযটি নিতান্তই অনাধ্যাত্মিক এবং অভদ্রোচিত ব'লে অনুভূত হ'য়েছিল। এতে তাঁদের আত্মসম্মান-হানি হচ্ছে ব'লে প্রতিবাদও করা হ'য়েছিল। অথচ এক জন জোচ্চোর, প্রতারণা অপরাধে দণ্ডিত কয়েদী,

সাধু-সন্ন্যাসীর মত ভণ্ডামী ক'রে এবং হাত গুণে সাধারণ কয়েদীদের, বিশেষ ক'রে রক্ষীদের কাছ থেকে চরস-আফিং এর ব্যবস্থা ক'রে নিত। তা আমাদের কর্ত্তারা জেনেও, আধ্যাত্মিক স্তরের লোক ব'লে গণ্য ক'রে তাকে যে নমস্কার ক'রেছিলেন, অভিধানের সংজ্ঞা অনুযায়ী তা তিন প্রকার নমস্কারের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। সেই তিন প্রকার নমস্কার হচ্ছে উত্তম কায়িক, মধ্যম মানসিক ও অধম বাচিক নমস্কার। নমস্কারের সঙ্গে যথাবিহিত দক্ষিণা একটা টাকাও ছিল। আর সেটা যে আফিং-ও চরসের মৌতাতেই ব্যয়িত হবে, সে তথ্যও কর্ত্তারা সুবিদিত ছিলেন। দেশ উদ্ধারের পর এই কর্ত্তাদের মুষ্টিতে বাংলার শাসনভার এলে, কি রকম আধ্যাত্মিক স্বরাজ হ'ত, এতে তার একটু আমেজ পাওয়া যায়।

যাই হোক, সেই সকল চেলাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ (sentimental), তাই অল্পবিস্তর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'লেও তাদের গুরুভক্তি একেবারে অচলা এবং গুরুর উপদেশ বা অভিপ্রায়মত হেঁসে বা বেহুঁসে উচিত অনুচিত নির্ব্বিচারে সকল কায করাই ছিল তাদের জীবনের প্রধানতম আনন্দ। গুরুর নিকট এদের "confession"ও দিতে হ'ত। যারা কন্‌ফেসন দিয়ে এই দলভুক্ত হ'য়েছিল, তাদের মধ্যে নরেন গোসাইঁও এক জন।

কোন কিছুর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ জন্য, সে বিষয়ের কোন ঘটনা বা তথ্যের সঙ্গে যাচাই করা এদের স্বভাববিরুদ্ধ। আর অবোধ্য ধোঁয়াটে কিংবা অসম্ভব যত কিছু, তা' সহজে বোধগম্য হওয়াটাই এদের বিশেষত্ব; এরা অত্যন্ত সহজে বুঝে ফেলে—এই দৃশ্যমান জগৎ একেবারে মিথ্যা, প্রপঞ্চ। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পায় যে, ভারত সেই মিথ্যা জগতেরই অংশবিশেষ; এই ভারতের উদ্ধার, তার

সনাতন সভ্যতা, ধর্ম্ম, তার কীর্ত্তিকলাপ আর তার এই আধ্যাত্মিক মানুষগুলি সবই অসত্যেরই মধ্যে সত্য।

ভাবপ্রবণ মানুষের ভাবের বিশেষ কোন বিকাশ রুদ্ধ হ'লে বা ভাবের খোরাক অভাব হ'লে যে রকম সংসারে উৎকট বিতৃষ্ণা এসে থাকে, এদের অধিকাংশের মধ্যে সেই ভাবের ব্যাপার গোড়াতে বোধ হয় ঘটেছিল। এ স্থলে সন্ন্যাসগ্রহণই চিরন্তন প্রথা। এদের অনেকে সেই সনাতন রীতি অনুসারে মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র (অনেকের তা' ছিল) ত্যাগ ক'রে একেবারে সত্যিকার সন্ন্যাসী সেজে জঙ্গলে বা পর্ব্বতে গেছল। মনের মত ভাবের খোরাক বুঝি সেখানেও জুটল না; তাই বাংলা দেশে ফিরে এসে স্বদেশী আন্দোলনরূপ নতুন হুজুগে মেতে গেল। তখন বৈপ্লবিক দলের সন্ধান পেতে দেরী হ'ল না।

আর যে ভাবপ্রবণ হৃদয়গুলি সন্ন্যাসের সুবিধে বুঝতে পারে নি, তারা দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে সুদূর পল্লী হ'তে টানা হ'য়ে, স্বদেশ উদ্ধারের মত অতবড় গৌরবের কায অত সস্তা যায় দেখে, অন্ধভাবে বৈপ্লবিক দলে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল।

মাণিকতলা বাগানে যারা এই রকম টানা হ'য়ে এসেছিল, তাদের সকলকেই প্রথমে সাধনভজনে যোগ দিতে হ'ত। যাদের মন তাতে পড়ত, আর কর্ত্তাদের আশানুরূপ progressএর লক্ষণ যারা দেখাত, তারা পূর্ব্বোক্ত উচ্চ স্তরের সম্মান লাভ ক'রে ধন্য হ'য়ে যেত।

এদের মধ্যে এমন অনেক ছিল, যারা ভাল ক'রে progressএর লক্ষণ দেখাতে পারত না, যারা দেশ উদ্ধারের সঙ্গে নাক টেপার উপযোগিতা ভাল বুঝতে পারত না, যারা নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য বা ঐ সত্য হৃদয়ঙ্গম

করতে পারত না, অথচ যারা ভারতের ভাবী ইতিহাসে অমরত্বলাভের জন্যই যৌবনের অমন রঙ্গিন প্রাণটা বলি দিতে এসেছিল, তাদের বেশ একটু লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হ'ত। তারাই নীচস্তরের অনাধ্যাত্মিক মানুষ, তাই দেশ উদ্ধারের উচ্চ কাযে অনধিকারী ব'লেই গণ্য হ'ত। এই দুঃখে কেউ কেউ দল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'য়েছিল।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বোমা তৈরী শেখবার জন্য যে পাঁচ জনকে ভবানীপুরের নতুন আড্ডায় পাঠান হয়েছিল, তারাও ছিল নিম্নস্তরভুক্ত। স্বনামধন্য কানাইলালও ছিল এই শ্রেণীভুক্ত। যে হেতু, সে নিজে ত নাক টিপতই না, অন্যেরও নাক টেপা দেখতে পারত না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গ্রেপ্তারের আগে

গ্রেপ্তারের আগে সুশীল কেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের ওপর বোমা ছোড়বার জন্য নির্ব্বাচিত হ'য়েছিল, তার হেতু পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হ'য়েছে। কয়েক মাস আগে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় লিখিত রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ বাবু অভিযুক্ত হ'য়েছিলেন। তাতে বিপিন বাবু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তিনিও অভিযুক্ত হন। তাঁর বিচারের দিন লালবাজার পুলিস-কোর্টের সুমুখে লোকের ভিড়ের ওপর এক জন য়ুরোপীয় ইনস্‌পেক্টার বেত চালাতে থাকে। এ সেই সুশীল, যে ১৪ বছর বয়সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ-স্বরূপ উক্ত ইনস্‌পেক্টারের মুখের ওপর ঘুসী চালাবার অপরাধে সেই দিনই উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারে দণ্ডস্বরূপ ১৪ঘা বেত খেয়েছিল।

সুশীলের দ্বারা তার বিচারক নিহত হ'লে, সমস্ত জিনিষটা অন্য ভাবে গৃহীত হবে ব'লে, তাকে বিদায় দিয়ে, মাণিকতলার আড্ডা থেকে আর একজন নিম্নস্তরের, কর্ম্মীকে আবার আনা হয়েছিল। এই খুনোখুনির মতলবটা কিন্তু সুশীলকে তখনও জানতে দেওয়া হয় নি। নচেৎ তাকে এড়ান মুস্কিল হ'ত।

মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের জন্য প্রথমে যে বোমাটা তয়ের হ'য়েছিল, সেটা হচ্ছে, একখানা বড় বইয়ের মাঝখানে যায়গা ক'রে বোমাটা এমন ভাবে রাখা হ'য়েছিল যে, বইখানা খুললেই বোমা ফেটে যেত। বইখানা একটা ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। একখানা লম্বা খামের খানিকটা

বইয়ের ভেতর থেকে এক দিকে এমন ভাবে বেরিয়েছিল যে, ফিতে না খুলে টানলে বেরিয়ে আসত না।

জানা গেছল, মিঃ কিংসফোর্ড মিসেস মক্কের গ্রাণ্ড হোটেলে থাক্‌তেন এবং সাড়ে ন'টার পর নিজের অফিস-যানে কোর্টে যেতেন। গাড়ীতে ওঠবার সময় ঐ বইখানা একদিন তাঁর হাতে দিতে গিয়ে জেনেছিল তিনি তার ঠিক আগের দিন টালিগঞ্জে একটা বাড়ীতে উঠে গেছেন। তার পর টালিগঞ্জের বাড়ী খোঁজ ক'রে—আর এক দিন সঙ্ক্যেবেলা সেটা তাঁর হাতে দিয়ে এল। কিন্তু তাঁর এমনই জোর বরাত, বইখানা না খুলেই আলমারীতে রেখে দিয়েছিলেন বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত লেফাফাখানাতে কি চিঠি ছিল, তা পড়বার প্রবৃত্তিও তাঁর হয় নি।

পরে আমরা যখন আলিপুর জেলে বিচারাধীন, তখন নরেন গোসাইঁর হত্যার পরে আমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এক জন, পুলিসকে ঐ সংবাদ দিলে, মুজঃফরপুরে উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বইয়ের আলমারী হ'তে বোমা সমেত ঐ বইখানি উদ্ধার করা হ'য়েছিল। এ সম্বন্ধে রাউলাট কমিশন রিপোর্টে যা লিখিত আছে, তা' নীচে উদ্ধৃত হ'ল।

* * * "The police had received information 10 days before that the murder of Mr. Kingsford was intended, and during the next year a well-known revolutionary, when in custody, said that before this outrage a bomb had been sent to Mr. Kingsford in a parcel. Upon search being made, a parcel was found which Mr. Kingsford had received but not opened, thinking it contained a book borrowed from him. The parcel did contain a book; but the middle portion of the leaves

had been cut away and the volume was thus in effect a box and in the hollow was contained a bomb with a spring to cause its explosion if the book was opened.

* * * Fifteen were ultimately found guilty of conspiracy to wage war against the King-Emperor, including Barindra Kumar Ghose * * * Hem Chandra Das, * * * and another who made the statement already alluded to and so strikingly confirmed as to the sending of a bomb in a parcel to Mr. Kingsford." (Sedition Committee, 1918 Report. Page 32, Para 37 and 38.)

ভাবার্থঃ—"কিংসফোর্ডকে যখন মারবার মতলব করা হ'য়েছিল, তার দশদিন আগেই পুলিস খবর পায়। পর বছর কোন বিখ্যাত বিপ্লবপন্থী জেলখানায় থাকতে থাকতে বলে যে উক্ত দুর্ঘটনার পূর্ব্বে কিংসফোর্ডকে একটা বইয়ের মধ্যে বোমা পাঠান হ'য়েছিল। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, কিংসফোর্ড তা পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাওয়া বই ফেরৎ এসেছে মনে করে তা' আর খোলেন নি। ওটা বাস্তবিকই বই ছিল না; ভেতরের পাতাগুলি কেটে নিতে কার্য্যতঃ একটা বাক্সের মত হ'য়েছিল আর সেই ফাঁকের মধ্যে বোমা দেওয়া হ'য়েছিল; এমন ভাবে স্প্রীংএর ব্যবস্থা ছিল যে বই খুললেই বোমা ফেটে যাবে।

* * * * অবশেষে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্রে ১৫ জন দোষী সাব্যস্ত হয়; তার মধ্যে ছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ * * * হেমচন্দ্র দাস * * * আরও একজন যে উল্লিখিত এজাহার দিয়েছিল, তারই কথার সঙ্গে কিংসফোর্ডকে বোমা পাঠান ব্যাপারটা ঠিকঠাক্ মিলে গেছল।"

(সিডিসন কমিটী, ১৯১৮ রিপোর্ট।)

যাই হোক, আমাদের ভবানীপুরের বোমার নতুন আড্ডা শীগ্‌গীর

তুলে দিতে হ'য়েছিল। ঐ আড্ডা পত্তনের সপ্তাহখানেক পরে জানা গেল, সি, আই, ডি, আমাদের পেছনে লেগেছে। দিনের বেলায় যে কোন সময় ভবানীপুরে যেতাম ও ফিরে আসতাম, তখনই সঙ্গে থাকতেন সামান্য লোকের বেশে এক জন গুলীখোরের মত লোক; আর কখনও কখনও ভৈরবীবেশধারিণী এক প্রৌঢ়া। এই প্রৌঢ়াটি যে কে, তা জানতে পারিনি। ঐ ভদ্রলোকটি ছিলেন তখনকার স্বনামধন্য পুলিস ইনিস্‌পেক্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস (এখন নিশ্চয় মস্ত বড় কিছু হ'য়েছেন)। সভাবাজারে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা জঘন্য খোলার ঘর থেকে তিনি সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমার চালচলন লক্ষ্য করতেন। এ ছাড়া বাড়ীর অন্য দু'দিকে দু'জন ছিল। অন্য সকল আড্ডাতেও এই রকম গোয়েন্দার ব্যবস্থা ছিল।

আবার অনেক খোঁজাখুঁজির পর শ্যামবাজার গোপীমোহন দত্তের লেনে একটা বেশ সুবিধামত ছোট্ট বাড়ী মিলে গেল।

আমরা এমনই দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলাম যে, ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার জিনিষ-পত্র নিয়ে যারা গরুর গাড়ীর সঙ্গে যাচ্ছিল, তারা পথে খাবার খেতে গিয়ে গাড়ী হারিয়ে ফেলেছিল। সকাল ১০টা থেকে খুঁজে-খুঁজে সন্ধ্যেবেলা শ্যামবাজার পুলের কাছে গাড়ীখানা অবশেষে পাওয়া গেল।

সেই সব মাল নিয়ে অনেক কিছু কাণ্ড ক'রে দু'দিন পরে গোপীমোহন দত্তের লেনে আড্ডা গেড়ে বসা হ'ল। সেখানে থাকত কানাই, নিরাপদ প্রভৃতি ও অন্য প্রদেশের দু'টি শিক্ষার্থী। এখানেও কদিন পরে জানা গেছল, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত গোয়েন্দা পুলিস পাহারা দিত। আমরা যখন যেখানে যেতাম, তারা কোন না কোন বেশে পেছনে পেছনে যেত।

তখনকার গোয়েন্দা পুলিসের নিপুণতা ও কার্য্যদক্ষতা যথেষ্ট না থাকলেও আমাদের চাইতে তাদের কাণ্ডজ্ঞান (common-sense) ঢের বেশী ছিল। সন্ধ্যের পর তাদের আর দেখতে পাওয়া যেত না। রাত্রে কেবল রেলওয়ে ষ্টেশন—হাওড়া ও শেলদাতে দু'তিন জন ক'রে হাজির থাকত।

একজন মারহাটী ভদ্রলোককে হাওড়ায় এক দিন সন্ধ্যেবেলা গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়ে দেখলাম, প্ল্যাটফরমে দু'জন গোয়েন্দা রয়েছে। বুঝলাম' তারা আমাদের চেনে। আমরা দুজনেই ইণ্টার ক্লাশে ঢুকে উল্টো দিকের দরজা দিয়ে নেমে, জামা কাপড় চেহারা বদলে ফেললাম। তার পর থার্ড ক্লাস গাড়ীর মধ্য দিয়ে প্ল্যাট-ফর্ম্মে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম, তারা আমাদের তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে। পরে তারা কোর্টে যে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তা' থেকে জানতে পেরেছিলাম, সেই গাড়ীতে খুঁজে-খুঁজে তারা রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিল। এই রকমে আরও অনেক বার রাতের বেলা পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া হ'য়েছিল।

গোপীমোহন দত্তের লেনে প্রথমে যে তিনটা বোমা তয়ের হ'য়েছিল, তার একটা পরীক্ষা ক'রে দেখা হ'ল আশানুরূপ কায দেবে।

তখন মিঃ কিংসফোর্ড মুজঃফরপুরের জজ। পাছে এ বারের চেষ্টাও আগের সকল চেষ্টার মত "Honest attempt"এ পরিণত হয়, সে জন্য অনেক গবেষণার পর দু'জনকেই পাঠান স্থির হ'ল। সম্পূর্ণ পৃথক দু'দলের পরস্পর অপরিচিত দু'জনকে পাঠাতে পারলে, মিথ্যা কোন বাধাবিঘ্নের ওজর নিয়ে কায হাসিল না ক'রে, ফিরে আসবার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই অন্য এক দলের নেতার কাছে

একজন হত্যাকারী চাওয়া হ'য়েছিল। পরদিন বিডন পার্কে ঐ নেতার সঙ্গে তাকে দেখে খুব কাযের লোক ব'লে মনে হ'ল। তখন একবারে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবার জন্য তার নেতাকে শেষ বিদায় দিতে বলেছিলাম। নেতাটি বড়ই বিব্রত হ'য়ে ব'লেছিলেন যে, তাকে দু'দিনের ছুটী দিতে হবে। অর্থাৎ কি না, বীরসাজে তার ফটো তুলিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিদায়ভোজে সম্মানিত ক'রে, তবে তাকে শেষ বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। বড় দুঃখে সে দিনও মনে হয়েছিল' এ দেশে বিপ্লবের আশা সুদূরপরাহত। যাই হোক, এদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে আমাকেই শেষ বিদায় নিতে হ'য়েছিল।

অবশেষে মেদিনীপুর সমিতির কাউকে কিছু না জানিয়ে ক্ষুদিরামকে আনান হয়েছিল। সপ্তাহখানেক তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে মুজঃফরপুরে পাঠান হ'ল। এ কাযের ভার পেয়ে যে তারা কৃতার্থ হ'য়ে গেছল, তাদের ভাবে ও কথায় সহজে তখন প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল। তারা সন্ধ্যেবেলা যাত্রা করেছিল ব'লে পুলিশ খোঁজ পায় নি। তাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ছিল যে, সেখানে অনুষ্ঠান সব ঠিক হ'য়ে গেলে কায হাসিল করবার পূর্ব্বে সাঙ্কেতিক প্রথায় আমাদের খবর দেবে। তখন আমরা নিজেদের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকৃব।

এই অবসরে আমরা প্রস্তুত হ'তে লেগে গেলাম। কথা স্থির হ'ল, সকলে নিজ নিজ বাড়ী বা আড্ডা থেকে বিদ্রোহসূচক জিনিষ-পত্র সরিয়ে ফেলবে। এমন কি, সন্দেহজনক সামান্য চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে ফেলবে। বিদেশী শিক্ষার্থী, আর যাদের সহরের বাইরে নিজের বা আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে থাকবার সুবিধে আছে, তারা সহর ছেড়ে চ'লে যাবে।

পুলিস যে আমাদের পেছনে লেগেছে, তা কিন্তু বারীনকে কিছুতেই তখনও বোঝাতে পারিনি। এই বিষয়েই বাস্তবিক একটুও ভীরুতা বারীনের ছিল না। তার মুখে এই ধরণের কথা প্রায়ই শোনা যেত যে, "পুলিস বেতনভোগী দাস মাত্র। আমাদের এ ব্যাপার বোঝবার মত মুরোদ যদি থাকত, তবে কি আর পুলিসে কায করতে আসে? সেঙ্গাতরা খালি বোকা চোর, ডাকাত দু'একটা ধ'রে কোন রকমে চাকরীটা বজায় রাখে। এই দেখ না, পাকা সি, আই, ডি, পূর্ণ লাহিড়ী 'যুগান্তর' আফিসে হাঁকডাক ক'রে তাঁলাসি নিতে গেল; আর তারই সামনে দিয়ে কি না কুল্পি-বরফ-ওলা সেজে অত মারাত্মক কাগজপত্র কম্বল মুড়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল।" ইত্যাদি।

"ক" বাবুও বারীনকে সাবধান হ'তে বলেছিলেন। তাতে না কি বারীন বলেছিল, "ও সব মিথ্যে কথা, দেখছ না। ওরা (আমরা) শক্ত কোন কাযে হাত দিতে চায় না ব'লেই দিন-রাত কেবল পুলিসের স্বপ্নই দেখছে," ইত্যাদি। "ক"-বাবু বারীনের অন্য সব কথার মত এ কথাও খুব সঙ্গত বলেই- মেনে নিয়েছিলেন। নইলে নিশ্চয়ই বারীনকে কথামালার গল্প ও চাণক্যের শ্লোক মুখস্থ করিয়ে ছাড়তেন।

এর আগে যে সকল বৈপ্লবিক মারাত্মক ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল, তার পুর্ব্বে বা পরে এ রকম সাবধান হওয়ার কথাই ওঠেনি। এবার অন্যের suggestion মত সতর্কতা অবলম্বনের কথা ওঠাতে বারীন রাজীত হ'লই না, অন্যকেও সে বিষয়ে মনযোগী হ'তে দিল না।

মুরারী-পুকুর বাগানে, যেখানে যেমনটি ছিল, সেখানে তেমনই রইল। গোপীমোহন দত্তের লেনে যে দু'জন বিদেশী ছিল, তারা সুবোধ

বালকের মত স'রে পড়ল। রইল কেবল কানাই ও নিরাপদ। যন্ত্র-পাতি ও সন্দেহজনক সমস্ত জিনিষ পাঁচ-ছটা বাক্সে পুরে ফেলা হ'য়েছিল। উল্লাস ভায়াকে এই ভার দেওয়া হ'য়েছিল যে, সে সন্ধ্যের পর ঐ সব মাল সমেত গিয়ে কয়লাঘাটে একখানা নৌকা পৃথকভাবে ভাড়া ক'রে, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তার বাবার ল্যাবরেটারীতে পাড়ী দেবে। উক্ত বাক্সগুলোর দুটোতে এমন অনেক যন্ত্র-পাতি ও মাল-মসলা ছিল, যা যে কোন ল্যাবরেটারীতে থাকলে সন্দেহের কোন কারণ হ'ত না। সেই বাক্সদুটো ছাড়া আর সব গঙ্গায় ডুবিয়ে দেবার কথা ছিল।

কার্য্যতঃ কিন্তু তা হ'ল না। বারীনের নির্ভীকতা অন্য সকলের মধ্যেও একটু আধটু সংক্রামিত হ'য়েছিল। কাযেই গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে অনেক কিছু প'ড়ে রইল। চার পাঁচটা বাক্স দিনের বেলা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে হ্যারিসন রোডে উল্লাসের এক নিরীহ আত্মীয় কবিরাজের বাড়ীতে রাস্তার ধারে, বস্‌বার ঘরে খাটের তলায় রেখে গেল। পুলিসও সঙ্গে সঙ্গে এসে সেই দিন থেকে সেখানে গুপ্ত পাহারায় নিযুক্ত রইল। এতে উল্লাস ভায়ার কোন অপরাধ ছিল না; ছিল একমাত্র তার, যে উল্লাসকে এ কাযের ভার দিয়েছিল।

প্রায় এক সপ্তাহ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত কেটে গেল। মুজঃ-ফরপুর থেকে সাঙ্কেতিক খবর পাওয়া গেল না। হঠাৎ ১লা মে (১৯০৮) সন্ধ্যের পর "Empire" এ সংবাদ বেরুল—"৩০ শে এপ্রিল রাত্রি ৮টার সময় মিসেস্ এবং মিস্ কেনেডী, মজঃফরপুরের জজ মিঃ কিংসফোর্ডের গেটে ঢুকতে বোমার দ্বারা নিহত হ'য়েছেন।"

আমাদের কর্ত্তা, এ খবর পাওয়া মাত্র বারীনকে ডেকে এনে আদেশ দিলেন, দলের সকলকে এ সংবাদ জানাতে আর সকলকে আড্ডা থেকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিতে। কিন্তু কোন আদেশই পালন করা তার ধাতে সয় না। তাই কাউকে কোন খবর না দিয়ে মাণিকতলার আড্ডায় গিয়ে বন্দুক, রিভলবার, গুলী, সেল আদি পুতে ফেলতে সে হুকুম দিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী রাত ১২টা পর্য্যন্ত ঐ সকল জিনিষের ওপর দুটি দুটি মাটী চাকা দেওয়া হ'য়েছিল। ঐ সময় না কি পুলিসের কে এক জন এসে এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, "সকালে অনেক পুলিস আসবে, সাবধান!" এ কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আসেনি। এ দিকে হ্যারিসন রোডের উক্ত বামাল-পূর্ণ বাক্সগুলোও সরান হ'ল না। আমিও রাত ১২টা পর্য্যন্ত কোন খবর না পেয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৯০৮ খৃঃ অব্দের মে

৩০শে এপ্রিল মুজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম মিঃ কিংসফোর্ডের পরিবর্ত্তে মিসেস্ ও মিস্ কেনেডিকে বোমা দ্বারা হত্যা করে। তার সপ্তাহ খানেক আগে তারা কল্‌কাতা থেকে রওয়ানা হয়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, সন্ধ্যার পর গোয়েন্দা পুলিসের ছুটী হয়ে যেত। সন্ধ্যার পর ওরা যাত্রা করেছিল ব'লে পুলিস তাই ওদের পেছন নিতে পারে নি।

ওদের দু'জনই আমাদের গুপ্ত সমিতির পুরোন সভ্য ছিল এবং অন্যের তুলনায় সব চেয়ে বেশী চতুর, কর্ম্মক্ষম, আর উপদেশপালন সম্বন্ধে বাংলার 'ক্যাসেবিয়াঙ্কা' ব'লেই বিবেচিত হ'ত। দু' তিন বছর যাবৎ এরা তথাকথিত অনেক "honest attempt" করেছিল। ক্ষুদিরাম একবার ফৌজদারী সোপর্দ্দও হয়েছিল। তবু কিন্তু কাযের বেলায় সবই উল্টো করেছিল। কথা ছিল, বোমা ফেল্‌তে যাবার সময় তাদের বেশ-ভূষা অন্য প্রদেশবাসীর অনুকরণে বদল ক'রে, বোমা ফেলা হয়ে গেলে পর, তারা আবার সাধারণ বাঙ্গালীর বেশ ধরবে। তখন যা শুনেছিলাম, তাতে মনে হয়, ঠিক উপদেশমত কায তারা করে নি। তার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, উপদেশমত চলা গুপ্ত সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য জেনেও তার আবশ্যকতা হয় ত উপলব্ধি করতে পারে নি, অথবা যে suggestion-phobia বাঙ্গালী-চরিত্রের একটা বিশেষত্ব, সেই দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি তাদেরও চরিত্রে ছিল। যে সকল কারণে বাঙ্গালীরা সৈন্যের কাযে বিমুখ বা অক্ষম,

এই suggestion-phobia সেই সকল কারণের অন্যতম। এ থেকে মনে হয়, এ দেশে বিপ্লবচেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র।

বোমা ফাটলে রিভলবার ফেলে দেবার কথা ছিল; তা-ও দেয় নি। উভয়ের, বিশেষ ক'রে ক্ষুদিরামের ঐ জিনিষটার ওপর একটা অত্যধিক অনুরাগ ছিল। একটা রিভলবার পাবার জন্য সে বহুবার বহু সাধ্য-সাধনা করেছিল; পাছে অপব্যবহার করে, এই ভয়ে তা দেওয়া হয় নি। মুজঃফরপুরে যাবার দিন দু'জনেই দুটো নিয়েছিল। অধিকন্তু আর একটা সে না ব'লে হস্তগত করেছিল। যেখানে রিভলবার রাখা হ'ত, তা সে জানত। দুটো রিভলবার পাতলা জামার দু'পকেটে ঝুলছে, আর দু'হাতে খাবার খাচ্ছে, এ হেন অবস্থায় বোমা ফাটার পরদিন রেল-ষ্টেশনে সে ধরা পড়ল। আর রেলগাড়ীর একটা কামরায়, সেই দিন সবইন্স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জ্জী প্রফুল্লের বিকৃত চেহারা দেখে সন্দেহ করেন। তার পরের ষ্টেশনে তিনি পুলিসকর্ত্তৃপক্ষকে টেলিগ্রামের দ্বারা প্রফুল্লের কথা জানান। মোকামায় প্রফুল্লের সঙ্গে নন্দলালও নামলেন। আগে হ'তে প্রস্তুত পুলিস তাকে ধরতে গেলে রিভলবারের দ্বার সে আত্মহত্যা করেছিল।

ধরা প'ড়লে যা বলবার কথা ছিল, তা বলে নি। বিশেষ ক'রে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে একটি অন্য কথাও যাতে না বলে, ত বিশেষ ক'রে শেখান হয়েছিল। প্রফুল্লের ধরা পড়বার পর কথ বলবার অবসর হয় নি যদিও, কিন্তু ধরা পড়বার পূর্ব্বে কথা বলেই যত গোল বাধিয়েছিল। ক্ষুদিরাম প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এব রকম স্বীকারোক্তি দিয়ে সেসন কোর্টে নাকি তা সংশোধন ক'রে অন্য রকম দিয়েছিল। তার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে

দু'জনের মধ্যে কে এই কীর্ত্তি করেছে, স্বীকারোক্তি না দিলে সাধারণের নিকট পাছে অজানিত থেকে যায় বা প্রফুল্ল করেছে ব'লে পাছে লোকে ধ'রে নেয়, এই সন্দেহে স্বীকারোক্তি দেবার লোভ ক্ষুদিরাম সংবরণ করতে পারে নি। তার স্বীকার-উক্তিতে প্রফুল্ল ছাড়া আর কারুর নাম প্রকাশ করে নি বা গুপ্তসমিতি সম্বন্ধেও কিছুই বলে নি।

প্রফুল্লের প্রকৃত নাম ক্ষুদিরাম জান্‌ত না। তাই তাকে দীনেশ ব'লে • উল্লেখ করেছে। প্রফুল্ল বোধ হয় এই নামেই তার কাছে পরিচিত ছিল। প্রথম উক্তিতে বলেছিল, দীনেশের সঙ্গে নাকি তার প্রথম দেখা হাওড়া ষ্টেশনেণ স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলাপের পর ক্ষুদিরাম 'সাহেব'-হত্যার সঙ্কল্প প্রকাশ করে। তদনুযায়ী দীনেশ তাকে বোমা আদি দেয়, এবং মুজঃফরপুর পর্য্যন্ত সঙ্গে থেকে সাহায্য করে। বোমা ছোঁড়বার আগের দিন পর্য্যন্ত যে রকম গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়ে, যে সময় মিঃ কিংসফোর্ড ক্লাব থেকে বাংলোয় আস্‌তেন, ঠিক সেই সময় ঠিক সেই রকম ঘোড়া-গাড়ীতে মিস্ আর মিসেস্ কেনেডি উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বাংলোতে গেছলেন। তাই নাকি তাদের ভুল হয়েছিল।

দ্বিতীয় উক্তিতে সে অনেকটা দোষ প্রফুল্লের ঘাড়ে চাপিয়েছিল। তখন সে জেনেছিল, প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেছে। কাযেই তার ঘাড়ে অপরাধের গুরুত্ব চাপিয়ে দিলে, হয় ত ভেবেছিল, নিজের দণ্ড লঘু হ'তে পারে। এই প্রাণের মায়াটা, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে যে কি রকম স্বতঃস্ফুর্ত্ত, তা পূর্ব্বে বিশেষ ক'রে বলেছি। তা সত্ত্বেও এ কাযটা যে, সে নিছক প্রাণের মায়াতেই করেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ, আমরা শুনেছি ক্ষুদিরামের পক্ষের

উকীল বাবুরা অনেক চেষ্টায় তাকে এ রকম স্বীকারোক্তি-সংশোধনে রাজী করেছিলেন। এটা যে তাঁদের অকারণ চেষ্টা, আর তার ফাঁসীটা যে নিশ্চিত, তা জেনেও উকীল বাবুদের অনুরোধেই নাকি স্বীকারোক্তি-সংশোধনে রাজী হচ্ছে ব'লে সে বলেছিল। ক্ষুদিরামের পক্ষ-সমর্থন জন্য মেদিনীপুর, কলকাতা বা পশ্চিম বাংলা থেকে কোন উকীল যান নি। গিয়েছিলেন রংপুর থেকে। বাঙ্গালী চরিত্রের এ-ও একটি মহিমা। মুজঃফরপুরের একজন উকীল মশায় ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে বিশেষ আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন।

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল বা অন্য কারুকে লোক-চক্ষুতে হেয় প্রতিপন্ন করা এ রকম লেখার উদ্দেশ্য নয়। যে লোক-চরিত্রের বা লোক-মতের আমূল পরিবর্ত্তনের ওপর, বিপ্লব (revolution) বা জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণজনক ক'রে, বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনচেষ্টার সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে, সেই চরিত্র-গঠনের পথে, যে প্রবল বাধাকে আমরা চিনতে না পেরে, একমাত্র মঙ্গলের উৎস ব'লে জড়িয়ে ধরে আছি, তার প্রকৃত স্বরূপটি সম্যক্ দেখানই আমার উদ্দেশ্য। আমার বিশ্বাস, ঐ বাধা যতটুকু দূরীকৃত হবে ততটুকু আমরা চরিত্রবলে শক্তিমান হ'তে পারব। আমাদের চরিত্র যে পরিমাণে আমাদের জাতি (nation) গঠনের পোষক হ'য়ে উঠবে, সেই পরিমাণে আমাদের শাসনতন্ত্র আমূল পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হবেই। তখন এ হেন তাণ্ডব লীলার আবশ্যক আর না-ও হ'তে পারে।

যাই হোক্, ঐ মুজঃফরপুরের বোমাটা পিক্রিক এসিডে তৈরী ব'লে সরকারী বোমা সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞেরা যে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৩০শে এপ্রিল সেই বোমা-বিভ্রাট ঘটে। ১লা মে কল্‌কাতায় পুলিসের পরামর্শ-মজলিসে, বারীনের সংস্পর্শে যারা তখন এসেছিল, তাদের যে যেখানে ছিল, সকলকে এক সময় পাকড়াও করা স্থিরীকৃত হয়। ২রা মে প্রত্যূষে সাড়ে তিন কি চারটের সময় নিম্নলিখিত স্থান সকল খানাতল্লাসী আর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১। মাণিকতলা মুরারিপুকুর গার্ডেনে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, কুঞ্জলাল শাহা, পূর্ণ সেন, হেমেন্দ্র ঘোষ, এই চৌদ্দ জন। এ ছাড়া ঐ পাড়ার অন্য বাগানের এক মালী ও ভদ্রলোকের দুটি ছেলেকেও পুলিস ধ'রে এনেছিল। দু'দিন পরে তারা ছাড়া পায়।

২। ১৫ নং গোপীমোহন দত্তের লেনে কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ—ওরফে নির্ম্মল রায়।

৩। ১৩৪ নং হ্যারিসন রোডে কবিরাজ দুই ভাই—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ধরণীনাথ গুপ্ত—এবং অশোক নন্দী। এ ছাড়া যে দু'জন ধৃত হ'য়েছিল, তারা কয়েক দিন পরে ছাড়া পায়।

৪। ৮নং গ্রে ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন্দ্র বোস এই তিন জন।

৫। ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে হেমচন্দ্র দাস (এখন হেমচন্দ্র কানুনগো)।

৬। মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

মাণিকতলা বাগানে ধৃত বারীন প্রভৃতির উল্লেখ অনুযায়ী ও সেখানে প্রাপ্ত খাতাপত্রে লিখিত নামের সন্ধান তাদের কাছ থেকে

জেলে, পরে পরে যাদের ধরা হয়েছিল, তারা হচ্ছে—শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোসাইঁ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, খুলনার সুধীর সরকার, যশোরের বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, মালদহের কৃষ্ণজীবন সান্নাল, সিলেটের তিন ভাই—হেম চন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন ও সুশীল কুমার সেন, নাগপুরের বালকৃষ্ণ হরি কাণে

আমাদের কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে এবং পরবর্ত্তী তদন্তের ফলে কয়েক সপ্তাহ পরে ধৃত হ'য়ে এসেছিলেন—দেবব্রত বসু, ইন্দ্রনাথ নন্দী, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র ওরফে মাণিক দেব, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নিখিলেশ্বর রায় আর চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের প্রফেসর চারুচন্দ্র রায়।

এ ছাড়া দু' তিন মাসের মধ্যে আরও অনেক নির্দ্দোষকে দিন-কয়েকের জন্য ধ'রে জেলে পোরা হ'য়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন স্বনাম-খ্যাত—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

যে ক' জায়গায় খানাতল্লাসী হ'য়েছিল, তার মধ্যে দু'টি স্থান ব্যতীত আর কোথাও, দু'একখানা চিঠিপত্র ছাড়া, বিপ্লবসংক্রান্ত কিছুই পাওয়া যায় নি। উক্ত মুরারিপুকুর বাগানে পেয়েছিল বোমার "সেল" ঢালাই করবার যন্ত্রপাতি, রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল (সর্ব্বসমেত ছ' সাতটা), Nobel's dynamite কতকগুলো, ইলেকৃট্রিক ব্যাটারী, ফিউজ ইত্যাদি, আর mining engineerদের পাঠ্য Explosive দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী শেখাবার ইংরেজী বই দু'খানা; বৈপ্লবিক বোমা তৈরী ও ব্যবহার প্রণালী শেখবার—লিথোতে বৃহৎ পাণ্ডুলিপি একখানা, বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি গঠনপ্রণালীর নিয়মাবলী, অন্যান্য আরও কতকগুলা বই, নোটবুক, কাগজপত্র ইত্যাদি।

হ্যারিসন রোডে কবিরাজদের বাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত কয়েক বাক্স বোমা আর Explosive তৈরীর যন্ত্রপাতি ও মসলা পাওয়া গিয়েছিল।

২রা মের বিভিন্ন স্থানের ধৃত ব্যক্তিদিগকে লালবাজার পুলিস হাজতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পৃথক্‌ভাবে রাখা হ'য়েছিল। বিকেলবেলা পুলিস কোর্টের উঠোনে সকলকে বের করা হ'ল। তখন আমরা সকলে সকলকে দেখে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। কারণ, প্রত্যেক দলই মনে করেছিল, কেবল তারাই ধরা পড়েছে। তখন দেখল, গুপ্তসমিতির বংশে বাতি দিতে আর বাকী প্রায় কেউ নেই। সকলের মুখ অত্যন্ত ভীষণভাবে বিকৃত হ'য়ে গেছল। আমার বেশ মনে আছে, তখন কারও মুখে নির্ভীকতার চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে বড়ই অশুভ লক্ষণ ব'লে বুঝেছিলাম।

সকলে ছেক্‌ড়া গাড়ী বোঝাই হয়ে আগে পিছে এক ঝাঁক গোরা কালা পুলিসের পাহারায় কিড ষ্ট্রীটের সি, আই, ডি, অফিসে খুব জাঁকজমকের সহিত নীত হয়েছিলাম। পথে এমন একটাও চেনা লোক কিন্তু চোখে পড়ল না যে, ভারতের অভূতপূর্ব্ব বীরদের দর্শন লাভ ক'রে ধন্য হয়ে যেতে পারে। রাস্তায় দু'সারি লোকদের মুখের ভাবে তখন বুঝেছিলাম, আমরা যে কি ভীষণ কীর্ত্তিমান পুরুষ, তা তারা জান্‌তে পারে নি, আর তাদের জান্‌বার তেমন প্রবৃত্তিও যেন ছিল না। দশ বারো ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা ভীষণ ব্যাপারের খবর সমস্ত কল্‌কাতাময় রাষ্ট্র হয় নি! এই রকম কোন দুঃখ বা অভিমানের ছায়া যে আমাদের মধ্যে কারো মনে পড়েনি, এ কথা কেউ মাথার দিব্বি ক'রে বল্‌লেও তখন বিশ্বাস করতে পারতাম না। এখন বুঝছি, তখনকার কলকাতাবাসীরা ব্যাপারটার বিশেষ কোন কিছু না বুঝেও ঐ রকম স্থলে নিরাপদ ভাবের উদ্বেল উচ্ছ্বাস কি ক'রে হঠাৎ দল বেঁধে প্রকট করতে হয় তাতে তালিম পায় নি।

তখনও আশা ছিল যে, আমরা যে রকম আগে থেকে সাবধান হয়েছি, তাতে খুব জোর এক বছরের বেশী শ্রীঘর-বাস হবে না। এতে বরং আমাদের জেল থেকে বেরিয়ে এসে কায করবার পক্ষে, বিশেষ ক'রে টাকার সাহায্য পাবার পক্ষে খুব স্থবিধাই হবে। কারণ, কোন গুণ না থাকলেও স্থধু 'জেলে গেছলাম' এই সার্টিফিকেট, তথাকথিত দেশের কায করতে গিয়ে, লোকের কাছে আদর কড়াবার আর আর্থিক, নৈতিক আদি সর্ব্ববিধ সহানুভূতি ও সাহায্য পাবার পক্ষে যথেষ্ট মূল্যবান তকমা হবে ব'লে সেকালেও ধ'রে নিতে পেরেছিলাম। তখনও জানতাম না যে, মুরারিপুকুরে ও হ্যারিসন রোডে কি কি বামাল ধরা পড়েছে, আর বারীন কি রকম "clean breast" দেখিয়েছে বা পরে সে কি করবে।—এই "clean breast কথাটা সকল পুলিস অফিসারের মুখে তখন লেগেই ছিল।

তার পর আমাদের প্রত্যেককে সি, আই, ডি, আফিসে পৃথক পৃথক বসিয়ে পুলিসের এক একজন ধুরন্ধর এক এক দলের একরার করাবার ভার নিয়েছিলেন। বারীন, উপেন প্রভৃতি মুরারিপুকুরের দল ডেপুটী স্থপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট রায় রামসদয় মুখার্জী বাহাদুরের হাতে পড়েছিল। আমার ঘাড়ে চেপেছিলেন মৌলভী সামশুল আলম। তিনি তখন সাব ইনস্‌পেক্টার ছিলেন। আমাদের মোকর্দ্দমা শেষ হতে না হতেই তিনি ডেপুটী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি হয়েছিলেন। আমাদের অন্য দলের ভাগ্যে কে কে জুটেছিলেন মনে নেই। একরার করবার বিষ চেষ্টা খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত চলেছিল। তার পর কোথায় কাকে রেখেছিল জানতে পারি নি। শুনেছিলাম, বারীন সেই আফিসেই সম্মানিত অতিথিরূপে ভোজনের, বিশেষ করে শয়নের যথেষ্ট আনন্দ নাকি উপভোগ করেছিল। অরবিন্দ বাবুর ভাগ্যেও বোধ হয় তা জোটেনি। আমার

রেখেছিল লালবাজার পুলিস কোর্টের হাজতে মুরারিপুকুরে ধৃত পূর্ব্বোক্ত মালীর সঙ্গে। ভোজনের জন্য পেয়েছিলাম মুড়ী, আর শয়নের জন্য কম্বল তাও অত্যন্ত ময়লা। একে বলে এক যাত্রায় পৃথক ফল।

ধৃত আসামীদের একরার করাবার জন্য পুলিষের দ্বারা কি কি violent উপায় অবলম্বিত হয় আগে হতে তা খোঁজ ক'রে জেনেছিলাম। কিন্তু violent কোন উপায়ই আমাদের ওপর প্রয়োগ করা হয় নি। আমাদের ওপর যে কটী কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল তা নেহাৎ মামুলী ও nonviolent.

প্রথমে স্নান আহার বন্ধ করে দেওয়া, তার পর রাত্রিতে ঘুমতে না দিয়ে, ক্রমাগত প্রশ্নের দ্বারা তিতিবিরক্ত ক'রে সহজ বিচার-শক্তিকে একেবারে গুলিয়ে দেওয়া, এই গুলি হচ্ছে আসামীকে একরার করাবার পুলিসের প্রচলিত প্রথা।

আমাদের মধ্যে বারীন ছাড়া প্রায় সকলের প্রতি এই রকমই বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বারীনের জন্য কতকটা উল্‌টো ব্যবস্থাই ফলপ্রদ হবে বলে বোধ হয় রায় বাহাদুর রামসদয় বাবু বুঝে ফেলেছিলেন।

আমায় সে দিন সকালবেলা, একজন গোরা ওয়ার্ডার খানিকটা দুধশূন্য চা আর রুটি যে জন্য দিয়েছিল, সে কারণটা বোধ হয় এই ছিল যে সেএসে প্রথমে আমায় বল্লে, আমার কাছে যদি টাকা কড়ি এবং মূল্যবান জিনিষ থাকে তা তাকে দিতে হবে। সে গুলি যথারীতি আমার নামে সরকারে গচ্ছিত থাকবে। আমি লক্ষ্মী ছেলের মত সোনার বোতাম, আংটী দু'তিনখানা পাথর (আমি তখন jewellery businessএর ভাণ করতাম) ও কয়েকটি টাকা সমেত ব্যাগ তার হাতে দিলাম। সেই সঙ্গে আমার breakfast এর উল্লেখ করেছিলাম। তৎক্ষণাৎ রুটী চা নিয়ে এসে অনেক কিছু

ব'লে আমায় খুসী করে দিয়েছিল। সব মনে নেই। একটামাত্র কথা মনে আছে, সে বলেছিল, কোন দেশে বিপ্লবের আগুন একবার জ্বললে কখনও তা একেবারে নিভে যায় না, আর তার ফল কখনও মন্দ হয় না। তার এত কৃপার কারণ দেড় বছর পরে পোর্টব্লেয়ারে যাওয়ার সময় আমার গচ্ছিত ধনের বদলে পেতলের বোতাম আর আংটীটি মাত্র ফেরত পেয়ে বুঝেছিলাম।

যাই হোক, সে দিন রাত্রিতে দু'টি মুড়ী সেই বিপদের সঙ্গী উড়ে মালীর সঙ্গে ব'সে খেয়েছিলাম। বেচারী কি কান্নাই না কেঁদেছিল!

মনে হচ্ছে, প্রথম রাত্রিতে খুব বেশীক্ষণ জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা হয় নি, অথবা কর্ত্তাদের নিজেদেরই নিদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ তার আগের দুদিন সমস্ত রাত্রি জাগতে হয়েছিল।

সেই দিন প্রথমে মৌলভী সাহেব আমার কাছে প্রেম নিবেদন ক'রে বলেছিলেন, তাঁর মত বন্ধুর কথা মেনে চললে আমার দোষ খণ্ডে যাবে। তিনি মেদিনীপুরে কোর্ট সাব ইন্‌সপেক্টার ছিলেন। এমন মিষ্টভাষী মিশুক, পুলিসের লোকের মধ্যে দেখি নি। মেদিনীপুর কোর্টে আমার প্রায়ই যেতে হত; গেলে তাঁর আফিসে আড্ডা দিতাম। সেই সূত্রে বন্ধুত্বের দাবী ও প্রেম নিবেদন।

না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন ক্রমাগত আঁতের কথা নিয়ে পুলিস নামক জীবের সঙ্গে নিয়ত বক্‌বক্ করলে পেসাদার আসামী ব্যতীত খুব কম লোকেই মাথা ঠিক রাখতে পারে। এই রকম করে কিছু না কিছু অপরাধ প্রকাশ করে ফেলতে আসামীরা বাধ্য হয়ে থাকে। একবার কোন গতিকে একটু প্রকাশ করে ফেললে আর চেপে রাখা বড়ই শক্ত।

এ ছাড়া রাম সদয় বাহাদুর বারীন প্রভৃতির ওপর কিন্তু আর একটা অভিনব কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। তার নামকরণ কি যে করব,

খুঁজে পেলাম না। তাই বারীন উপেনের কাছে পরে যা শুনেছিলাম, তার সার মর্ম্ম এখানে প্রকাশ ক'রে বলি।

প্রথম দর্শনেই উক্ত বাহাদুর, বারীন, উপেন প্রভৃতিকে বহু দিনের অভিন্নহৃদয় বন্ধুর মত প্রগল্ভ আদরে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর অগাধ হৃৎপিণ্ডে দেশহিতৈষণা আর বিপ্লববাদ হুগলী নদীর চোরাবালির মত নিয়ত প্রচ্ছন্নভাবে যে বিদ্যমান, তা নাটকীয় ভাবভঙ্গী সহকারে চুপি চুপি বলেছিলেন; যেহেতু, ওটা তাঁর অন্তরের কথা; পুলিসের চাকরীটা বাইরের। প্রমাণস্বরূপ বলেছিলেন, তাঁর সহধর্ম্মিণী (যিনি কোন দেশীয় স্বাধীন রাজার নিকট-সম্পর্কীয়া), বেদপুরাণে যার তুলনা নেই এমন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অতগুলি দেশভক্তের গ্রেপ্তারের সমাচার পেয়ে অবধি আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কেবলই কাঁদছেন আর তাদের দেখবার জন্য অস্থির হয়েছেন। তাই তাঁর সহধর্ম্মী রায় বাহাদুর বারীন প্রভৃতিকে পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নিতান্ত বিনয়ের সহিত তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। আরও কত রকম ঢং ক'রে তাদের বিশ্বাস করিয়ে দিলেন যে, তাঁর মত তাদের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু আর এ ভূ-ভারতে নেই। এ হেন বন্ধুর একমাত্র উপদেশ এই যে, গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে তারা বীরপুরুষের মত মুরারিপুকুর বাগানে যা স্বীকার করেছে, তাতে তাদের বিশেষ কিছু সুফল ফলবে না; যেহেতু, তা সম্পূর্ণ নয়; সেই হেতু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সব কথা সম্পূর্ণ ক'রে বল্‌তে হবে; তা হলেই তাদের বে-কসুর খালাস সম্ভব।

রায় বাহাদুরের শুভ-ইচ্ছার অকৃত্রিমতা এবং তাদের খালাস সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবার জন্য, সকল মুস্কিল আসানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমোঘ উপায় যে লক্ষ ব্রাহ্মণের (কি কমলাকান্তের ঠিক মনে নাই) পদধূলি, তা তাঁর হাতের মাদুলীর মধ্যে বিদ্যমান, এই ব'লে খানিকটা জলে মাদুলী

খুয়ে বারীন প্রভৃতিকে খেতে দিলেন। তারাও খেল। তার পর বাছাদের চাঁদমুখ মলিন হয়ে গেছে ব'লে ব্যথা জানিয়ে ভাল ভাল খাবার আর কেওড়া-বরফ দেওয়া জল আনতে বরাত করলেন। ইতিমধ্যে গোলাপ-জলে তাদের মাথাগুলি ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন। তখন বারীন, উপেন, উল্লাস অন্যের নাম ধাম ও দোষ উল্লেখ করবে ব'লে পরামর্শ ক'রে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। এর আগে বাগানে অনুসন্ধানের সময় পুলিসের প্রশ্নের উত্তরেও অনেক কিছু বলেছিল। এই সব পরদিন রবিবার খবরের কাগজেও প্রকাশিত হয়েছিল।

ওরা মে রবিবার সকাল থেকে আবার রাত ১২টা কি ১টা অবধি অবিশ্রাম কথা বলাবার চেষ্টা হয়েছিল। একজন অফিসার থ'কে গেলে আর এক জন এসে গোড়া থেকে গাওয়াতে সুরু করেন। সে দিন কারো ভাগ্যে দু'টি খিচুড়ী, কারো দু'টি মুড়ী, আর অনেকের ভাগ্যে কিছুই জোটে নি। মে মাসের গরমে, স্নান আহার, এমন কি, মুখ না ধুয়ে বা মুখে একটু জলও না দিয়ে, নিয়ত বক্‌বক্ ক'রে মাথা ঠিক রাখা যে কি মুস্কিল, তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে বোঝা শক্ত। সে দিন আমি সকাল থেকে মৌনব্রত নেব ব'লে আগের রাত্রিতেই ভেবে চিন্তে ঠিক করেছিলাম। সেইমত অনেক্ষণ কারো কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাকার পর, মৌলভী সাহেব বারীন, উপেন প্রভৃতির confession বেরিয়েছে ব'লে, একখানা "Statesman" আমায় দেখতে দিলে, পড়বার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। প'ড়ে যা দেখলাম, তার মধ্যে যা তখনও একটু লেগেছিল ভাল, তা হচ্ছে ছাপা অক্ষরে নিজের নামটা। ঐ রকম কোন ভাব আমার মুখে লক্ষ্য করবার জন্য অনেকগুলি চোখ যে তাক করেছিল, তা বেশ বুঝেছিলাম। কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে আবার মৌনী হয়ে রইলাম। আমার নাম আর অপরাধ প্রকাশ হয়ে গেছে

দেখলে, আমারও confession দেবার প্রবৃত্তি জেগে উঠতে পারে, এই আশায় বোধ হয় কাগজখানা আমায় দেওয়া হয়েছিল।

"Statesman"এ লিখিত সুদীর্ঘ স্বীকারোক্তির সকল কথা মনে নেই। কিন্তু তার তিনটি বিশেষ কথা মনে আছে।

বারীনের স্বীকারোক্তিতে এই রকম ভাবের কথা ছিল যে, বারীনই বাংলা দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির একমাত্র প্রবর্ত্তক নেতা, আর উপেন উল্লাস প্রভৃতি তার সহকারী মাত্র ছিল। কিন্তু উপেন ও উল্লাস বলেছিল, তিন জনেই নেতা। তারা পৃথক্ পৃথক্ বিভাগের ওপর কর্ত্তৃত্ব করত। নেতা ব'লে জাহির হওয়ার প্রবৃত্তিটা কত মজ্জাগত, তা এতে একটু বোঝা যায়। প্রকৃত নেতা ছিল কারা, তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয়তঃ, মুজঃফরপুর হত্যা অপরাধের সঙ্গে এই তিন জনের প্রত্যেকেই সম্পর্ক অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছে।

তৃতীয়তঃ তখনও গ্রেপ্তার হয়নি, এমন অনেক লোকের নাম উল্লেখ করেছিল—যাদের সন্ধান পাওয়া পুলিসের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এদের মধ্যে নরেন গোসাইঁও ছিল। এই নামকরণের ফলে যারা ধৃত হয়েছিল, তাদের নাম পূর্ব্বে লিখেছি।

আন্দাজ চারটার সময় এলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, তখন তিনি ইনস্পেক্টার। তার পর না কি তিনি অনেক কিছু হয়েছেন। আমরা ধরা পড়বার আগে পর্য্যন্ত ঐ মানুষটিকে সি, আই, ডি, বিভাগের যত নষ্টের গোড়া ব'লে জানতাম। তাই তাঁর নাড়ী-নক্ষত্র জানবার জন্য কত চেষ্টাই না করেছিলাম। সে জন্য তাঁর সঙ্গে একটু রসিকতা করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। তখন ব'লে ফেললাম, তিনি যদি বরফ দেওয়া জল এক খগ্লাস খাওয়াতে পারেন, তবে তাঁর কথার উত্তর

দেব। তাঁর হুকুম মত তৎক্ষণাৎ তাঁর খাসমহল হ'তে মুর্গী, ডিম্ব ইত্যাদি আধা সাহেবী আধা বাঙ্গালী কায়দায় তৈরী এমন সব খাবার এসেছিল, আর তা দু'দিনের অনাহারের পর এমন উপাদেয় লেগেছিল যে, আজও ভুল্‌তে পারি নি। যাই হোক, লাহিড়ী মশায় একরার করাবার কুমৎলবে কোন কথাই বলেন নি, মনে আছে।

গত রাত্রির মত প্রত্যেক দলকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাখা হয়েছিল। ফিনিক্‌স্‌বাজার থানার ক্ষুদ্র হাজতের এক ধারে ন্যাকারজনক হরেক রকম দুর্গন্ধের মধ্যে একটা ছেঁড়া দুর্গন্ধ কম্বলের ওপর স্থান পেয়েছিলাম—আমি, আমাদের অবিনাশ; আর সঙ্গী ছিল নেশাতে অর্দ্ধমৃত দু'টি গো-শকট-চালক; তার পাশেই ছিল সুবৃহৎ শৌচের গামলা। কল্‌কাতার মধ্যস্থলে এমন বীভৎস কাণ্ড সে দিন যেমনটি সেখানে দেখেছিলাম, তেমনটি আর কোথাও দেখি নি। ঐ ঘরের মধ্যস্থলে একটা তক্তপোষ barricade রূপে খাড়া ক'রে রাখা; অন্য ধারে বেচারী নির্দ্দোষ নগেন কবরেজ আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ব'সে; আর তার সাম্‌নে এক জন সশস্ত্র সিপাই দাঁড়িয়ে নিশা যাপন কর্‌ছিল। মাঝে একবার সেই থানার ইন্‌স্পেক্টারের মেম সাহেব আর মেয়েরা এসে ভীতিবিহ্বল নেত্রে দেখে গেছলেন নগেনকে; আমাদের নয়।

৪ঠা মে সোমবারও আমাদের না নাইয়ে না খাইয়ে দশটার সময় পুলিস কোর্টে হাজির করেছিল। সেখানে কমিশনারের কাছে কেউ একরার, কেউ এজাহার দেবার আর অনেকে কিছু না দেবার পর, আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লীর এজলাসে আমাদের সকলকে একে একে হাজির করা হয়েছিল। আমাদের অধিকাংশই আবার কিছু না কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। যারা দেয় নি, তাদের মধ্যে

অরবিন্দ বাবু না কি বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্য কোন উকীলের মারফত জজসাহেবকে আবশ্যক হ'লে জানাতে পারেন। আর এক জন বলেছিল, সে গুপ্ত সমিতি আদি সম্বন্ধে কিছুই জানে না; এ ছাড়া আপাততঃ, এমন কি নিজের নাম-ধাম ইত্যাদি বলাও সে উচিত মনে করে না। আর কয়েক জন কিছুই জানে না ব'লেছিল। উপেন, বারীন, উল্লাস প্রভৃতি আবার বিশেষ ক'রে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল।

তারপর সকলকে ক্রমে ক্রমে আলিপুর জেলে (এখন তার নাম হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেল) পাঠান হয়েছিল।

যে-একরারকারীদের এ যাবৎ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে রাখা হয়েছিল। সেই রকম পৃথক্‌ভাবেই জেলে পাঠান হ'ল। অরবিন্দ বাবুকে আবার তা থেকে পৃথক্ ক'রে রাখা হয়েছিল। জেল ফাটকের বাইরে নতুন আগন্তুক কয়েদীদের শুদ্ধ ক'রে নেবার জন্য স্নানের ব্যবস্থা ছিল। আমরাও অনেক দিন পরে স্নান ক'রে শুদ্ধ হয়ে জেলে ঢুক্‌লাম।

জেলখানার ভীষণতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হ'তেই একটা ভারী খারাপ ধারণা ছিল। তার ওপর তিন দিন হাজতে যে দুর্দ্দশা ভোগ করেছিলাম, তাতে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু জেলে ঢুকেই একটা লোহার থালিতে অর্থাৎ তাবাতে রেঙ্গুন চালের গরম গরম ভাত, মশলা আর প্রচুর তেল দিয়ে হিন্দুস্থানী কয়েদী পাচকের দ্বারা প্রস্তুত অড়হর দাল, মাছ আর শাক-পাতড়া দিয়ে রাঁধা ভোজপুরী ঘণ্ট, সমস্ত দিন উপোসের পর সন্ধ্যেবেলা এত ভাল লেগেছিল যে, সারাজীবন জেলখানাতে কাটিয়ে দিতে পারব ব'লে তখন আশা হয়েছিল। আমাদের গুপ্ত সমিতির আড্ডাগুলোতে যে রকম খাওয়া-দাওয়া আর

বিছানাদির ব্যবস্থা ছিল, তার পরিচয় আগে দিয়েছি; তার তুলনায় জেলের ব্যবস্থা অনেক অধিক স্বাস্থ্যকর, সঙ্গত ও ভোগ্য ব'লে মনে ক'রে আর বর্ত্তমান ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যে অপরাধে আমরা আসামী হয়েছিলাম, ঠিক সেই অপরাধে মুসলমান-রাজত্বে, বিশেষ ক'রে হিন্দু-রাজত্বে ধরা পড়লে যে কি রকম অমানুষিক নির্যাতন ও অকথ্য অবর্ণনীয় দণ্ডের বিধান হ'ত, তার তুলনায় আমাদের প্রতি ইংরেজ সরকারের ব্যবহার অনিন্দ্যনীয় সভ্য না হ'লেও অনেক বেশী যে ভব্য, তা ভেবে তখনকার অতুষ্ট মনকে তুষ্ট করতে পেরেছিলাম। সে রাত্রিতে একটা একটু বড় রকম কুঠরীতে নিরাপদ, কানাই, অবিনাশ, শৈলেন ও আমি ছিলাম। এমন একটা দুর্ঘটনার পর এতগুলি সহকর্ম্মীর সঙ্গে প্রাণ খুলে সুখ-দুঃখের কথা কয়ে খানিকটা দুঃখের লাঘব হয়েছিল আর ধরা পড়া ব্যাপারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। অকারণ ধরা পড়ার অনুশোচনায় সকলেই ম্রিয়মাণ হয়েছিল। বাকী সকলের প্রত্যেক্ তিন জনকে এক একটা সেলে রেখেছিল। দু'জনকে এক সঙ্গে রাখা জেল-নিয়মে নিষিদ্ধ।

পরদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আমার আবার সি, আই, ডি, আফিসে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়েই দেখলাম,—বারীন বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায় একমাত্র নিজের যত্ন-চেষ্টায় বৈপ্লবিক সমিতির কেন্দ্র স্থাপন ক'রে, কি রকম অব্যর্থ বিপ্লব আয়োজন করেছিল, তার আষাঢ়ে গল্প রায় বাহাদুর, গুণমুগ্ধ ভক্তের মত শুনে ধন্য ধন্য করছিলেন।

আমার তলবের কারণ বারীণের কাছে শুনলাম। সে রায় বাহাদুরকে কথা দিয়েছে, যদি আমায় তার সঙ্গে এক রাত্রি থাকতে দেয়া হয়, তবে সে আমায় স্বীকারোক্তি দিতে রাজী ক'রে দেবে।

বারীনের সঙ্গে ব'সে অনেক রকম খাবার খেলাম; আমার সুখ্যাতিও অনেক শুনলাম।

বারীনের কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ দেখে এবং এত বড় দুর্ঘটনার পর আমার সঙ্গে দেখা হ'তে, তার এমন বে-পরোয়া ভাবে আমাদের সমিতি সম্বন্ধে আমাকে উদ্দেশ ক'রে কথা কইতে শুনে, তখন মনে হয়েছিল, রায় বাহাদুরের স্তোকবাক্যে, অব্যাহতি সম্বন্ধে সে নিজে ত নিশ্চিত হয়েছে, আমাকেও তা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছে।

রামসদয় বাবু কিন্তু আমার গতিক দেখে হতাশ হয়েছিলেন। তাই আমার ওখানে যাওয়ার প্রায় আধঘণ্টা পরে বারীনকে বলেছিলেন, একটু আড়ালে গিয়ে আমার সঙ্গে কথা কয়ে সুবিধে হবে কিনা দেখতে। যদি হয়, তবে রাত্রিতে আমাদের এক সঙ্গে থাকতে দেবেন। সি, আই, ডি, আফিসের ভেতর আড়াল ব'লে কোন কিছু যে থাকতে পারেনা, বারীনকে কিন্তু তা বোঝাতে পারলাম না। অগত্যা সেই তথাকথিত আড়ালেই আমাদের বোঝাপড়া আরম্ভ হল। প্রথমটা সে যে বক্তৃতা সুরু করেছিল, তার সারমর্ম্ম—এ দেশের কল্যাণের জন্য আমরাও স্বীকারোক্তি আবশ্যক। তাতে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছিল, তা শোনবার দিকে আমার মন বিশেষ দিতে পারি নি। আমার একমাত্র ভাবনার বিষয় হয়ে ছিল কি করে তাকে দেশের এ হেন উৎকট মঙ্গল করবার ব্যাধি হতে মুক্ত করা যেতে পারে।

অনেক ভেবে চিন্তে ঐ ব্যাধির যে এক টোটকা ব্যবস্থা করেছিলাম, তা একবারে ব্যর্থ হয়েছিল। নিজে থেকে কোন যুক্তি দিয়ে স্বীকারোক্তি কেন, তার যে কোন কথার অ-যুক্তি প্রমাণ কর্ত্তে যাওয়া কি রকম বাতুলতা, তা এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখান হয়েছে।

কিন্তু তার সেজদা'র নাম করে কিছু বললে তা রাখলেও রাখতে

পারে, এই আশায় তার বক্তৃতার শেষে বলেছিলাম, অরবিন্দ বাবুর সঙ্গে আমাদের পাঁচ জনের দেখা হয়েছিল; তিনি আমাদের বিশেষ করে ব'লে দিয়েছেন যে, যারা confession দিয়েছে, তাদের, বিশেষতঃ বারীনের সঙ্গে দেখা হলে যেন ব'লে দি, তারা যা কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছে' তা যেন প্রত্যাহার (retract) করে। কারণ, উকীলের সঙ্গে পরামর্শ না করে আসামীর পক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনও উচিত নয়। যদি কিছু বলতে হয়, তা উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই উকীলের দ্বারা বা নিজে বলা উচিত। Retract করলে স্বীকারোক্তির দোষ খণ্ডে যায়। এতেও যখন বারীন ভিজল না, তখন বলেছিলাম, বিবেচনা করে দেখা উচিত, তার এ রকম স্বীকারোক্তি দেশদ্রোহিতা ব'লে বিবেচিত হতে পারে কি না। এই না শুনে বারীন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যা বলেছিল, তার মর্ম্ম হচ্ছে, সে এই স্বীকারোক্তি দিয়ে যা করছে, তা বোঝবার ক্ষমতা সেজদা' বা কোন উকীলের নাই। আমরা সব ভীরু কাপুরুষ। "অরবিন্দ এ সব কি বোঝে ?" (বারীনের মুখের কথা) এই রকম অনেক কিছু শোনবার পর বারীন অন্যের নাম প্রকাশ করলে কেন, তা জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, সে মিথ্যা কথা বলতে আমাদের মত অভ্যস্ত নয়। অত্যধিক উত্তেজনার বশে আরও অনেক কিছু বলেছিল।

রায় বাহাদুর সব দেখছিলেন আর ভাবে গতিকে সব বুঝছিলেন। আমাদের ঝগড়া আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় ভেবেই বোধ হয়, আমায় সরিয়ে নিয়ে, বারান্দায় এক জন সার্জ্জেণ্ট ও দু'জন কন্‌ষ্টেবলের জিম্মায় পেছন দিকে দু'হাতে হাতকড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন, আর অন্যত্র উচ্চহাস্তে বারীনের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

খানিক পরে আমায় লালবাজার পুলিস হাজতে নিয়ে যেতে হুকুম হল। কোমরে একটা কাছি বেঁধে দু'জন কন্‌ষ্টেবল দু'ধার থেকে তার

দু মাথা সাবধানে ধরে হাতকড়া সমেত হাঁকিয়ে নিয়ে চল্ল। সার্জেণ্ট সাহেব পেছনে ছিল। এতে বুঝেছিলাম রামসদয় বাবুও আমার ওপর কম চটেন নি।

যাই হোক, এই ভাবে আমায় নিয়ে গিয়ে লালবাজার পুলিসকোর্টে'র এক বৃদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে সঁপে দিল। তিনি আমার আপাদ-মস্তক অনেকক্ষণ দেখে, আফিসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে টেলিফোনে খুব সম্ভব রায় বাহাদুরের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করলেন। সেই ঝগড়ার দু'একটা কথা যা কাণে এসেছিল, তাতে বুঝেছিলাম, উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপরিওয়ালার হুকুম ব্যতীত আমায় নির্যাতন করতে নারাজ। আমি হাজতে বন্ধ হলাম। সঙ্গী কেউ ছিল না। বড়ই উদ্বেগে রাত কাটল।

পরদিন সকালে আমায় আবার জেলে নিয়ে গিয়ে এক অতীব নির্জ্জন কুঠরীতে বন্ধ করেছিল। একজন জেলের সিপাই ও আর এক জন পুলিসের কন্‌ষ্টেবল সব সময় পাহারায় নিযুক্ত থাকৃত। যারা খাবার দিতে বা অন্য কাজে আসৃত, তাদের কথা বলার হুকুম ছিলনা। এই ভাবে মনে হয় চার পাঁচ সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। স্বীকারোক্তির জন্য এও একপ্রকার নির্যাতন; কিন্তু অতি ভীষণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান প্রদান যে মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় কথা তখন তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম।

বারীনের এই স্বীকারোক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। গোড়াতে এদেশে কি করে বিপ্লবভাবের আমদানী, প্রচার ও বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির পত্তন হয়েছিল, তা এই স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করেই অনেক দেশী ও বিদেশী ইতিবৃত্তলেখক (যেমন বিখ্যাত ভ্যালেণ্টাইন চিরোল সাহেব) বাংলার বিপ্লব অনুষ্ঠানের গোড়ার বিবরণ লিখেছেন। যে হেতু এই স্বীকারোক্তি স্বতঃপ্রণোদিত ও নিষ্কাম ভাবে প্রদত্ত, সেই

হেতু অভ্রান্ত সত্য ব'লে রাউলাট কমিশন রিপোর্টে গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যতেও অনেক স্থলে গৃহীত হতে পারে। সেই জন্য এই স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

বারীনের এই স্বীকারোক্তির জন্য প্রকৃত রূপে দায়ী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র অর্থাৎ আমাদের দেশপ্রচলিত শিক্ষা দীক্ষা রীতি নীতি ইত্যাদি, আর জাতীয় চরিত্রের রীতি নীতির আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত জনসাধারনের কোন প্রকার উন্নতি যে সম্ভবপর নয়, এইটিই বিশেষ করে দেখান এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ছদ্ম নামে যেমন অনেকের কথা লিখেছি, বারীনের সম্বন্ধে তেমন করা সম্ভব হয়নি। অথচ বারীনের অনুকরণ এখনও দেশে খুবই চলেছে। আর তা লোক মতের বেহুস সহানুভূতিও পাচ্ছে। আমার মনে হয়, এর প্রধান কারণ আমাদের তথা কথিত বিপ্লব চেষ্টার কেবল গৌরবের দিকটা এত বেশী করে দেখান হয়েছে যে, লোকে মনে করে সেইটেই যেন বিপ্লব প্রচেষ্টার একমাত্র স্বার্থকতা। বর্ত্তমান সময়ের অব্যবস্থিত জাতীয় চরিত্র আর অসঙ্গত লোকমত যে জন সাধারণের উন্নতির পরিপন্থী, এবং তথাকথিত বৈপ্লবিক নেতারা কি রকম অবিমৃশ্যকারী তা' সম্যক জানলে বোধ হয় কোন দেশ-হিতকামী বিপ্লব পন্থী এখন আর আমাদের অনুকরণ করবেন না। যাক্ এখন আসল কথা বলি।

মুরারিপুকুর বাগানে গ্রেপ্তার হওয়ার পর-মুহূর্ত্তেই বারীন বঙ্কিম বাবুর ভবানী পাঠকের অনুকরণে নাকি "My mission is over" ব'লে যেখানে যা লুকনো ছিল, তা পুলিসকে দেখিয়ে দিল। যা হাতে-পাতে ধরা প'ড়ে গেছে, তার সম্বন্ধে কোন কিছু লুকোন বা অস্বীকার করা শুধু অনাবশ্যক নয়, তাতে একটু হীনতা প্রকাশ পায়; আর তা না ক'রে সহজভাবে সব প্রকাশ ক'রে দেওয়ার

মধ্যে একটা বাহাদুরী দেখান হয়। এই মনোভাব, বারীন যেভাবে লুকনো জিনিষ দেখিয়ে দিয়েছিল আর পুলিসের প্রশ্নের যেভাবে উত্তর দিয়েছিল, তাতে প্রকাশ পেয়েছিল। অনেক ব্যাপারে দেখা যায়, সাধারণ চোখে যা উচিত ব'লে মনে হয়, আইনের চোখে তা অন্য রকম। এ রকম ব্যাপার আইনজ্ঞ না হয়েও common senseএর সাহায্যে বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব মাথায় ঢুক্‌লে সাধারণ বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু ধোঁয়াটে মেরে যায়।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছুদিন থেকে 'ক'বাবু, অন্যান্য কর্ত্তারা আর বারীন, উপেন প্রভৃতি উপনেতারা বৈপ্লবিক ব্যাপারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ব্যাপারের সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন এবং বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের ধ্যান-ধারণা, নাক-টেপা আদি অবশ্যকর্ত্তব্য হয়েছিল। কারণ, এরূপ "আদেশ" ও নাকি তখন ওপর থেকে হয়েছিল যে, সাধনায় সিদ্ধ না হ'লে দেশের কায করবার কারও অধিকার নেই। 'ক'বাবু হয় ত সিদ্ধ হব হব করছিলেন, কিন্তু বারীন, উপেন প্রভৃতি তখন নাকি অর্দ্ধ-সিদ্ধ মাত্র হয়েছিল। এই কারণে বিপ্লব-ব্যাপারের সঙ্গে প্রচলিত আইনের কি সম্বন্ধ, সে খোঁজ করবার অবসর হয়নি। এমন কি, গ্রেপ্তার হ'লে কি বলা আর করা উচিত, সে কথা আগে হ'তে স্থির ক'রে সকলকে তা জানিয়ে রাখা যে উচিত, কর্ত্তারাও তা ভেবে দেখবার অবসর পান নি। অথবা পুলিস-কর্ম্মচারীকে এত বেশী বোকা আর নিজেদিগকে এত বেশী চালাক মনে করতেন যে, ধরা যে কখনও পড়বেন, এ আশঙ্কা কখনও মনে জাগে নি। তাই আগে হ'তে তেমন কোন কিছু ভেবে রাখবার আবশ্যকও হয় নি। যাই হোক, এই পর্য্যন্ত বারীন যা করেছিল, তা স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে

নিষ্কামভাবে করেছিল—বলা যেতে পারে। যারা তখনও ধরা পড়ে নি, তাদের নাম অথবা যারা ধরা পড়েছিল, তাদের দোষ প্রকাশ করতে নাকি বারীন প্রথমে দ্বিধা বোধ করেছিল। কিন্তু রামসদয় বাবুর যে মন্ত্রের জোরে উপেন, উল্লাস প্রভৃতিকে শুধু স্বীকারোক্তি নয়, অন্যের নাম ও দোষ প্রকাশ করতে বুঝিয়ে সুজিয়ে বারীন রাজী করেছিল এবং নিজেও অন্যের নাম ও দোষ প্রকাশ করেছিল, সে মন্ত্রের প্রধান সূত্র ছিল অব্যাহতির আশা।

ওরূপ অবস্থায় অব্যাহতির প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করা বারীনের পক্ষে সহজ হয়েছিল এই জন্য যে, সে সেই ভাবপ্রবণ দেশের বিশেষ এক জন, যে দেশে ভাবপ্রবণতার প্রকোপে কয়েক বছর আগে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সুপ্রভাতে স্বরাজের আগমন প্রত্যাশায়, দেশের ধীমানগণ অন্ধ বিশ্বাস প্রবণতার যে উৎকট লীলা প্রকট করেছিলেন, তা বাংলাদেশে বিস্ময়ের কারণ না হ'লেও, জগতের লোকের কাছে তার সম্ভাব্যতা ধারণার অতীত। এটাও অতীব সত্য কথা যে, যারা এই বৈপ্লবিক কাণ্ডে যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলেই ভারতের মত চির-অধীনতার দেশকে বর্ত্তমান অবস্থায় মাত্র পাঁচ ছ' বছরে ইংরেজের কবল হ'তে পূর্ণরূপে স্বাধীন করবার আশায়, অসঙ্কোচে বিশ্বাস করত ব'লেই এমন ভীষণ বৈপ্লবিক ব্যাপার, যাতে ফাঁসী কিম্বা নিদেনপক্ষে জেলবাস সুনিশ্চিত ছিল, তাতে আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছিল। এই "বকাণ্ড-প্রত্যাশা-ন্যায়ের" মর্য্যাদা আমরা সকলেই কিছু না কিছু রক্ষা করতাম। কিন্তু বারীন ছিল এর শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা। কল্পনার আকাশকুসুম বারীনের কাছে কি রকম ক'রে প্রত্যক্ষ ঘটনায় পরিণত হ'ত, তা পূর্ব্বে দেখিয়েছি।

পারিপার্শ্বিক নৈতিক অবস্থা বা লোকমতের প্রভাব বারীনের ওপর কি রকম কায করেছিল, তাই আমাদের এখন দ্রষ্টব্য।

বারীন ধরা পড়বার জন্য যে প্রস্তুত ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। তার উদ্দাম আশা আকাঙ্ক্ষাদি তখনও অপূর্ণ ছিল, এ অবস্থায় হঠাৎ ধরা পড়ারূপ অকূল সমুদ্রে, রামসদয় বাবুর ইঙ্গিতে confessionরূপ তৃণখণ্ডকে মুক্তির একমাত্র উপায় ব'লে আশ্রয় করা ত তার মত কল্পনাপ্রবণের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

গোসাঁইর হত্যার পর যখন আমাদের অনেকে পুলিসকে information দিতে সুরু করেছিল, তখন তার নৈতিক সমর্থন এই ব'লে করত যে, তারা এই information দিয়ে যে অন্যায় করল, information দেবার ফলে অব্যাহতি পেয়ে তার চেয়ে দেশের অনেক কায ক'রে অনেক বেশী ঐ অন্যায়ের প্রতীকার করতে পারবে। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে বিশেষ ক'রে বলব।

আমরা পোর্ট-ব্লেয়ারে যাবার পর যে সকল বৈপ্লবিক কাণ্ড ও হত্যা দেশে ঘটেছিল, তার সম্বন্ধে আমাদের কাছে information নেবার জন্য সি, আই, ডির বড় কর্ত্তা ডেনহাম সাহেব ও পরে টেগার্ট সাহেব সেখানে গেছলেন। আমাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পৃথক্‌ভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে বাক্যালাপ চলেছিল। তাঁরা কাকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর কে কি উত্তর দিয়েছিল, সকলেই সকলের কাছে তা জানতে চাইত। ঐ স্থলে বারীন আমাদের সকলকে যা বলত তার সার মর্ম্ম এই যে পুলিসকে আগে যা দিয়েছে, তার বদলে গভর্ণমেণ্ট তাকে কি দিয়েছেন যে আবার information সে দিতে যাবে। এই অভিমান উক্তির খোঁচা জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, চিফ কমিশনার, কাউকে সে দিতে ছাড়ে নি।

যদিও গোসাঁই'র এগ্রুভার হওয়ার পর রামসদয় বাবুর প্রতিশ্রুত তার খালাসের আশা অনেকটা চ'লে গেছল, তবু গোসাঁইকে জেলের মধ্যে হত্যা করবার প্রস্তাবে বারীন অনেক বার বাধা দিয়েছিল। তার অজুহাত এই ছিল যে, ঐ ব্যাপারে নির্দ্দোষ অরবিন্দ বাবুকে নাকি জড়ান হবে। অথচ তার উদ্ভাবিত জেল ভেঙ্গে পালাবার প্রস্তাবে, আমাদের মধ্যে যাঁরা গররাজী ছিলেন, তাঁদের রাজী করতে বারীন অশেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতেও যে অরবিন্দ বাবুকে জড়ান হ'ত, তা সে গ্রাহ্য করে নি।

পুলিসের প্ররোচনায় আমার নিজের মনেও information দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার প্রবৃত্তি সাড়া দিয়েছিল, তাই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, অন্য সকলের মনেও কিছু না কিছু ঐ প্রবৃত্তি নিশ্চয় জেগেছিল। কার মনে কতটুকু তা জেগেছিল এবং সে জন্য কে কি করেছিল, তা জানবার জন্য অনেক রকম উপায় অবলম্বন করেছিলাম। সে জন্য সকলের অপ্রীতিভাজনও হ'তে হয়েছিল। তাতে জেনেছিলাম, অন্য যারা confession দিয়েছিল আর গোসাঁই'র হত্যার পর অনেকে যারা উপযাচক হয়ে information দিয়েছিল, তাদের সকলেরই প্রধান motive ছিল অব্যাহতি।

কয়েক জনকে গীতাপাঠে অত্যধিক মনোযোগী দেখে তার কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে দেখেছিলাম, গীতা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, গীতাপাঠে সমস্ত মুস্কিল ত আসান হয়ই, সেই সঙ্গে রাজদণ্ড হতে মুক্তিলাভও হয়।

আমাদের মামলার শেষ নাগাদ যখন উল্লিখিত উপায়গুলি ব্যর্থপ্রায় হয়েছিল, তখন দেবব্রত বাবুর অনুকরণে অনেকে জজ সাহেবের ওপর will force আর hypnotic suggestion প্রয়োগের সাধনা

আরম্ভ করেছিল। এ ছাড়া অনেকে জজসাহেবকে প্রেমের দৃষ্টি হেনে, প্রেমের প্রতিদান স্বরূপ খালাসের প্রত্যাশা করেছিল। যারা বেকসুর খালাস হয়েছিল, তা যে এই জন্য হয় নি, তা আমি বলছি না। আমার বক্তব্য এই যে সকলেরই খালাস পাবার একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি জেগেছিল—তা যে কোন উপায়ে হোক না কেন। আর বারীনেরও তা জেগেছিল একটু বেশী রকম। তা প্রকাশ পেয়েছিল যে সকল কথা বা ঘটনা থেকে, তার একটা হচ্ছে এই—একলা তাকে দুদিন হাঁটিয়ে আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে, সে British born ব'লে দাবী করবে কি না, বলাতে নিয়ে গেছল। যাবার আগে তার ভক্তদের দুদিনই বলে গেছল, কোর্টে যাবার পথে কনষ্টেবলের হাত থেকে নিশ্চয় কেউ না কেউ তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে পারে; তার পর সে আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করবে, সে জন্য আমাদের কি রকম প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

এখন দেখা যাক, অব্যাহতি পাবার আশা ছাড়া স্বীকার- উক্তি দেবার অন্য কি কারণ ছিল, বিশেষতঃ এই স্বীকারোক্তির ওপর আমাদের দেশের লোকমতের বা নৈতিক শিক্ষার কতটা প্রভাব ছিল?

গুপ্তসমিতির কথা ছেড়ে দিলে Confession জিনিষটা সাধারণতঃ সব সময় দূষণীয় না-ও হ'তে পারে। কিন্তু betray করা জনিত দোষের গুরুত্ব-বোধ বারীনের বা আমাদের দেশের লোকের নাই কেন? নিজ মুখে দোষ স্বীকার করলে লোকে ধন্য ধন্য করে। বিশেষতঃ দল বেঁধে কোন দোষের কায ক'রে, সহযোগীদের দোষ প্রমাণ করতে পারলে, নিজের দোষ ত খণ্ডে যায়, অধিকন্তু নিজের সাধুতা আবার বেশী ক'রে ফিরে আসে। এই betray করা অর্থাৎ অন্যের দোষ প্রকাশ ক'রে তাকে দোষী করা, আমাদের নীতিতে দূষণীয় ত নয়ই, বরং গৌরবের বিষয় ব'লেই বিবেচিত হয়। তাই বোধ হয়,

এই betray শব্দটির প্রতিশব্দ আমাদের সাধুভাষায় নেই অথবা আমি জানিনে। "চুকলী" ব'লে কথাটা betrayal এর ঠিক প্রতিশব্দ নয়। যাই হোক্, এই শব্দটা মহত্ত্বব্যঞ্জক না হ'লে নারদ মুনি দেবর্ষি ব'লে পূজিত হবেন কেন?

স্বদেশের, স্বপক্ষের বা নিজের কোন গুপ্ত রহস্য, যা বিপক্ষ জানতে পারলে, তার সুবিধা এবং নিজ পক্ষের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, সেরকম কোন কিছু প্রকাশ করা কেবল betrayal, চুকলী, প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা নয় অধিকন্তু স্বদেশ বা স্বপক্ষ দ্রোহিতা। এ কায টাও আমাদের নৈতিক জ্ঞানে বা লোকমতে দূষণীয় নয়, বরং অতীব মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক। রামায়ণে বিভীষণ (মাইকেলই বোধ হয় প্রথমে বিভীষণের চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্ত্তে স্বদেশ-দ্রোহিতার দোষারোপ করেছেন), মহাভারতে মহাপ্রাণ বিদুর, মদ্রদেশাধিপতি শল্য, আর হিন্দুর রাজনৈতিক গুরুর গুরু—যিনি নিজের প্রাণ দিয়েও স্বপক্ষদ্রোহিতা ক'রে ধন্য হয়েছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি আরও অনেকে আদর্শচরিত্র ব'লে আজ্ঞানী-মূর্খ সকলের নিকট সমানভাবে পূজ্য। এই রকম মহিমান্বিত দ্রোহিতার দৃষ্টান্ত, সর্ব্বজ্ঞ নীতিবেত্তা ঋষিদের প্রণীত সেই সকল শাস্ত্রে দেখা যায়, যা এখনও আমাদের কাছে অপরিবর্ত্তনীয়, অলঙ্ঘনীয় ও অভ্রান্ত ব'লে বিবেচিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্যদেশে traitorরা যে পক্ষের সহায় হয়, সে পক্ষ থেকে অনেক প্রকারে পুরস্কৃত হয় সত্য, কিন্তু কখনও আদর্শ-পুরুষ ব'লে পূজা, এমন কি সাধারণের শ্রদ্ধাও পায় না, বরং ঘৃণিত ব'লেই বিবেচিত হয়।

তারপর আমরা শিশুকাল থেকেই চুকলী বা বিট্রে করতে মা-

বাপ আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা বিশেষভাবে শিক্ষিত হই। অন্য আত্মীয় ত দূরের কথা, বাবা, মায়ের কোন অপ্রিয় কায করলে তা মাকে ব'লে দিয়ে, আর এই ভাবে মা'র কথা বাবাকে ব'লে দিয়ে তাঁদের নিষ্কাম অপত্য-স্নেহ ও আদরের আধিক্য এবং appreciation পেতে ছেলে মেয়েদের নিত্য দেখি (অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আজকাল এটা কিছু কমেছে ব'লে মনে হয়)। বাল্যে, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া স্কুল-কলেজে শিক্ষক মশয়দের দ্বারা বিশেষভাবে এই betrayal নীতিতে practical শিক্ষা পেয়ে থাকি। যে ছাত্র অন্যের দোষ প্রকাশ করে, অর্থাৎ দল বেঁধে কোন কায ক'রে, যে ছেলে দলের ছাত্রদের দোষ প্রকাশ ক'রে দেয়, সে দণ্ড হ'তে অব্যাহতি ত পায়ই—অধিকন্তু অপেক্ষাকৃত সুবোধ ও শিষ্ট ব'লে সর্ব্বসাধারণের আদর-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে। যে দোষ প্রকাশের জন্য betray করা হয়, সেই দোষের চেয়ে যে betrayalটাই অধিকতর অমার্জ্জনীয়, এ তথ্য আমাদের নীতিতে নেই। তাই শিক্ষকরাও জানেন না।

অবশ্য, এটা ঠিক যে, এই betrayal এর সঙ্গে অন্য কোন বিশেষ কারণে অন্যের দোষ প্রকাশ, যাকে ইংরেজীতে denounce করা বা accuse করা বলে অথবা আর কিছু করা বলে, তার অনেক পার্থক্য আছে। দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দের দ্বারা এই পার্থক্য অবধারণ করা হয়।

চুকলী বা betrayal থেকে স্বদেশ বা স্বপক্ষদ্রোহিতার বীজ লোক-মতের আওতায় সহজে উদ্ভূত হয়ে বাংলার স্বভাবকে এমন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে, আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি না, কি করলে স্বদেশদ্রোহিতা হয়, আর কি করলে তা হয় না। তাই অন্য পাপের তুলনায় স্বদেশ বা স্বপক্ষ-

দ্রোহিতা কত বড় সাংঘাতিক পাপ অর্থাৎ অন্য সমস্ত পাপ একত্র করলে, তার চেয়ে যে এই এক স্বদেশ বা স্বপক্ষদ্রোহিতা অনেক অধিক সাংঘাতিক পাপ, সে জ্ঞান আমাদের নীতিশাস্ত্র বা লোকমত শেখায় না। আমরা কেবল বুঝি, কি করলে ধর্ম্ম যায়, আর কি করলে তা থাকে। এত করি ব'লেই আমাদের তথাকথিত ধর্ম্ম নাকি আছে; আর আছে তার দোসর—হিন্দু-সভ্যতা। দেশ যে গেছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্বও যে গেছে, সেজন্য কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত আমাদের একটুও পরওয়া ছিল না। এখন একটু নাকি হয়েছে। তাই আমরা আমাদের ধর্ম্ম আর সভ্যতা দিয়ে ত্রিভুবন জয় করবার বায়না ধরেছি। শুত্তেও আমরা সেই "বকাণ্ড প্রত্যাশা ন্যায়েরই" মর্য্যাদা রক্ষা করছি। আমাদের দেশ রঘুনন্দনের ন্যায়ের দেশ কি না!

এ দেশে ধর্ম্মের খোলস প'রে যে যত অধিক দুষ্কর্ম্ম করে, অথবা আগে দুষ্কর্ম্মের চূড়ান্ত ক'রে, পরে যে যত অধিক ধর্ম্মের ভাণ করে, সে তত অধিক পূজ্য হয়ে চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যে দু'টি ফল কামের, তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করে।

বারীন এ হেন দেশের যেমন তেমন লোক নয়, দেশ-উদ্ধারের নেতা। সে যদি স্বদেশ বা স্বপক্ষদ্রোহিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারে, তবে সে দোষ তার নয়, লোকমতের। যেহেতু তার confessionএ লোকমত তখন ধন্য ধন্য করেছিল।

উপেন, উল্লাস প্রভৃতি প্রথমে স্বীকারোক্তি দিতে রাজি হয় নি। সরল-হৃদয় উল্লাস নাকি স্ব-ইচ্ছায় এই পর্য্যন্ত বলতে রাজি হয়েছিল যে, হ্যারিসন রোডে কবিরাজদের দোকানে ধৃত ব্যক্তিরা নির্দ্দোষ সেখানে পাওয়া সমস্ত মারাত্মক জিনিষের জন্য সে নিজেই দায়ী। উল্লাসের ধারণা হয়েছিল, তা হ'লেই তাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত

হয়ে বে-কসুর খালাস পাবে। আর মুরারীপুকুর বাগানে ধৃত হবার পরেই যখন ছেলেরা পুলিসের দ্বারা একটু নির্যাতিত হচ্ছিল, তখন ঠিক ঐ রকম ধারণার বশেই বারীন পুলিসের বড় কর্ত্তার কাছে এই ব'লে দাবী করেছিল যে, সমস্ত দোষের জন্য দায়ী ব'লে সে যখন নিজে স্বীকার করছে, তখন অন্যকে সে জন্য নির্যাতন করা হচ্ছে কেন!

যাই হোক, অবশেষে উল্লাস ও উপেন বারীনের স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলিয়ে, সমস্ত কথা একরার করতে বারীনের যে যুক্তির বলে রাজি হয়েছিল, তা হচ্ছে স্বীকারোক্তির সুযোগ নিয়ে দেশে বিপ্লবমন্ত্র বা বিপ্লববাণী প্রচার করা। সে বলেছিল, তারা কি করতে চেয়েছিল তা দেশকে জানিয়ে দিতে পারলে দেশে বিপ্লববাদ প্রচার হয়ে যাবে। এই জানিয়ে দেওয়া প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে রামসদয় বাবু বারীনের vanityকে এমন উস্কে দিয়েছিলেন যে বারীনের আত্মকীর্ত্তি বলবার প্রবৃত্তি অফুরন্ত হয়ে উঠেছিল। গুপ্ত সমিতির তরফ সত্য যা ঘটেছিল, তা ত বলেই ছিল, কল্পনাতে যা ছিল, তা-ও ঘটনা ব'লে প্রকাশ করেছিল, আর তখন বলবার মুখে সম্ভব অসম্ভব বিচার না ক'রে যা পেরেছিল, তাই বলেছিল। আসলে বিশেষ ক'রে যা জানাতে চেয়েছিল, তা হচ্ছে, সে-ই এ দেশে বিপ্লবমন্ত্রের আদি ধাতা, বিপ্লবযজ্ঞের হোতা, বিপ্লব সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তা ইত্যাদি।

এই পরিবর্ত্তনাতঙ্ক-রোগগ্রস্থ দেশে বিপ্লববাদ প্রচার বলতে কি ব্যাপার বোঝায়, আর আমাদের সর্ব্বজ্ঞ নেতারা সে সম্বন্ধে কতটুকু ওয়াকীবহাল ছিলেন, তা আগের পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি। বারীন ও তার সহকারীদের, বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের সুবিধার জন্য confession দেবার ফলে, বিপ্লববাদ প্রচার ত হয় নি, যা প্রচারিত হয়েছিল

তা হচ্ছে, বহির্জ্জগতের প্রেরণায় কল্পনা-মোহমুগ্ধ বাঙ্গালী যুবকের প্রাণে অধুনা উদ্দীপিত কর্ম্মপ্রবণতা দ্বারা চুরী, ডাকাতি, খুন আর কখনও কখনও "তিতু মিঞা"র অনুকরণে ভারতীয় স্বাধীনতা-সমরের খেয়াল দ্বারা অর্থ এবং বাহাদুরী অর্জ্জনের পন্থা দেখান। সে যাই হোক, এই স্বীকারোক্তির তখন সদ্য ফল ফলেছিল এই যে, সে সময় থেকে যারা এই অপরাধে ধরা পড়ত, বারীনের "clean breast" দেখাবার বীরত্বকাহিনী শুনিয়ে পুলিস তাদের সহজেই স্বাকারোক্তি দেওয়াতে পেরেছিল। সেই সময় এই confessionএর জন্য, কোন কোন আইন-ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর সকলের দ্বারা, এমন কি, প্রায় সকল খবরের কাগজে বারীনের বীরত্ব ঘোষিত হয়েছিল। আমাদের দেশে এ রকম লোকমতের মূল্য কত, তার একটা উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"যুগান্তরে" রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য ফৌজদারী আদালতে প্রথম সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের মামলার কয়েক মাস আগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তা আগে লিখেছি। তার আগে সিডি-সনের মামলা যা দু'একটা ঘটত, তাতে অভিযোগের রাজদ্রোহিতাকে অস্বীকার অথবা তা রাজভক্তিসূচক ব'লে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হ'ত। ভূপেন বাবুর বেলায় বীরত্ব-ব্যঞ্জক রাজদ্রোহিতার স্বীকারোক্তি দেওয়াবার জন্য, 'ক' বাবু অন্য নেতাদের নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগলেন। অতি যত্নে রচিত কথা কয়েকটি ভূপেন বাবু রাজপ্রতিনিধি হাকিমের মুখের ওপর স্পর্দ্ধা সহকারে আউড়ে দিয়ে এক বছর কারাদণ্ড নেওয়াতে লোকমতে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেছল। ভূপেন বাবুর সৌভাগ্য দেখে তখন আমাদের মধ্যে অনেকের অসূয়া জন্মেছিল। কিন্তু ও রকম নির্ভীকভাবে স্বীকারোক্তি না দিয়ে যদি প্রমাণ করতেন যে,

রাজদ্রোহ প্রচার তাঁর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে প্রকাশ্যভাবে বিপ্লববাদ-প্রচারকারী-সম্পাদকের পক্ষে তা ভীরুতা বা কাপুরুষতা ব'লে কখনও নিন্দিত হ'ত না, নিশ্চয় পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী লোকমতে ধন্য ধন্য পড়েও যেত। এখানে বলা বাহুল্য যে, এঁর স্বীকারোক্তিতে betrayal এর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু "বন্দেমাতরম্" পত্রিকাতে রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য অনুরূপ অবস্থাতে সমানভাবে অভিযুক্ত হয়ে ভুপেন বাবুর ঠিক উল্টো ব্যাপার করেছিলেন। তাতেও দেশে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেছল। আমাদের লোকমতের বাহাদুরী নয় কি!

যাক, তার পর সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়, তারা ধরা পড়লে যখন দেখে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার অর্থাৎ অব্যাহতির আশা একবারে নেই, তখন তার যে সকল সহযোগী ধৃত হয় নি, তাদের ধরিয়ে দিয়ে, তাদেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকার করবার প্রবৃত্তি ধৃতদের জেগে ওঠে। সাধারণ চোর, ডাকাত, জালিয়াৎদের কথা ছেড়ে দিলেও, স্বদেশী ডাকাতী, বৈপ্লবিক হত্যা বা রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃতদের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। অব্যাহতির প্রতিশ্রুতি পেয়ে নেতৃস্থানীয় অনেক বৈপ্লবিক এ রকম কর্ম্ম করেছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এ বিষয় পরে যথাস্থানে লিখব। আপাততঃ রাউলাট কমিশন রিপোর্ট থেকে এখানে একটু মন্তব্য তুলে দেখাই।—

At this time the leaders when arrested, sometimes after a long period of hiding, have in many though not all cases, been ready to tell the whole story freely.

Some speak under the impulse of a feeling of disgust for an effort which has failed. Some, of a different temperament, are conscience-stricken. Others speak to relieve their feelings, glad that the life of hunted criminal is over. Not a few only speak after a period of consideration, during which they argue with themselves the morality of disclosure. We have not failed to bear in mind that information of this kind is not to be blindly relied upon, least of all in India. But we have had remarkable facilities for testing those statements. The fact that they are exceedingly numerous, that they have made at different dates and often in places remote from one another gives an opportunity for a comparison far more useful than if they were few and connected, But this is not all. In numerous instances a deponent refers to facts previously unknown to revolutionary haunts not yet suspected or persons not arrested. Upon following up the statements the facts have been found to have occurred, the haunts are found in full activity, the persons indicated have been arrested and in turn have made statements, or documents have been unearthed and a new departure obtained for further investigation.

A revolutionary and undoubted murderer, since arrested, thus writes in a letter dated the 2nd January, found in January 1918 "one gives out the names of ten

others and they in their turn give out something. By this process we have been entirely weakened. Even the enemy don't consider that they who remain are worth taking. (Sedition Committee 1918. Report, page 29.)

ভাবার্থ :—এই সময় দেখা গেছে যে অধিকাংশ স্থলেই নেতারা ধরা পড়বার পর কখনও কখনও অনেক কাল লুকিয়ে রেখে সব কথাই খুলে বলে দিতে রাজী হ'য়েছে। কেউ বলেছে তার বিফল প্রচেষ্টার হতাশায়—কেউ বলেছে বিবেক দংশনের জন্য, আবার কেউ বা বিধ্বস্ত অপরাধী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে ব'লে। অনেকে আবার বলবার আগে, একরার করা নীতিবিরুদ্ধ হবে কিনা এ নিয়েও নিজের মধ্যে তর্কবিতর্ক করে দেখেছে। আমরা ভুলি নি যে এসব খবরের ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। কিন্তু এসব যাচাই করে দেখবার আমাদের খুব সুবিধে হয়েছিল। এ ধরণের খবর অনেক পাওয়া গেছল আর নানা কালে ও নানা স্থানে হয়েছিল বলেই তুলনা করার খুব সুবিধে হয়েছিল। অল্প ও অবিচ্ছিন্ন হ'লে সে সুবিধে হ'ত না। কিন্তু এইটেই সব নয়। অনেকস্থলে এজাহার-কারী আসামী এমন সব লোকের কথা আর বৈপ্লবিক আড্ডার কথা বাংলায় যা কেউ কখনও সন্দেহও করে নি। তাদের কথামত অনুসন্ধান করে দেখা গেছে সত্যিই সে সব ঘটেছে, আড্ডা সব পুরোদমে চলেছে, যে সব লোকের নাম করা হ'য়েছিল তাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা আবার যথাযথ স্বীকারোক্তিও দিয়েছে নতুন সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে আর সেই সব আরও অনুসন্ধানের সূত্র স্বরূপ হ'য়েছে।

একজন বিপ্লবপন্থী—সে যে হত্যাকারী তাতে সন্দেহ নেই—ধরা পড়ার পর ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে প্রাপ্ত ২রা জানুয়ারীর এক পত্রে লেখে যে "একজন দশজনের নাম প্রকাশ করে, তারা আবার আরও কিছু বলে, এই করে আমরা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ছি। যারা বাকী রয়েছে তাদের, শত্রুপক্ষও ধর পাকড়ের যোগ্য ব'লে মনে করে না।" (সিডিসন্ কমিটি, ১৯১৮ রিপোর্ট, ২৯ পৃঃ)

ফাঁসীতে ঝুলবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন অন্যকে betray করলে, নিজের অব্যাহতির কিছুমাত্র আশা ছিল না, তখনও স্ব-ইচ্ছায় বাহাল ভবিষ্যতে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষকে ডাকিয়ে এনে সহযোগীদের, বিশেষ করে নেতাকে betray করেছে, তথাকথিত বৈপ্লবিক সহিদ্‌দের ভেতরও এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। রাউলাট কমিশন রিপোর্ট থেকে একটা এখানে উদ্ধৃত করছি "The murder of Deputy Superintendent Shams-ul-Alam on the steps of the High Court is a case in point. The youth who shot him w.. hanged, but the day before his execution he told th story of his perversion. * The real criminal responsible

* Extracts from confession voluntarily made by Birendr Datta Gupta to the chief Presidency Magistrate :—"I wa introduced to a gentleman named Jatindra Nath Mukherjee o 273 Upper Chitpur Road, by a boy named Jnanendra Natl Mittra in the month of September. ... ... By reading th Jugantar I got a very strong wish to do brave and violen works, and I asked Jatin Mukherjee to give me work at 27 Chitpur Road. He told me about the shooting of Shams-u

for this boy's act was Jatin Mukherjee, who lived for six years to corrupt more youths, till he was killed in the Balasore affray in 1915." (sedition committee, 1918. Report, Page 192.)

ভাবার্থ :—হাই কোর্টের সিঁড়ির ওপর পুলিসের ডেপুটী সুপারিন্-টেন্ডেণ্ট সামসুল আলমের হত্যা এখানে আলোচনার বিষয়। যে যুবক তাঁকে গুলী করে ছিল, তার ফাঁসী হয়েছিল, কিন্তু ফাঁসীর পূর্ব্ব দিন সে তার মতিচ্ছন্নতার কথা বলেছিল। * সেই বালকের

Alam, Deputy Superintendent, who conducted the bomb case and he ordered a boy named Satish Chandra to make arrangements for this case. I asked Jatin for such works, and he asked me whether I shall be able to shoot Shams-ul-Alam. I answered that I will be able." Deponent went on to describe the murder and ended: "I make this statement so as not to injure Jatin but as I have come to understand that anarchism will not benifit our country, and the leaders who are now blaming me, now thinking the deed that of a head-cracked boy, to show them that I alone am not responsible for the work. There are many men behind me and Jatin, but I do not wish to give their names in this statement. The leaders who are now blaming me should be kind enough to come forward and guide boys like me in the good ways." (Sedition Committee, 1918. Report, Page 193.)

ভাবার্থ :—চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্ত স্ব-ইচ্ছায় যে একরার করেছিল তার উদ্ধৃতাংশ :—"সেপ্টেম্বার মাসে ২৭৩ আপার চীৎপুর রোডে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র নামক একজন বালকের দ্বারা যতীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত আমি পরিচিত হয়েছিলাম।.........যুগান্তর পড়ে সাংঘাতিক রকমের বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাজ করবার একটা তীব্র বাসনা জেগে উঠেছিল, এবং ২৭৫ চীৎপুর রোডে আমায় সে রকম একটা কাজ দিতে যতীন মুখার্জ্জিকে বলেছিলাম। যে ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সামসুল আলম বোমার মোকর্দ্দমা তদ্বির করছিলেন

এই দুষ্কর্ম্মের জন্য প্রকৃতরূপে দায়ী ছিল যতীন মুখার্জ্জি। সে আরও অনেক যুবককে দুষ্কর্ম্মাসক্ত করবার জন্য ছ' বছর যাবৎ বেঁচে থাকবার পর ১৯১৫ সালে বালেশ্বরের সংঘর্ষে নিহত হয়েছিল।" (সিডিসান কমিটী ১৯১৮ রিপোর্ট ১৯২ পৃষ্ঠা)।

অন্যের নাম প্রকাশ না করেও স্বীকারোক্তিতে বারীন নিজের কীর্ত্তিকলাপ যত ইচ্ছা, যেমন ক'রে প্রাণ চায় বলতে পারত; আর দেশহিতার্থ স্বীকারোক্তির ভেতর দিয়ে যা খুসী বিপ্লববাদ প্রচার কর্‌তেও পারত, তবে কেন বারীন অত লোকের নাম ও দোষ প্রকাশ করেছিল, তার কারণ আমরা ঠিক ধর্‌তে না পারলেও বারীনের অবস্থায় পড়লে যে দেশ-উদ্ধারকারীরাও ও-রকম ক'রে থাকে, তা দেখানর জন্যই অত কথা লিখছি।

যাই হোক, বারীন একটি মহৎ কায করেছিল। কিন্তু বার বছর একসঙ্গে থেকেও এই কাযটির মহত্ত্বের দাবী করতে কখনও শুনি নি। সে নিজেকে অদ্বিতীয় একমাত্র নেতা ব'লে জাহির ক'রে প্রকৃত নেতাদের খানিকটা বাঁচিয়ে ছিল। ঐ নেতাদের সকলে তার পর

তাঁকে গুলী করবার কথা বলেছিলেন, এবং সতীশচন্দ্র নামক একজন বালককে এ কাজের বন্দোবস্ত করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আমি এই রকম কাজ যতীনের কাছে চেয়ে ছিলাম এবং তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি সামসুল আলমকে গুলি করতে পারব কি না! আমি উত্তর দিয়েছিলাম আমি নিশ্চয় পারব।" এই একরার-কারী আসামী হত্যার বর্ণনা করে এই বলে বক্তব্য শেষ করেছিল যে :—"আমি যতীনের অনিষ্ট করবার জন্য এই এজাহার দিচ্ছি না, আমি বুঝতে পেরেছি এনার্কিজমের দ্বারা দেশের কোন হিত হবে না, যে সকল নেতা আমার উপর দোষারোপ করে বল্‌ছেন,—এ কাণ্ড ঘটেছে কোন মাথা পাগলা বালকের দ্বারা, তাঁদের আমি দেখাতে চাই, আমি একলা এ কাজের জন্য দায়ী নয়। আমার ও যতীনের পেছনে অনেক লোক আছে, কিন্তু আমি তাঁদের নাম এই এজাহারে উল্লেখ করতে চাই না, যে সকল নেতা আমায় দোষ দিচ্ছেন তাঁরা দয়া করে এগিয়ে আসুন এবং আমার মত বালকদের সৎপথে চালিত করুন। (সিডিস্যান কমিটি, ১৯১৮। রিপোর্ট, ১৯৩ পৃষ্ঠা)।

থেকে চুপি চুপি নাকে কাণে খৎ দিয়ে "চাচা আপনা বাঁচা" লৌকিক বেদের এই পবিত্র অনুশাসন কায়মনোবাক্যে পালন করছেন, আর বারীনকে নিত্য-ত্রিসন্ধ্যা দু-হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করছেন। এই সকল সাবেক আর বর্ত্তমান নেতা আর উপনেতারা এখন অহং ব্রহ্মের সাধনায় নিমগ্ন। এই সুযোগে আমাদের চোখ থেকে ভক্তির ঠুলিটা খুলে রেখে, ভারত-উদ্ধারের বা বিপ্লব-অনুষ্ঠানের পরিণাম-রঙ্গ উপভোগ ক'রে একটু দিব্যজ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত নয় কি ?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আলিপুর জেলে

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে এক দিন শোনা গেল, নরেন গোসাঁইর সঙ্গে প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা ধ'রে সপার্ষদ পুলিস সাহেবের আর নরেনের বাবার, দরজা বন্ধ ক'রে গোপনে কি পরামর্শ চলেছে। তখন আর আমাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, নরেন আমাদের বিরুদ্ধে রাজার সাক্ষী অর্থাৎ approver হ'তে যাচ্ছে। আমাদের যত রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা সবই গিয়ে পড়ল নরেন, তার বড়লোক বাবা আর গুরু গোসাঁইদের ওপর।

নরেন কেন এমন কুকায করল, এর কারণ অনুসন্ধান জন্য গবেষণা-প্রবৃত্তি, আমাদের মধ্যে ছোট বড় সকলের মনে জেগেছিল বটে, কিন্তু আসল কথাটাই তখন আমাদের কারও মনে আসেনি, অর্থাৎ বিশ্বাস-ঘাতকতা বা স্বপক্ষদ্রোহিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের—জাতীয়তার পরিপন্থী অনেক বৈশিষ্টের মধ্যে যে বিশেষ একটা, সে জ্ঞান আমাদের ত ছিল না, নেতারা কতকটা জেনেও তা স্বীকার করতেন না (এখনও করেন না)।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের এবং লোকমতের দোষগুণ সম্বন্ধে জন-সাধারণের ত কথাই নেই, তথাকথিত সর্ব্বজ্ঞ নেতারা জেনে শুনে যে অজ্ঞতার শুধু ভাণ করেই ক্ষান্ত থাকেন, তা নয়, অধিকন্তু সাধারণকে সে বিষয়ে অন্ধ ক'রে রাখেন, আর সেই অন্ধদের বলেন—তারা সব পদ্মলোচন। তাতে ক'রে তাঁদের খাতির জমে, পূজাও বাড়ে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে এইখানে আমাদের পার্থক্য। তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে, আর তার প্রতীকারের চেষ্টাও করে। আমরা আমাদের দোষ স্বীকার না ক'রে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চোটে দোষকে গুণ ব'লে বোকা বোঝাতে চেষ্টা করি।

মহাত্মা ক্লাইবের যারা দোসর হয়েছিল, অথবা যে সকল বাঙ্গালী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল, তারা যে সবাই আমাদেরই স্বজাতি আর আমাদের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় বল্‌তে যা বোঝায় তারা যে সেই ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, তা যদি কর্ত্তারা বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির পত্তনের সময় স্বীকার করতেন, তা হ'লে তথাকথিত বৈপ্লবিক action (terrorism) সুরু না ক'রে, আগে বিপ্লবের উপযোগী ক'রে আমাদের চরিত্র শোধন ও sound লোকমত গঠনের কাযে মন দেওয়া উচিত ব'লে মনে করতেন; তা হ'লেই হ'ত বিপ্লববাদের প্রচার; আর তা ছাড়া কোন দেশে বিপ্লবচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

ঐ সময়ের কয়েক মাস আগে যখন তথাকথিত "action" বন্ধ রেখে, য়ুরোপীয় প্রণালীতে সত্যকার গুপ্ত সমিতি নতুন ক'রে গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তখন কর্ত্তারা এই ব'লে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে —এ হচ্ছে ধর্ম্মের দেশ; ওসব এখানে আবশ্যক নেই; চলবেও না। অথচ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-সম্বন্ধীয় এই আধুনিক প্রগতির যা কিছু, সবটাই যে পাশ্চাত্য আদর্শের শুধু খোলসটার নিছক অনুকরণ, তা নিত্য প্রত্যক্ষ; তার প্রমাণের জন্য বেগ পেতে হয় না। কিন্তু আমরা তবু বলি, আমাদের সবই আধ্যাত্মিক; রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সবই নাকি ভারতীয় সনাতনভাবে হচ্ছে ও হবে।

যা হোক, এ কথা বলা যেতে পারে, নরেনের এই দুষ্কর্ম্মের জন্য

সম্পূর্ণ দায়ী নেতারা, আর আমাদের ঠাকুরমা-বিনিন্দিত জরাজীর্ণ লোকমত। কারণ স্বদেশ বা স্বপক্ষদ্রোহিতা যে কত বড় অপরাধ, সে ধারণা যে লোকমতের নেই, তা পূর্ব্বেও দেখিয়েছি। নরেনকে হত্যা না করলে লোকমতে স্বদেশদ্রোহী ব'লে যে, সে নিন্দিত হ'ত না, তার প্রমাণ তার মৃত্যুর পর এক সপ্তাহের ভেতর আমাদের মধ্যে একে একে অনেকেই স্বইচ্ছায় দ্বিধাশূন্য হয়ে informer হয়েছে, আর আমাদের পরেও কত approver, informer হয়েছে, তার সংখ্যা নেই। তাদের অনেককে গুপ্তসমিতির তরফ থেকে নির্যাতন বা দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে সত্য, কিন্তু নরেনের মত কেউ লোকমতে অত নিন্দিত হয় নি। এমন কি, লোকে তাদের এ হেন কাযের খোঁজ নেওয়াও অন্যায় ব'লে মনে করে, তা নিন্দা ত দূরের কথা। নরেন যখন approver হয়ে বার্লী সাহেবের কোর্টে সপ্তাহ খানেক ধ'রে কত কথাই বৈপ্লবিক সমিতির বিরুদ্ধে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছিল, তখন দেশে তেমন হৈ-চৈ হয় নি। যেহেতু, ফৌজদারী কোর্টে হামেসা ত কত approver নিত্য হচ্ছে, শিক্ষিত লোকদের কাছে এটা মামুলী ব'লে গণ্য হয়েছিল। তখন যারা ধরা পড়েনি, এমন বৈপ্লবিকদের কাছেও তাকে হত্যা করা অকারণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। অথচ আত্মীয়-স্বজনের হাত থেকে যদি অতর্কিতে কোন স্ত্রীলোককে কেউ বলপূর্ব্বক কেড়ে নিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে ফিরিয়েও পাওয়া যায়, তবে সেই নির্দোষ স্ত্রীলোকটির এই অপরাধের আর সে জন্য তার ওপর সামাজিক নির্যাতনের সঙ্গে, যে কোন স্বদেশদ্রোহীর অপরাধ ও সে জন্য তার প্রতি সামাজিক তিতিক্ষার তুলনা করলে, দ্বিধাশূন্য হয়ে বলা যেতে পারে, নরেনের approver হওয়ার জন্যই এত হৈ-চৈ পড়েনি' পড়েছিল ওরকম নভেলী ধরণে, অতবড় শক্তিশালী সরকারের সুদৃঢ়

লৌহ কারার মধ্যে হত্যার একটা বাহাদুরী ছিল বলে আর অতবড় শক্তিমান সরকারকে ঠকিয়ে এমন প্রতিশোধ দিতে পেরেছিল বলে। বেঁচে থাকলে আজ approver নরেন গোসাই সদর্পে সমাজের বুকের ওপর বিচরণ করত।

বাংলার বৈপ্লবিক ব্যাপারে নরেন যে প্রথম Approver সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার Approver হওয়ার পক্ষে যে সকল Inducement ছিল, তার পরে যারা approver বা informer হয়েছে, তাদের সে রকম বিশেষ কিছুই ছিলনা। নরেন দণ্ড হতে অব্যাহতির রাজকীয় প্রতিশ্রুতি ত পেয়েই ছিল, অধিকন্তু বিলাতে সপরিবারে রাজার হালে থাকবার আশাও নাকি পেয়েছিল। সে বলত, বারীন তাকে এবং অন্য অনেককে ঈর্ষা বশতঃ ধরিয়ে দিয়েছে, তার প্রতিশোধ দিতেই সে Approver হয়েছে। Approver হওয়ার অন্ততঃ এ একটা ছুতো সে পেয়েছিল। পরবর্ত্তী approverদের এত সব সুযোগ ছিল না। এখনও নেই। উপরন্তু তাদের সামনে নরেনের ভীষণ দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবু approver, informer, agent, provocateur আদির এত ভীড় দেখে কখনও কখনও মনে হয়, দুটি অমূল্য রত্ন—সত্যেন ও কানাই—বৃথা ওরকম ভীষণ নরহত্যা করে অকারণে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিল। এটা দিয়েছিল নিশ্চয়ই তারা নিজেদের মতই অন্য স্বদেশ হিতৈষীদেরও এত মহৎ মনে করত ব'লে। আমাদের জাতীয় চরিত্র যে এত কলুষিত, তা বোঝবার অবসর তাদের হয়নি। একটা কথা এখন মনে জাগছে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই রকম সব ব্যাধির প্রতীকার, লৌকিক উপায়ে অসাধ্য দেখেই কি একে একে অনেকে অলৌকিক শক্তিসাধনায় মাথা বথাচ্ছেন, না এও একটা প্রাচ্য সনাতন ব্যাধি!

একটা কথা আছে—"বজ্র আটুনির ফস্কা গেরো।" শুধু জেলখানা নয়,

যে কোন ব্যাপারে সতর্কতার যত বাড়াবাড়ি হোক্ না কেন, চেষ্টার মত চেষ্টা করতে পারলে সে সতর্কতার বিরুদ্ধে অনেক কিছু কায করা যে যায়, এ সত্য জগতে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। এত কড়াকড়ি পাহারা সত্বেও আমরা কাগজ পেন্সিল পেতাম। জেলখানার ভেতর এবং বাইরে আমাদের আবশ্যকমত যে কোন লোকের সঙ্গে দরকার হ'লে চিঠির আদান প্রদান করতে পারতাম। পুরস্কারের প্রত্যাশা না ক'রেও অনেক কয়েদী, বিপজ্জনক বিশেষ দণ্ডনীয় কাজ করা জনিত বাহাদুরীর গৌরব অনুভব করত। এক জন বাতিওয়ালা বলেছিল—"কাগজ পেন্সিল চাই—কত ?"

"আপাততঃ এক তা, আর পেন্সিলের সীস্ একটু।"

"আচ্ছা বাবু, এনে দেব, একটু সাবধানে রেখো।"

"অমুককে চিঠি দিতে পারবে ?"

"দিন। সন্ধ্যেবেলা, নয় কাল উত্তর পাবেন।"

পুরস্কারস্বরূপ কিছু দিলে নিত, না দিলে চাইত না। এইরূপে আমরা ক্রমেই জেলের ভেতরে বাইরে খবর পেতে ও দিতে সুরু করলাম। আমাদের দু' তিন রকম কোড ছিল।

ঐ সময় সত্যেন্দ্র কুমার বসু মেদিনীপুরের আদালতে বিনা পাশে তার দাদার বন্দুক ব্যবহার করবার অপরাধে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে, আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মোকর্দ্দমায় লিপ্ত থাকার অপরাধে, বিচার জন্য আলিপুর জেলে আনীত হয়েছিল। কখনও dysentery কখনও হাঁপানি রোগে পীড়িত বলে প্রথম থেকেই হাঁসপাতালে স্থান পেয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে তখন বিশেষ কোন রোগের লক্ষণ তার ছিল না। জেলখানায় দু'চার পয়সা দিলেই অনেক রোগের প্রমাণ সংগ্রহ করা যেত।

সত্যেন আলিপুর জেলে গিয়ে নরেনের ব্যাপার জেনে, জেলের

অন্তত্র রক্ষিত একজন বৈপ্লবিককে, সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ার আগেই যে তিনখানি চিঠি লিখেছিল, যত দুর মনে পড়ে তার আসল মর্ম্ম এই ছিল যে, সে জানতে চেয়েছিল আমাদের মধ্যে নরেনের মত আর কেউ ছিল কি না ; আর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারা যায়, এমন কে কে ছিল। নরেন যে সকল খবর পুলিসকে দিচ্ছে, তা বাইরে আমাদের লোককে জানিয়ে সাবধান করা নিতান্ত আবশ্যক। খবর জানবার অন্য উপায় না থাকলে, নরেনের জুড়ীদার approver অর্থাৎ corroborator হওয়ার ভাণ করে নরেনের সঙ্গে ভাব করা উচিত কি না ; আর নরেনকে হত্যার উপায় কি হতে পারে।

অনেক গবেষণার পর প্রথমে স্থির হয়েছিল, নরেনকে হত্যা করার ভার—বাইরে যে কয় দল আমাদের বৈপ্লবিক বন্ধু ছিল তাদের ওপর দেওয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকেও বারীন ঐ ব্যবস্থাই করেছিল। চার পাঁচ দল পৃথকভাবে চেষ্টা করলে যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে, সে আশা তখনও ছিল। জেলে আমাদের মধ্যে নরেনের মত দুর্ব্বল প্রকৃতির কেউ ছিল ব'লে তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। আর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ব'লে যে কয় জনকে মনে করেছিল, তাদের অধিকাংশই তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলে ছোকরা আর বাকী নেহাৎ ভাল মানুষ বললে যা বোঝায় তাই।

খুব বিশ্বাসী, কৌশলী, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি এবং স্মরণশক্তিসম্পন্ন অন্য ব্যক্তির অভাবে সত্যেনই গোসাঁইর corroboratorএর পালা অভিনয়ের ভার নিয়েছিল। তার যে অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল, তা পূর্ব্বে বলেছি। এই দুরূহ কায করতে গেলে যে শেষ অবধি তার মহৎ উদ্দেশ্য লোকে অজানিত থেকে যেতে পারে, আর নরেনের মত সে-ও স্বদেশদ্রোহী ব'লে চিরদিন লোকমতে ঘৃণিত হয়ে থাকবে, তা বুঝে সুজেই

অকুণ্ঠিতভাবে এতে রাজী হয়েছিল। তাকেই যে নরেনের ঘাতুক হ'তে হবে তা সে তখনও ভাবেনি।

সত্যেনের সঙ্গে যার এই পরামর্শ স্থির হয়েছিল, সে নিজে কিন্তু সব বাজে কাযের ভার নিয়েছিল। যেমন জনকতক চতুর বিশ্বাসী ছেলে-ছোকরার দ্বারা একটা গোয়েন্দা বিভাগ গ'ড়ে, কার মতি-গতি কখন্ কি হচ্ছে না হচ্ছে, খোঁজ রাখা এবং সত্যেনকে তা জানান আর সকলের মনে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাব জাগিয়ে রাখা।

নরেনকে কেউ মেরে ফেলুক, অরবিন্দ বাবু, দেবব্রত বাবু প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া প্রায় অধিকাংশের মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাংলাদেশে যে ক'টি বৈপ্লবিক গুপ্তদল ছিল, বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার প্রায় সকল দলের ওপর নরেনের হত্যার ভার দেওয়া হল। তিন চারটী দল প্রায় একই ধরণের উত্তর দিয়েছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের দলও ছিল। তার মর্ম্মটা ছিল—গোসাঁই হত্যার চাইতে তাদের হাতে বিস্তর গুরুতর কায রয়েছে। গোসাঁইর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। অর্থাৎ তারা দল ভেঙ্গে দিয়ে দুর্গানাম জপ করছিল। বাকী যে দু' একটি দল কোন উত্তর দেয়নি, তারা চেষ্টা করলেও করতে পারে আশা ক'রে, কোথায় কি ভাবে চেষ্টা করবে, তার একটা লম্বা প্ল্যানও দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিন জেলে আমাদের যে যেখানে ছিল, সকলকে নিয়ে ছ'ডিগ্রী নামক একটা সঙ্কীর্ণ জায়গায় রাখা হ'ল। উদ্দেশ্য—একসঙ্গে থাকলে, নরেন, আমাদের মধ্যে যার কাছে যত গুপ্ত তথ্য আছে, তা সংগ্রহ ক'রে পুলিসকে দিতে পারবে। নরেন তখন জানত না যে, আমরা তাকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তা বুঝেছিল। কাযেই পুলিসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। আর

নরেনকে আমরা মেরে ফেলতেও পারি, এ সন্দেহও সম্ভবতঃ হয়েছিল।

আমাদের মধ্যে দু' এক জন বালক, বিশেষ ক'রে সুশীল নিদ্রিতাবস্থায় তাকে গলাটিপে কিংবা যে ইট দিয়ে আমাদের অস্থায়ী পায়খানা তৈরী হয়েছিল, তার একখানা তার মাথায় ঠুকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। নির্দোষ অরবিন্দ বাবুকে তাতে জড়িয়ে ফেলবার ভয়ে বারীন আদি বয়োবৃদ্ধরা তাতে অসম্মতি জানান। তাদের এক জন প্রাণের কথা খুলেও বলেছিল "চোখের ওপর একটা জ্যান্ত মানুষ খুন হবে, ওরে বাবারে, দেখব কেমন করে"। দুষ্ট ছেলেরা কিন্তু নরেনের প্রতি এমন একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করত যে, নিষেধ সত্ত্বেও সামান্য ঝগড়ার মুখে তাকে মেরে ফেলতেও পারত বলে তখন মনে হয়েছিল। বালক কৃষ্ণজীবন কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে তাকে লাথিও মেরেছিল। এর দু'এক দিন পরেই হাঁসপাতালের কাছে দু'জন য়ুরেশীয়ান কয়েদীকে নরেনের শরীর রক্ষক নিযুক্ত করে তাকে পৃথক্ ভাবে আরামে রাখা হয়েছিল। আর আমাদের বাকী সকলকে ২৩নং ওয়ার্ডে একসঙ্গে রাখা হ'ল। এটা একটা প্রকাণ্ড ঘর ছিল।

যে কদিন গোসাই আমাদের সঙ্গে ছিল, বারীন ও দেবব্রত বাবু তার প্রতি বিশেষ বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়েছিলেন ও সে প্রায় সর্ব্বদা তাঁদের সঙ্গে থাকত। শুনেছিলাম, দেবব্রত বাবু will force প্রয়োগ ক'রে, আর বারীন প্রেমের দ্বারা নাকি তাকে জয় করতে চেষ্টা করেছিল।

যাই হোক্, আগেই বলেছি, সত্যেন হাঁসপাতালে থাকত, নরেনকে নিকটে পেয়ে তার সঙ্গে পূর্ব্ব-পরামর্শমত আলাপ সুরু ক'রে দিয়েছিল। ক্রমেই আমাদের মধ্যে প্রচার হ'ল, সত্যেন নরেনের corroborator হ'তে যাচ্ছে। এ খবর কোর্টে উকীল বাবুদের মারফৎ বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল।

ও-দিকে সত্যেন যেন ভীষণ দণ্ডের ভয়ে অস্থির হ'য়ে একটা গতি ক'রে দেবার জন্য কেঁদে-কেটে নরেনকে ধ'রেছিল। নরেন সে কথা পুলিসের কর্ত্তাকে জানাল। তিনি অনেক দিন ধ'রে সত্যেনকে নাড়াচাড়া দিয়ে, অবশেষে খুসী হয়ে সত্যেনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন; আর তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার জন্য নরেনকে উপদেশ দিলেন। সত্যেন নরেনের প্রদত্ত খবর যথাস্থানে পাঠাতে লাগল। তিন মাস এইভাবে চলেছিল।

এ দিকে আমরা ২৩ নং ওয়ার্ডে ৩৫ কি ৩৬ জন মিলে নরক গুলজার ক'রে তুলেছিলাম। সকলের মন স্ফুর্ত্তিতে রাখবার জন্য নিত্য নতুন রকম আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার উদ্ভাবিত হ'তে লাগল। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু'তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমোবার উপায় ছিল না।

এই স্ফুর্ত্তিবিধান জন্য সেখানে সুরুচি-কুরুচি, শোভন-অশোভন, সঙ্গত-অসঙ্গত কোন বিচারই ছিল না। ঋষিতুল্য অরবিন্দ বাবুকে কখন কখন নল্‌চে আড়াল দেবার চেষ্টা-মাত্র হ'ত; কিন্তু অনেক সময়ে তাঁকে'ও টেনে আনা হ'ত। তার পর ভোজনের যে রকম বিরাট ব্যাপার হ'ত, তার বর্ণনা দেবার স্থান এখানে হবে না। বাংলার তাণ্ডবলীলার সংক্রামকতার প্রভাবে বম্বেতে যখন ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল, বাংলা তখন কায়মনোবাক্যে পেয়-বর্জ্জিত চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য আদি ষোড়শ উপচারে আমাদের মত বীরগুলির পূজা ক'রে বীর-পূজার সাধ মেটাচ্ছিল। এই ত গেল এক দিক।

অন্য দিকে ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি, দলাদলি, গালাগালি, আবার কোলাকুলি, ঢলাঢলিরও অভাব ছিল না। তার ওপর ধর্ম্মপ্রচার, সাধন, ভজন, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, শিক্ষা, দীক্ষা, ভগবদ্দর্শন, উপলব্ধি,

সমাধি ইত্যাদিও ছিল। এ হেন সদনুষ্ঠানেরও বিঘ্নস্বরূপ ছিল দু' এক জন পাষণ্ড নাস্তিক, যারা ধ্যানভঙ্গ ক'রে দিত, ব্যাখ্যা—শিক্ষা-দীক্ষার কদর্থ ক'রে ছড়া আর গান বাঁধত, নকল করত, ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকত, আর মেটিরিয়ালিজমের গৌরব ঘোষণা করত, ধর্ম্মগ্রন্থ চুরি ক'রে লুকিয়ে রাখত, আরও কত কি করত। কার গীতা ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল কানাই। বিজয় ভট্টাচার্য্য ধ্যানস্থ এক জনের ঘাড়ে চেপে বসেছিল; সে চোখ খুলে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এ কি?"

"আমি এসেছি।"

"তার মানে?"

"তুমি ডেকেছিলে যে!"

"তোমাকে?"

"হাঁ, গো হাঁ, আমাকে নয় ত, আমার মধ্যে যিনি আছেন, তাঁকে!"

"তুমি কি senseএ এ কথা বলছ?"

"আমি যে ভাই nonsense?"

জেলখানার মধ্যেই ক'জন অবতার হ'তে হ'তে পাষণ্ডদের দৌরাত্ম্যে তখন থেকে গেছলেন। নানারূপে "তিনি" ভক্তদের জন্য জেলখানায় আসতেন। কেউ ধ্যান ভেঙ্গে গেলে বাস্তব নাকে পদ্ম-গন্ধ, কখনও বা অন্য কিছুর গন্ধ পেতেন; বাস্তব কানে শুনতেন কাঁকণের কন্‌কন্‌, মলের ঝিনিরিনি, নূপুরের শিন্‌জিনি, আরও কত কি ক্রমে নাকি মিলিয়ে যেত। কেবল অরবিন্দ বাবুর ও-সব কোন কিছু ছিল ব'লে শুনিনি। এত হট্টগোলের মাঝেও তাঁর ধ্যান-ধারণার কোন বিঘ্ন হ'ত ব'লে তখন মনে হয়নি।

আমাদের মধ্যে ভক্ত ছিল অনেকগুলি। ভক্তি নিবেদন করতেই ইহলোকে তাদের আবির্ভাব; সে জন্ত তাদের একটি ভক্তবৎসল গুরু (keeper of conscience) না হ'লে চলত না। তাঁকে সেবা ক'রে, তাঁর ইঙ্গিতে কায়মনোবাক্যে সব কিছু ক'রে, তাঁর ভাল-মন্দ সব কিছুতে সমভাবে মুগ্ধ হ'ত। তাঁর আদর-অনাদর, স্নেহ-বিরক্তি, কৃপা-বিদ্রূপ সমভাবে গ্রহণ ক'রে কৃতকৃতার্থ হওয়াই তাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব ছিল।

আর ক'জন ছিলেন, ঐ রকম কতকগুলি ভক্ত না হ'লে তাঁদের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠত; তাঁরা ভক্ত সংগ্রহের জন্ত নিয়ত লালায়িত হতেন। মুর্গী যেমন বাঁচ্চাগুলিকে চোখে চোখে কাছে কাছে রাখে, আর চিলের ছায়ামাত্র দেখলে অবিলম্বে ডানার মধ্যে তাদের ঢেকে ফেলে; এই ভক্তবৎসলরাও ঠিক সেই রকম শিষ্যদের চোখের আড়ালে যেতে দিতেন না, পাছে অন্ত কেউ ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়। এই গুরুরা আপন আপন ভক্তদের কাছে মূর্ত্তিমান্ স্বদেশ। এই স্বদেশ-প্রতিম গুরুদের প্রতি ভক্তিই তাদের কাছে স্বদেশ-ভক্তি। এই গুরু-দ্রোহিতাই তাদের কাছে স্বদেশ-দ্রোহিতা। অন্ত কোন রকম স্বদেশ বা স্বদেশ-দ্রোহিতার ধারণা তাদের ছিল না। গুরু স্বদেশ-দ্রোহিতার কায করলে সেই দ্রোহিতাকে স্বদেশ-প্রেম ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে তারা ধন্ত হ'ত। আমাদের মধ্যে একজন গুরুকে, শিষ্য সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, ভারতবর্ষ আর তাঁর নিজের মধ্যে কোন প্রভেদ তিনি বুঝতে পারেন না। তখন ভাবে ভক্তদের চোখের জলে বুক ভেসে গেছল।

এই ভক্তসংগ্রহের প্রবৃত্তি জেলের ভেতরেও এত উৎকট হয়ে উঠেছিল কেন, তার একটা কারণ কেউ কেউ নাকি অনুমান

করত যে, যারা আদালতের বিচারে দণ্ডের যত অধিক গুরুত্ব আশঙ্কা করত, তারাই খালাস পাবার সম্ভাবনা ছিল—এমন ভক্ত সংগ্রহের আবশ্যকতা তত অধিক উপলব্ধি করেছিল। কারণ, তারা জানত, ভক্তরা দিন কয়েক পরে খালাস হয়েই লোকসমাজে গুরুদের মন্ত্রটাকে মহত্ত্ব ব'লে ব্যাখ্যা, আর তালকে শতগুণে অতিরঞ্জিত ক'রে, বিশেষতঃ তাঁকে অতি বড় ধার্ম্মিক দেশ-হিতৈষী মহাত্মা ব'লে "পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশানক্রমে কীর্ত্তন করিতে থাকিবেক।"

তার পর বার্লি সাহেবের এজলাসে নরেনের এজাহার সুরু হ'লে পূর্ব্ব-কথিত দুষ্ট বালকেরা খুব উত্তেজিত হয়ে যা পরামর্শ স্থির করেছিল, তার মর্ম্ম এই ;—

আমাদের গ্রেপ্তারের সময়, খানাতল্লাসীতে প্রাপ্ত সমস্ত বামাল, সামান্য কেরোসিন বাক্সে দু' তিন আনা দামের তালা বন্ধ ক'রে আদালতে রাখা হয়েছিল। তারই ওপর আমরা সকলে বসতাম। ছেলেদের ধারণা, তাতে অনেক কিছু অস্ত্র-শস্ত্র নাকি ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সকল বাক্স ভেঙে, অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে একই সময়ে দু' জন সার্জ্জেণ্টের রিভলবার কেড়ে নিয়ে, দরকার হ'লে বার্লী 'সাহেবের' কাঠগড়ার রেলিং ভেঙে, নরেনকে মেরে ফেলে, গরাদে-শূন্য জানালা টপ্‌কে আর সিঁড়ি দিয়ে যে দিকে পারে পালাবে। পূর্ব্বোক্ত কারণের উল্লেখ ক'রে তাদের এ দুষ্প্রবৃত্তিতেও বারীন বাধা দিয়েছিল। কিন্তু অরবিন্দ বাবুকে জড়াবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও জেল ভেঙে পালাবার মতলব বারীনেরই মাথায় ঢুকেছিল। কারণ, সে বুঝেছিল, রামসদয় বাবুর প্রতিশ্রুত পূর্ব্বোক্ত নিষ্কৃতির আশা তখন সুদূরপরাহত। আমাদের অধিকাংশই অর্থাৎ ছ'সাত জন ছাড়া সবাই ছিল তার ভক্ত। দু' চার জন যাঁরা পালাবার

মতলবে রাজী ছিলেন না বা যাঁরা মতলবটার কিছু হের-ফের করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কথা তাই গ্রাহ্য হয়নি। বাইরের দু' এক দলও নাকি এই পালাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজী ছিল। মনোহর একটা প্ল্যান অনেক ভৌগোলিক জ্ঞান খাটিয়ে, আর উর্ব্বর মস্তিষ্ক ঘামিয়ে প্রস্তুত হ'ল। এমন কি, বাংলার পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলের পথ ধ'রে, বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের ঠিক মাঝ দিয়ে, একদম সোজা উত্তরে কাবুল হয়ে পার্‌সীয়াতে পৌঁছবার পথে আমাদের কি কি চিজ আবশ্যক, তারও সুদীর্ঘ তালিকা বাইরের সাহায্যকারীদের কাছে পাঠান হয়েছিল। তালিকাতে কিঞ্চিৎ আফিং ও দড়ী-কলসীর কথাও লেখা ছিল; হলফ ক'রে বলছি, এ আমি নিজ চোখে দেখেছি।

পালাতে হ'লে নাকি দৌড়তেই হয়; একটু আধটু নয়; আবার পার্‌সীয়া তক্। তাই সেই ওয়ার্ডের মধ্যে ঘুরে-ফিরে দৌড়ের রিহার্শেল দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত দৌড়েছিল। অনেকের পায়ে কুঁচকি, সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ ব্যথা, কারও কারও ১০৬° ডিগ্রী জ্বরও হয়েছিল; এতে আমিও বাদ পড়িনি।

জেল ভেঙ্গে পালাবার জন্য জেলের ভেতর পনেরটা রিভলবার পাঠিয়ে দিতে বাইরের দলকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। ক্রমে নরেনকে হত্যা করবার মতলব চাপা প'ড়ে গেছল। বাইরে যাদের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল, তারাও তা ভুলে গেল।

সত্যেন এই সকল বন্দোবস্তের কথা শুনে জেলের মধ্যে আমাদের কাছে প্রথম রিভলবারটা এলেই তা চুরি ক'রে অন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে, নিজেই নরেনকে মারবে ব'লে স্থির ক'রে ফেলল। কারণ, সে জানত, আমাদের কর্ত্তারা টের পেলে নিশ্চয় বাধা দেবেন।

মৃণালও নরেনকে হত্যা করবার জন্ত যে কি রকম অস্থির হয়েছিল, তা সত্যেন জানত ; এ সব কাযে ছেলেছোকরাদের পাঠিয়ে লিডারদের safe distanceএ থাকা যে আমাদের গুপ্তসমিতির রীতি, তা সে অনেকবার হৃদয়ঙ্গম করেছিল। সেই সময়ের আগের বছরে মেদিনীপুরে স্মরণীয় তাণ্ডব কনফারেন্সের সে-ই প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিল এবং তাতে গরম দল না কি তারই কর্ম্মকুশলতায় জয়যুক্ত হয়েছিলেন, তার পরে বিখ্যাত সুরাট কংগ্রেসে তার প্রত্যুৎপন্নমতিতে ও সৎসাহসে বাঙ্গালী গরম দলের স্পর্দ্ধা রক্ষিত হয়েছিল, আর সে মেদিনীপুর বৈপ্লবিক গুপ্তকেন্দ্রের কর্ণধার ছিল, কাযেই সে যে একজন শক্তিমান বৈপ্লবিক লিডার, তা বিলক্ষণ জেনেও তবু কেন এই হত্যার ভার নিজের ঘাড়ে নিয়ে, লিডারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল, তা বোঝা যায় না।

জেলের ভেতর, বাইরে থেকে রিভলবার আনা তখন খুবই সহজ ছিল। কারণ, তখন এখানকার মত কড়াকড়ি একবারে ছিল না। এত সোজা ব্যাপার ছিল বলেই, কি ক'রে রিভলবারটা এসেছিল তা জানবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে অনেকের হয়নি ; আমারও হয়নি। কিন্তু তখন বাইরে বৈপ্লবিক দলের পক্ষে পনেরটা রিভলবার জোগাড় করা মুস্কিল ছিল, তাই প্রথমে সেকেলে মরচে-ধরা প্রকাণ্ড বড় একটা মাত্র এসে পড়ল। সেটা সাবধানে রাখবার ভার পড়ল সত্যেনের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর ওপর। আমাদের মধ্যে সেটার অস্তিত্ব যখন সকলে ক্রমে ভুলে গেছল, তখন সে একদিন সকলের অজ্ঞাতে হাঁসপাতালে সেটা নিয়ে গিয়ে সত্যেনকে দিয়েছিল। তার ট্রিগারটা এত শক্ত ছিল যে, তার পক্ষে ঐ রিভলবার ব্যবহার সহজ হবে না ব'লে বুঝেছিল। অগত্যা আর একটা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

মেদিনীপুরে সত্যেনের সন্ধানে যে সকল রিভলবার ছিল, তা

আনাবার চেষ্টা ক'রে জেনেছিল, সেখানকার সমস্ত বিপ্লবী কূর্ম্ম অবতারে পরিণত হয়েছে। কারণ, ঐ সময় সরকারের ধারণা, হয়েছিল, মেদিনীপুরেই বিপ্লবীদের একটা ভীষণ আড্ডা আছে এবং তারা অত্যন্ত practical; তাই মেদিনীপুরবাসীকে একবারে দমিয়ে দেবার জন্য মেদিনীপুরের শাসনকর্তৃপক্ষকে বোধ হয় যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে যে ৩০।৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের নাম প'ড়ে বুঝেছিলাম, যিনি গ্রেপ্তারের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তিনি এক জন প্রকৃত রসিকতার অবতার ছিলেন।

সত্যেনের উক্ত বন্ধু হাঁসপাতালে সে দিন বিনা অনুমতিতে ছিল ব'লে বিতাড়িত হয় এবং তার হাঁসপাতালে যাওয়া আবার বিশেষ ক'রে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

এ দিকে প্রায় প্রতিদিনই হাঁসপাতালে এসে সত্যেনের সঙ্গে নরেন দেখা করত। নরেনের প্রদত্ত সমস্ত এজাহার ঠিকমত মনে থাকছে না ব'লে ভাল ক'রে কথাগুলা সব উল্টে-পাল্টে নরেনকে সে শোনাত; আর নরেন নিজের এজাহার তাকে পড়াত; যাতে খেলাপ এজাহার না হয়, সেজন্য বুঝিয়ে পড়িয়ে সাবধান ক'রে দিত। অবশেষে আরও সময় নেবার জন্য পুলিস সাহেবকে সত্যেন বলেছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন মুখে এজাহার দিতে গেলে, গোলমাল হয়ে যাবে ব'লে তার ভয় হয়, তাই লিখে নিয়ে গিয়ে এজলাসে প'ড়ে দেবার অনুমতি পেলে তার পক্ষে সুবিধা হয়। পুলিস সাহেব সন্তোষের সহিত হুকুম দিয়েছিলেন। তাই কয়েক দিন ধ'রে হাঁসপাতালে ডিস্‌পেনসারীতে দিন একটু একটু ক'রে নরেনের সামনে ব'সে লিখতে সুরু করেছিল। যে দিন কোর্টে যেত, সে দিন সকালে এই লেখার ব্যাপার চলত। অন্যথা বিকেলেও চলত।

দেবব্রত বাবু, ইন্দ্রনাথ, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাদের পরে ধৃত আট জনের তখনও বার্লি সাহেবের কোর্টে মোকর্দ্দমা চলছিল। আমরা এর আগেই সেসনসোপর্দ্দ হয়েছিলাম।

১লা সেপ্টেম্বর সোমবার উক্ত আটজনের বিরুদ্ধে নরেন গোসাইর জবানবন্দী সুরু হবার কথা ছিল। সত্যেন জেনেছিল, এই জবানবন্দীতে অনেকের নাম নতুন করে প্রকাশ হবে, তার ফলে আবার অনেকে ধৃত হবে; বিশেষ ক'রে প্রায় বিশজন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তির গ্রেপ্তারের কথা ছিল। তাই সত্যেনের চেষ্টা হ'য়েছিল, উক্ত সোমবার সকালেই নরেনকে মারতে হবে; তার বন্ধুকে এই খবর পাঠাল। বিকেল ৫টার সন্ধ্যা খাওয়া হয়, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও কখনও নরেন হাঁসপাতালে থাকে। কাযেই ৫টার পরে সত্যেনের উক্ত বন্ধু পূর্ব্বোক্ত কারণে নিজে যেতে না পেরে আমাদের ওয়ার্ড থেকে কানাইকে দিয়ে এমন ভাবে ন্যাকড়া জড়িয়ে পাঠিয়েছিল, রিভলবার ব'লে কানাই তা বুঝতে পারে নি।

অন্য দু'এক জনকেও না কি ব'লেছিল, তারা আসল ব্যাপারটা জানত না ব'লে অনর্থক হাঁসপাতালে যেতে রাজী হয় নি। পরে কিন্তু এই সুযোগ দেওয়া হয়নি ব'লে সুশীল কেঁদে আকুল হ'য়েছিল। পেটব্যথার ভান ক'রে, কানাই হাঁসপাতালে গিয়ে সত্যেনকে সেটা দিতে রাজী হ'য়েছিল। সত্যেন সেটা পেয়ে যখন তার বদলে তাকে বড় রিভলবারটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব'লেছিল, তখন কানাই সেটা রিভলবার ব'লে বুঝতে পেরে সত্যেনকে জিজ্ঞেস ক'রে নাকি ব্যাপারটা সবই জেনেছিল। তাই সেও বড় রিভলবারটা নিয়ে সত্যেনের সাহায্য ক'রতে চাইল। সত্যেন নাকি প্রথমে তার বন্ধুর বিনা মতে কানাইয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়নি। তাই কানাই উক্ত

বন্ধুর মতের জন্য একখানা অনেক যুক্তি-তর্ক-পূর্ণ চিঠি হাঁসপাতালের এক জন কয়েদী খিদমৎগারকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। সেই বন্ধু নাকি কানাইএর এক বন্ধুর মতামতের জন্য সেই চিঠিখানা তাকে দেখায়। চিঠিখানা পড়ে সে এমন হতভম্ব হ'য়ে গেল যে, হাঁ কি না কিছুই ব'লতে চাইল না। অগত্যা সত্যেনের বন্ধু না কি মত দিয়ে পাঠিয়েছিল। মত পেয়ে তারা স্থির করেছিল, আগে সত্যেন চেষ্টা করবে। যদি ফস্কে যায়, তবে কানাই আক্রমণ করবে। কানাই না থাকলে কিন্তু গোসাঁই বেচারা যে বেঁচে যেত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীররক্ষক দু'জন য়ুরেশিয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাঁসপাতালের দোতালার ওপর সিঁড়ির পাশে ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলবারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে, সে জন্য না কি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভেতর থেকেই না কি নরেনকে তাক করে মারে। খট্ ক'রে শব্দ হ'ল, কিন্তু কার্ত্তুস আগুন দিলে না। সত্যেন পরমুহূর্ত্তে জামার ভেতর থেকে রিভলবার বে'র ক'রে আবার নরেনকে তাক করে। তখন হিগেনবোথাম নামক পূর্ব্বোক্ত এক জন য়ুরেশিয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার রিভলবারটা ধরে টানাটানি করাতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়, কাযেই রিভলবার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোসাঁই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলী চালায়। কানাই দাঁত মাজার ভান ক'রে ডিসপেন্সারির পাশে সিঁড়ির সামনে পায়চারী ক'রছিল। যাই হোক্, গুলী সামান্য ভাবে পায়ের কোন স্থানে লেগেছিল। তাই সিঁড়ি নেবে হাঁসপাতালের

ফটক পার হ'য়ে—ছ'পাশে দেয়াল, এমন একটা লম্বা সরু গলির ভেতর গিয়ে পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া ক'রেছিল।

সত্যেন ডিসপেন্সারী থেকে বেরিয়ে সামনে এক জন কয়েদীকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, নরেন কোথায় গেল। আঙুল দিয়ে ইসারায় সে দেখিয়ে দিলে সত্যেন ছুটে গিয়ে কানাইর সঙ্গে যোগ দেয়। ছ'জনেই গুলী চালাতে থাকে। সত্যেনের একটা গুলীতে কানাইর গায়ের চামড়া ছোলা হয়ে গেছল; এ থেকে বোঝা যায়, সত্যেন যখন সেখানে যায়, তখনও নরেন জমী ধরে নি। নরেন নাকি ছ'একবার প'ড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল।

তার পর যথারীতি পাগলাঘন্টি, ভোম্বা, কর্ম্মচারীদের ছুটোপুটি, দৌড়াদৌড়ি, সত্যেন ও কানাইকে গ্রেপ্তার, সব ওয়ার্ডে তালা-বন্ধ, খানাতল্লাসী ইত্যাদি যথারীতি সবই হয়েছিল।

খুনের তদন্ত, বিচার, দণ্ড ইত্যাদিও কায়দা-মাফিক হয়ে গেল। কানাই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, কারও নাম করে নি, আর পিস্তল কোথা থেকে পেয়েছিল, তাও বলে নি। সত্যেন সমস্ত অস্বীকার করেছিল।

সত্যেনের সঙ্গে বারীনের ঝগড়া আরম্ভ হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দের গুপ্ত-সমিতির গোড়াতে, সারকিউলার রোডের প্রথম আড্ডা থেকে। এ কথা আগে লিখেছি। এই সময় বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির সভ্যদের পক্ষে স্বীকারোক্তি বৈধ কি অবৈধ, সেই নিয়ে জেলে আমাদের মধ্যে ঝগড়ার ফলে ছ'টো দল গ'ড়ে উঠেছিল। এক দলের মোড়ল বারীন, অন্য দলের সত্যেন। বারীনকে তারা দোষারোপ করত। তার পর এই দোষারোপের মাত্রাটা আরও বেড়ে উঠেছিল, যখন উকীল ব্যারিষ্টার

প্রভৃতি সকলে বারীনকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার ক'র্‌তে পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও তা করলে না। সত্যেন তার প্রতিবাদ-স্বরূপ নরেনের হত্যার স্বীকারোক্তি দেয়নি এবং দেবে না ব'লে আগে থেকে নাকি স্থির ক'রে রেখেছিল। বারীন অবশেষে সেসন কোর্টে ব্যারিষ্টারদের তাড়ায় স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছিল; তাতে কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। কারণ, শুধু প্রত্যাহারে স্বীকারোক্তির বিষয় যে মিথ্যা, তা প্রমাণ হয় না। স্বীকারোক্তি মিথ্যা বলে ঘোষণা করতে হয়।

যাই হোক, এই দলাদলির ফলে বারীনের ওপর অনেকের ভক্তি চটে গেছল। তারা বারীনের নেতৃত্বকে বড় একটা আমল দিত না। এতে তার সমস্ত বিদ্বেষটা গিয়ে পড়েছিল সত্যেনের ওপর। বারীন এই নেতৃত্বের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য দু'একবার তুমুল বাগ্‌যুদ্ধও করেছিল। তার পর তাকে কিছুমাত্র জান্‌তে না দিয়ে, এত বড় একটা কাণ্ড সত্যেন করল, এতে বারীনের নেতৃত্বের অভিমানে এমনই আঘাত লেগেছিল যে, নরেনের হত্যার পর সেই দিনই আমাদের ২৩ নং ওয়ার্ডে, দস্তুর-মাফিক এক মিটিংএ ব'সে সত্যেনের ওপর দোষারোপের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে সন্ত গায়ের জ্বালা কতকটা জুড়িয়েছিল আর তাকে সাম্‌নে না আনতে পেরে, তার উক্ত বন্ধুকে দোষ-স্বীকার করিয়ে, ক্ষমা-ভিক্ষা চাইয়ে, আর কখনও এমন কায সে করবে না এ কথা বলিয়ে তবে ছেড়েছিল। আর সত্যেনের ওপর শোধ নিয়েছিল সে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়বার পর।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে কিন্তু অতিরিক্ত দেরী হচ্ছে ব'লে নরেনকে এজাহারের পর জেরা করতে হাকিম দেন নি। তাতে আমাদের পক্ষের এক জন উকীল অনেক সাধ্য-সাধনায় এই মর্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু, সাক্ষীকে

জেরা করতে দেওয়া হল না, সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যাবৎ সে আবার না যথারীতি সেসন আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরীটি না নিলে গোসাইঁকে মারা প্রায় বৃথা হ'ত, আর অরবিন্দ বাবুর মুক্তিও নাকি অসম্ভব হ'ত। তখন বার্লি সাহেবের কোর্টে কোন উকীলই এর আবশ্যকতা বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি, তাই রাজী হন নি। এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত ও তারই চেষ্টায় হয়েছিল।

যাই হোক, দু'জনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কানাই আপীল কর্‌তে রাজী হ'ল না। তাই আগে কানাইর ফাঁসি হ'ল—১০ই নভেম্বর।

সত্যেনও জান্‌ত, আপীলের ফল কিছুই হবে না; তার মা বিশেষ ক'রে বলা সত্ত্বেও প্রথমে রাজী হয়নি। তার পর আমি তাকে তার মায়ের ইচ্ছার দোহাই দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। সে জন্য যে সত্যেনকে লোকমতে নিন্দিত হ'তে হবে, তা ভাবতে পারিনি। বরং তখন মনে করেছিলাম, দেশে সত্যকার গুপ্তসমিতি কখনও হ'লে তারা সত্যেনকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে আশা বৃথা হয়েছে। নরেনকে হত্যার দিন পাঁচ ছয় পরে আমরাও, সত্যেন কানাই যেখানে আবদ্ধ ছিল, সেই ৪৪ ডিগ্রী নামক জেলখানার মধ্যকার দৃঢ়তর জেলে অর্থাৎ অন্দরমহলে রক্ষিত হয়েছিলাম। বিশেষ কড়াকড়ি পাহারা সত্ত্বেও 'কোডে' মেথরকে দিয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলত। প্রথমে চেয়ে সেই মেথরের হাতে একটু জল খেয়েছিলাম। তাই তার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলাম।

গোসাইর মৃত্যুতে সত্যেন কত আশাই করেছিল, কত কথাই সে বলেছিল। কাব্যবিশারদের একটি গানের ভাব নিয়ে লিখেছিল, *

* "প্রকৃত সন্তান হবে সেই জন নিজ দেহ-প্রাণ করি বিসর্জ্জন, যে করিবে মা'র বন্ধন-মোচন হবে তার মাতৃঋণ-প্রতিদান।"

অচিরে ভারতের নিশ্চয় "বন্ধন-মোচন" হবে, এই বন্ধনমোচনের কাযে যে "নিজ দেহ-প্রাণ বিসর্জ্জন" ক'রে "মাতৃঋণ প্রতিদান" করছে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি।

কানাইর ফাঁসির পর বিপুল সমারোহে তার দেহ সৎকার করা হয়েছিল। কলকাতা সহরময় একটা তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সেই জন্য সত্যেনের ফাঁসির ধার্য্য দিন—২৩শে নভেম্বর—সাধারণকে জানতে দেওয়া হয়নি। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি আত্মীয়স্বজনকে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকবার ও তার মৃত-দেহের সৎকার সেইখানেই করবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডাররা ফাঁসির সময় কানাইর নির্ভীকতার কথা আমাদের কাছে বলেছিল। কোর্টে আমাদের কাছ থেকে শুনে সংবাদ-দাতারা সংবাদপত্রে খুব লিখেছিলেন। সরকার বাহাদুরের পক্ষে তা মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। সেই জন্য জেল-ওয়ার্ডারদের যথেষ্ট বকুনিও খেতে হয়েছিল। আর সত্যেনের বেলায় যাতে তার ফাঁসির সময়কার কোন কথা প্রকাশ না হয়, সে জন্য বিশেষ সাবধান করা হয়েছিল। কাযেই ফাঁসির সময়কার সত্যেনের সঠিক খবর অনেক দিন যাবৎ অনেক চেষ্টা ক'রেও আমরা পাইনি। কিন্তু কোন কোন গোরা ওয়ার্ডার, আমাদের জানবার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে, কর্ত্তৃপক্ষের মনের মত ক'রে, বিদ্রূপচ্ছলে একটা আধটা কথা যা বলেছিল, তা বিদ্রূপ ব'লে বুঝতে কারও বাকী ছিল না। পূর্ব্বেই বলেছি, এ সব খবর সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা কোর্টে আমাদের মুখ থেকেই সংগ্রহ করতেন। সত্যেনের বিপক্ষ দল এই সুযোগে সত্যেনের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ক'রে তার ওপর সাধ মিটিয়ে শোধ নিয়েছিল। তার মাত্রা এত দূর বেড়েছিল যে, অনেক পরে শুনেছিলাম, সত্যেনকে

না কি মূর্চ্ছিত বা মৃত অবস্থায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাই সত্যেনের ফাঁসির সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, পরে তাঁদের অনেকের নিকট ব্যাপারটার প্রকৃত তথ্য জান্‌বার জন্য অনুসন্ধান করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে এক জন হচ্ছেন বিখ্যাত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়; আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সত্যেনের ফাঁসির দিন তিনিও জেলখানায় গেছলেন। নিতান্ত হৃদয়হীন ব'লে ফাঁসির ব্যাপারটা নিজে দেখেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের ও জেল-কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের মুখে সত্যেনের ভূয়সী প্রশংসাই শুনেছিলেন। অথচ পরে কোন সংবাদপত্রে তার বিরুদ্ধে অন্যরকম মত প্রকাশিত হয়েছিল দেখে, বিশেষ অনুসন্ধান করেছিলেন, আর জেনেছিলেন, আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের দলাদলি ছিল। তার ফলেই সত্যেনের বিপক্ষ-দলের দ্বারা এই রকম মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এমন আর এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"২৭ নং সমবায় ম্যানসন্,
কলিকাতা।
২রা জুলাই, ১৯২৪।

"প্রিয় হেম বাবু,

কোন বন্ধু ও আত্মীয়-প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, আপনি সত্যেন্দ্রের ফাঁসির উপলক্ষে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যাহাতে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম, ঐগুলি সম্বন্ধে আমার একটা লিখিত উক্তি চান। শুনিলাম, তজ্জন্য আপনি কলিকাতায় আসিবেন। তাড়াতাড়ি ঐ উক্তি প্রস্তুত

করিলে পাছে কোন ঘটনা অবিকৃত থাকে, সেই জন্য আগে হইতেই উহা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। লেখাটা বড্ড তাড়াতাড়ি হইতেছে। কেবল ভয় হইতেছে, এই বুঝি আপনি আসিয়া পড়েন।

"আমার সন তারিখ মনে নাই। সত্যেন্দ্রের মাতা (এক্ষণে স্বর্গীয়া) আমার কুণ্ডু লেনস্থিত বাসায় আসিয়া বলিলেন যে, সত্যেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান বাবু কঠিন জ্বরে শয্যাগত। সত্যেন্দ্রের সৎকারের জন্য আর কাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না। অতএব আমাকে ঐ গুরুভার স্কন্ধে লইতে হইবে। নানা কারণে গুরু। সি, আই, ডি, ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি, লোকজন জুটান। তখনকার কালে এত সত্যাগ্রাহীর ধূম হয় নাই। তখন সবই 'গোপন', সবই 'চুপ চুপ'। আমি তথাস্তু বলিয়া কোন দেশমান্য সম্পাদকের শরণাপন্ন হইলাম। তথায় কোন আশা না পাইয়া নব স্বদেশ-প্রেমিক এবং এ দেশে ধর্ম্মঘটের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রথম নায়ক ও আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমতোষ বসু মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কর্ম্মচারী-দিগের প্রথম ধর্ম্মঘটের ইনিই উদ্‌যোক্তা, হোতা ও নেতা। ইনি পরে বিলাতে কেয়ার হার্ডির প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন ও তথায় পরলোকগমন করেন। প্রেমতোষ বাবু দাহের নিমিত্ত লোক-জন সংগ্রহ করিয়া দিলেন ও অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন। সত্যেন্দ্রের খুল্লতাতপুত্ত্রেরাও সাহসী হইয়া অগ্রসর হইলেন। পরে আমি ভীষণ লালমুখো, অতীব গম্ভীর, স্বল্পভাষী আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বোম্‌পাসের (?) নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি কয়েকটা সর্ত্তে দাহ করিবার অনুমতি দিলেন। ইহা বোধ হয়, প্রাণদণ্ডের পূর্ব্ব-দিবস।

প্রথম সর্ত্ত—জেলের বাহিরে দাহ নিষেধ।

দ্বিতীয় " —কোন আড়ম্বর ও আন্দোলন নিষেধ।

তৃতীয় সর্ত —কোন স্মৃতি-চিহ্ন লইয়া যাওয়া নিষেধ।

চতুর্থ " —জেলের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে দাহ করিতে হইবে।

পঞ্চম " —লোকসংখ্যা ১৪।১৫ জনের অধিক হইবে না।"

"ইহার পূর্ব্বে কানাইর মৃতদেহ লইয়া কালীঘাট শ্মশানে খুব রাজনৈতিক উৎসব হইয়াছিল। তাহার পুনরাবৃত্তি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত ছিল না। এই জন্য এই সব সর্ত্ত। বাধ্য হইয়া রাজী হইতে হইল।"

"ফাঁসির দিন অতি প্রত্যুষে আমরা আলিপুর জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। আমরা ঐ নির্দ্দয় ব্যাপার দেখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। উহা সমাপ্ত হইলে একজন চর্ম্ম-বর্ম্ম-পরিহিত শ্বেত পুলিস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—'You can go now. The thing is over, Satyendra died bravely. Kanai was brave, but it seems Satyendra was braver, তদ্দণ্ডেই একজন সার্জ্জেণ্ট বলিতে লাগিল, "When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake, when I said 'Satyendra be ready.' He answered 'Well, I am quite ready' and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it all cheerfully. A brave lad."

"মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি ও আমার পত্নী দুইদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। খুব সহাস্য বদনে দুইদিনই সে আমাদের সহিত প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া স্বদেশী কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। তাহার কিছু কিছু উক্তি আমার মনে আছে। সে বলিয়াছিল, 'আমার বা কানাইর মৃত্যু কি ছার। আমাদের মত সহস্র সহস্র মরিলে তবে দেশ উদ্ধার হইবে। তবে দেশে জাগরণ আসিবে।"

"আমিই তাকে ফাঁসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিবার প্রবৃত্তি দিই। সে কিছুতেই রাজী হয় নাই। তাহার মাতার ইচ্ছা বারংবার বুঝাইলে তখন সে বলে, 'ভাবিয়া দেখিব,' পরে জেল হইতে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করে।

মাতার সাক্ষাৎ ইচ্ছা জানাইলে বলিয়াছিল, 'যদি তিনি এখানে আসিয়া না কাঁদেন, তবেই আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি, নচেৎ নয়।' তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ়া জননী এক ফোঁটা অশ্রু পরিত্যাগ করেন নাই। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার জন্য আমিই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ঠিক করিয়া দিই। উক্ত দিবস বাবু রজনীনাথ সমাদ্দার তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

'নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যায় তাহার অংশ ছিল কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে ইসারায় জানাইয়াছিল, 'হাঁ'।

"তখনকার বালকবালিকারা নানাস্থানে কানাইও সত্যেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিয়াছিল। এই সংবাদ আমি কারাগারে সত্যেন্দ্রকে দিয়াছিলাম। শুনিয়া তাহার মুখ খুব উৎফুল্ল হইয়াছিল।"

"তাহাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছিল। সেলটি বাঘের পিঁজরার মত। একদিকে রেল। অন্য দিকে দেওয়াল। পরিমাপ ৪ হাত আন্দাজ লম্বা ও ততটি চাওড়া। শীতকাল, সত্যেন্দ্রের পরিধানে কম্বল ও তাহাতেই শয়ন। ঘরের এক কোণে মাটী দিয়া আচ্ছাদিত একটা বাঁশের চুবড়ী। তাহাই কমোডের কার্য্য করিত ও ঐ ঘরেই খাইতে হইত। উক্ত কমোডটি বিছানার এক হাত কি জোর দেড় হাত দূরে অবস্থিত।

"কড়া পাহারার মধ্যে থাকিয়া কথা কহিতে হইত। পুলিস ছাড়া জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমার্শন উপস্থিত থাকিতেন।

দাহকালে ইনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা কেদারায় বসিয়া ঐ মহৎকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা কোনই স্মৃতি-চিহ্ন আনিতে পারি নাই।"

"তখনকার 'এম্পায়ার' পত্রিকায় যে বিকৃত সংবাদ বাহির হইয়াছিল, উক্ত পত্রিকায় আমি তাহার প্রতিবাদ ছাপাইয়াছিলাম।"

"প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের জন্য প্রেমতোষ বাবুর উদ্যোগে ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আনন্দমোহন পাল মহাশয়ের সহায়তায় পোস্তার বাজারে প্রায় ৪ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আলু ও আম্র-ব্যবসায়ীরা ১০৲, ৫৲, এইরূপ চাঁদা দিয়াছিলেন। একটি গন্ধ-বণিকের ক্ষুদ্র দোকানে ২৫৲ টাকা বিনা বাক্যব্যয়ে পাওয়া গিয়াছিল। দোকানের অধিকারী একটা মোড়কে টাকা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা যাইবামাত্র উহা প্রদান করিয়া জোড়হস্তে নিবেদন করিল, 'আপীল চলিলে আরও দিব'। আপীল কিন্তু চলিল না। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা মহা দার্শনিক ও রচয়িতা লর্ড মর্লি তারযোগে জানাইলেন যে, 'আপীলের জন্য ফাঁসি স্থগিত থাকিতে পারে না।"

এ, সি, রায়।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমাদের Morale

নরেন গোসাঁই নিহত হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আলিপুর জেলের এক নির্জ্জন প্রদেশে আমাদের সকলকে রাখা হয়েছিল। সারি সারি ৪৪টা কুঠরী আছে ব'লে ঐ জায়গাটার নাম ৪৪ ডিগ্রী। কুঠরীগুলো প্রায় দশ ফিট লম্বা আর আট ফিট চওড়া। সুমুখে লোহার গরাদে দেওয়া একটামাত্র দরজা। প্রত্যেক কুঠরীর সামনে প্রায় আট ফিট দূরে আট ফিট উঁচু প্রাচীর। প্রত্যেক দুটো কুঠরীর মাঝে থেকে ঐ প্রাচীর অবধি আবার দেয়াল অর্থাৎ প্রত্যেক কুঠরীর সাম্‌নে আট ফিট লম্বা আট ফিট চওড়া একটুখানি উঠোন। তার সামনের দিকে দরজায় মোটা কাঠের একবাল কপাট, তার মাঝে প্রহরীদের উঁকি মেরে দেখবার জন্য একটা ছোট ফুটো। এই দরজা-গুলোর সামনে চৌদ্দ পনের ফিট দূরে আবার চৌদ্দ ফিট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খুব লম্বা উঠোন। এ যেন চিড়িয়াখানার মধ্যে খাঁচা। আলিপুর জেলের (এখন নাম হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেল) কয়েদীরা এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর নামে ভয়ে কাঁপে।

এর একটা ঐতিহাসিক গৌরব আছে। মণিপুরের স্বাধীন হিন্দু-রাজা টীকেন্দ্রজীত, তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি আদি, ফাঁসী ও আন্দামানের আসামী হ'য়ে এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে বন্দি-দশায় ছিলেন। আর ঐখানেই ঐ ভাবে ছিলেন নাকি চীনা সম্রাটের ক্যান্টনস্থিত ভাইস্‌রয় "ইয়ে" (প্রায় ১৮৫৮)। আরও অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিও নাকি একে পবিত্র ক'রে গেছেন।

যাই হোক, ওখানে রেখে আমাদের খুব কম সম্মান দেওয়া হয় নি। একে ত আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগই ছিল অতি বড় সম্মান-সূচক অর্থাৎ কিনা ব্রিটিশরাজ ভারতসম্রাট এচ, আই, এম, পঞ্চম জর্জ্জকে ভারত-সাম্রাজ্যের ন্যায়ানুমোদিত অধিকারচ্যুত করবার জন্য যুদ্ধঘোষণার আয়োজন, ষড়যন্ত্র ও সে জন্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি মাল-মসলা গোপনে আমদানী ও প্রস্তুত। এ সেই জাতীয় অভিযোগ, যা নাকি কীর্ত্তিমান কৈজারের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। তার ওপর আমাদের সুরক্ষিত ক'রে রাখবার জন্য যত্ন-চেষ্টার যে রকম এলাহী ব্যাপার করা হয়েছিল, সে সৌভাগ্য বোধ হয়, জেলখানার কোন অতিথির ভাগ্যে জোটে নি।

চার জন স্কট্ল্যাণ্ডবাসী গোরা সৈন্য নিয়ত আমাদের হেফাজাত করবার জন্য ওয়ার্ডাররূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এদের ওপর লালবাজার থানার এক জন গোরা সার্জ্জেণ্ট হয়েছিল চিফ ওয়ার্ডার। এদের অধীন প্রায় আট দশ জন হিন্দুস্থানী সিপাহী ওয়ার্ডারও ছিল। এ ছাড়া লম্বা উঠোনে পালাক্রমে দিনরাত রাইফেল ঘাড়ে পাহারা দিত বারো জন নাঙ্গা পল্টন অর্থাৎ হাইল্যাণ্ডার সৈন্য। এতেও দুশ্চিন্তা নাকি দূর হয় নি, তাই বড় দেয়ালের বাইরে থাকৃত অনেক রাইফেলধারী গুরখা।

নরেনের হত্যার আগে অত সব কিছুই ছিল না। আমাদের প্রতি-সরকারের, আগেকার ভাবগতিক দেখে আমাদের যে বিশেষ তেমন কিছু দণ্ড হবে ব'লে অথবা হলেও সে দণ্ড তেমন মারাত্মক হবে ব'লে মনেই হ'ত না। পরে ৪৪ ডিগ্রীর রকম-সকম দেখে আপনা হতেই অনেকের মনে হয়েছিল, আমাদের মধ্যে সব ক'টি মাতব্বরকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়ে দেবে, আর বাকী ছেলে-ছোকরাদের যাবজ্জীবনের

তরে হবে আন্দামানবাস। তখন আমাদের আন্দামান সম্বন্ধে একটা অতি বিকট ধারণাই ছিল।

জেল ডিসিপ্লিন যে কি বীভৎস ব্যাপার, তা মালুম হয়েছিল তখনই —যখন শীতকালে প্রতিদিন ভোর ৫টায় এক ডাকে সকলকে মুহূর্ত-মধ্যে বিছানা গুটিয়ে নিজের নিজের দরজার সামনে "এটেন্‌স্যান" হয়ে দাঁড়াতে হ'ত; হুকমদার ওয়ার্ডার সাহেব দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় প্রত্যেককে স্যালিউট করতে হ'ত। তার পর ৫ মিনিটের মধ্যে ঝাঁট-পাট দেওয়া সেরে চৌবাচ্চা থেকে মাত্র একটি বালতী জল এনে, লোহার মরচে-ধরা থালি কটোরা সাফ করা, দাঁত মাজা, স্নান করা ও কাপড় কাচা সারতে হ'ত। একটু দেরী হলেই অকথ্য রকমারী গালাগাল আর ধমকানী। সন্ধ্যার সময় তালাসী দিতে আর কুঠরী বদল করতে হ'ত। পরস্পর আলাপ ত দূরের কথা, চোখাচোখী হলেও গালাগালির অন্ত থাকত না। রাত্রিতে পাহারা বদলের সময় হঠাৎ ভীষণ শব্দে তালা নাড়া দিয়ে ডেকে জাগিয়ে দেখত, বেঁচে কি ম'রে আছি। আদালত থেকে আসবার সময় জেলের বড় ফটকে সকলের সামনে সমস্ত কাপড় ছেড়ে, পা ফাঁক ক'রে ওঠ্ বোস হয়ে তালাসী দিতে হ'ত। এর আগে তিন মাস যাবৎ যে হরেক রকম উপাদেয় অপর্য্যাপ্ত খাবার পেতাম, তা তখন স্বপ্ন ব'লে মনে হ'ত। আর পেটের কষ্টটাই যে সব চেয়ে বড় কষ্ট, তার পূর্ণ উপলব্ধি তখনই হয়েছিল।

সব চেয়ে অসহ্য হয়েছিল কথা বলতে না পাওয়া। তখন পূজোর ছুটী; কাযেই আদালত যাওয়া ঘটত না। দিনের পর দিন, সব সময় শুয়ে ব'সে কেবলই চিন্তা, আর চিন্তা! তাও আবার খালি দুশ্চিন্তা। সে কি ভীষণ!

চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে বন্ধ হবার দু' তিন দিনের মধ্যে যদিও দেয়ালে টোকা দিয়ে, দু'পাশের কুঠরীর লোকের সঙ্গে আলাপের ফন্দি আবিষ্কৃত হয়েছিল তথাপি প্রথম প্রথম সহজসাধ্য ছিল না বলে সকলে তা পারত না। (কিছু দিন পরে অবিশ্যি এতে খুবই আলাপ চলত)। কাযেই দুশ্চিন্তার যাতনা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখন ব্যথার হা-হুতাশের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণের দু' একটা কথা এত জোরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত যে, পাশের কুঠরী থেকে তা বেশ শোনা যেত। তাতে অতীত জীবনের রহস্যসূচক শব্দ বা নাম, আর তখনকার নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণের ফলে, ভবিষ্যৎ আতঙ্কে মনে হঠাৎ উদ্ভূত সঙ্কল্প-প্রকাশক এমন কথাও বেরিয়ে পড়ত, যা শুনে তখন তাদের মানসিক অবস্থা কেমন উচ্ছৃঙ্খল হয়েছিল তা সহজে বুঝতে পারা যেত।

দেশহিতের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণাভোগেই যারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আর এই আত্মপ্রসাদকেই যারা জীবনের চরম আনন্দ ব'লে জেনেছে, তারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, এই বিচারাধীন অবস্থায় যখন এত, তখন সশ্রম কারা বা আন্দামানবাসরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হ'লে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখা কিরকম অসম্ভব।

এ স্থলে কেউ এই সঙ্কট থেকে মুক্তির আশায়, এমন কি, ভ্রান্ত আশায়ও যদি স্বদেশ অথবা স্বপক্ষদ্রোহিতা করে, তা হ'লে সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী একমাত্র তাঁরা, যাঁরা বিপ্লববাদ প্রচারের নেতা সেজেছিলেন। কারণ, তাঁরা স্বদেশ প্রীতি সম্বন্ধে আমাদের তেমন কোন শিক্ষা দেন নি, যা নাকি ৪৪ ডিগ্রির অতটুকু কষ্টের অবস্থাতে আমাদিগকে অবিচলিত রাখতে পারত।

যে সনাতন ভাবের শিক্ষাতে আমরা সে-কাল হ'তে এ-কাল পর্য্যন্ত ওতপ্রোতভাবে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি, তার সঙ্গে স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়

অভ্যুদয়ের যোগাযোগ অসম্ভব। কারণ সে শিক্ষা, চেয়েছে পরকালে ব্যক্তিগত অভ্যুদয়, যা নির্ভর করে ইহকালের অভ্যুদয়কে অস্বীকার করার ওপর।

যে সকল কারণে এ দেশবাসীকে স্বদেশপ্রীতিতে শিক্ষিত বা অভ্যস্ত করা দুঃসাধ্য, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় কারণটি এই যে, স্বদেশ-প্রীতির একমাত্র লক্ষ্য জাতীয়-শ্রী বা অভ্যুদয়। এটা সম্পূর্ণ ইহলৌকিক বাস্তব (Materialistic) ব্যাপার। এই অভ্যুদয় নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর। বিজ্ঞান ধর্ম্মের (Religion) হেঁয়ালি ভেঙ্গে দিয়েছে ও দিচ্ছে তাই ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঝগড়া। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের সঙ্গে জাতীয় অভ্যুদয়েরও ঝগড়া; তাই কোন ধর্ম্ম, বিশেষ ক'রে হিন্দু-ধর্ম্মের অস্তিত্বই নির্ভর ক'রে এসেছে উক্ত বাস্তব জাতীয়তাকে বা জাতীয়শ্রীকে অস্বীকার করার ওপর; কাযেই দেশহিতকল্পে দুঃখ-ভোগজনিত আত্মপ্রসাদলাভের বাস্তব আনন্দকেও অস্বীকার করতে কর্ত্তারা বাধ্য হয়েছিলেন।

জনসাধারণের মনে, যে কোনও অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার স্পৃহা অর্থাৎ মানুষের পক্ষে, মানুষের মত হবার অধিকার লাভের তীব্র বাসনামাত্র জাগাতে হ'লেও সর্ব্ববিষয়ে তাদের যতটুকু উন্নত করা আবশ্যক, ততটুকু উন্নতিরও পথরোধক যে ধর্ম্ম, এ সত্য দুনিয়ার অতীত ইতিহাস প্রমাণ করেছে আর এখন তা হাতে কাজে প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ সেকাল হতে আজ পর্য্যন্ত জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছে।

আর একটা সহজ বুদ্ধিতে বোঝবার মত অকাট্য প্রমাণ এই যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার শক্তি দেবার ক্ষমতা যদি ধর্ম্মের থাকত, অথবা ঐ শক্তিলাভের পথ রুদ্ধ করবার ক্ষমতা যদি ধর্ম্মের না থাকত; তা হ'লে স্বদেশী বিদেশী, স্বধর্ম্মাবলম্বী বা বিধর্ম্মী কোন শাসকই,

শাসিতের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করবার হাঁক-ডাক ক'রে প্রতিশ্রুতি দিতেন না, আর ধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা, পৃষ্টপোষক কিম্বা প্রবর্ত্তকও হতেন না।

স্বদেশ-প্রীতি আর ধর্ম্ম, অন্য কথায় জাতীয় অভ্যুদয় (কিম্বা ডেমক্রেশী) আর ধর্ম্মতন্ত্র ; এ দু'টি জিনিষের মধ্যে যে সম্বন্ধ, আলো ও আঁধারের মধ্যেও ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ বিদ্যমান। একটি থাকলে অন্যটি অসম্ভব। সস্তায় নেতৃত্ব করবার জন্য এ দু'টি বিরুদ্ধ ভাবকে গোঁজা মিল দিয়ে মেলাতে গিয়েই নেতারা এত লীলা প্রকট করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখনও হচ্ছেন।

এখন এই লীলা রহস্য সংক্ষেপে বলি। নরেনের হত্যার দু'তিন সপ্তাহ পরে এক দিন আমাদের যোগেনবাবু এসে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লেন, "দোহাই মশায়, রক্ষা করুন। এই বুড়ো বয়েসে আপনাদের জন্য চাকরী গেল, পেনস্যান গেল ; শেষে কি ঘানি টানিয়ে ছাড়বেন!" ব্যাপার কি জান্‌তে চাইলে বললেন, "আপনাদের অমুক পুলিসের কর্ত্তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, জেলের ভেতর আপনারা যে সব কীর্ত্তি করেছেন, তা সব ব'লে দেবে। অরবিন্দ বাবুকে বললুম, তিনি কিছু জানেন না বললেন। এখন আপনারা কিছু উপায় না করলে" ইত্যাদি।

এর দু-তিন সপ্তাহ পরে ১৯শে অক্টোবর প্রথম জজ আদালতে যাবার জন্য আমাদের অর্দ্ধেক আসামী যখন গাড়ীতে মিলিত হয়েছিলাম তখন উক্ত জেলারের কথা তুলেছিলাম। উক্ত শ্রীমান্ 'অমুক' আমাদের সঙ্গে ছিল না। কর্ত্তারা বলেছিলেন, তাঁরাও ওকথা শুনেছেন, এ কথা চেপে রাখাই উচিত ; এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে তার চক্ষুলজ্জা চলে যাবে, আর তাকে denounce করলে আক্রোশে পুলিসকে আরও বেশী ক'রে বলবে। বরং তাকে প্রেম ও সহানুভূতি

দেখাতে হবে। অরবিন্দ বাবুও এতে সায় দিয়েছিলেন। নরেন গোসাইর বেলায়ও যে এই প্রেম আর Will-forcc এর ব্যবস্থা হয়েছিল, তা পূর্ব্বে লিখেছি।

আমি যা আশা ক'রে কর্ত্তাদের কাছে এ কথাটা তুলেছিলাম, সেটা হচ্ছে কর্ত্তারা তাকে যুক্তি দেখিয়ে তার বিবেকের দোহাই দিয়ে, তার ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট আবেদন জানিয়ে, স্বদেশপ্রেমিকতার মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য কঠিনতম দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, এমন কি, সে জন্য ধন-প্রাণ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেবার মহিমা কীর্ত্তন ক'রে, পাশ্চাত্য স্বদেশ উদ্ধারকারীদের দুঃখ-কষ্ট নির্যাতন-ভোগের কীর্ত্তি বর্ণনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ক'রে, তাঁর মতিগতি পরিবর্ত্তন করতে নিশ্চয় পারবেন। অথবা আমাদের নেতাদের পন্থাই যখন "ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে স্বদেশ উদ্ধার" করা আর গীতাকে সেই ধর্ম্মশিক্ষার প্রধানতম গ্রন্থ ব'লে যখন অবলম্বন করেছেন, তখন এ-হেন স্থলে গীতাকে অব্যর্থরূপে কাযে লাগাবেন।

ঠিক এই রকম ধরণের অবস্থাতে অর্জ্জুনের দুর্ব্বলতা দূর ক'রে ফলাফল-বিচার-শূন্য-নিষ্কাম কর্ম্মে প্রেরণা দেবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীতা নাকি গীত হয়েছিল। তাই আশা করেছিলাম, শ্রীকৃষ্ণের এই ভাইস্‌রয়রা বচনের কেরামতির দ্বারা উক্ত শ্রীমানের দুর্ব্বলতা দূর করবেন। অথবা গীতার আশ্রয় নেয়ার চাইতে আরও ভাল কায করতে পারবেন, যদি সেই শ্রীমান্ অমুককে উপলক্ষ্য ক'রে একটা নব্যগীতার সৃষ্টি করতে পারেন। তা হ'লে এই বিপ্লব প্রচেষ্টারূপ ব্যাপারটার একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেত।

কর্ত্তারা গীতার পরম ভক্ত হয়েও শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ না ক'রে, কিম্বা আমাদের সনাতন আর্য্য সভ্যতার আদর্শ রাজা রামচন্দ্র দাম্পত্য

কলহেও প্রেমের বদলে সীতাদেবীর প্রতি যে নির্ম্মম দণ্ডের * ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, আমাদের কর্ত্তারা সেই আদর্শ-রাজাবতারের নজীরও তুচ্ছ ক'রে, কল্লেন কিনা নবাব সিরাজদ্দৌলার অনুকরণ। সিরাজ প্রেমেরদ্বারা, বিশ্বাসঘাতক শ্রীমান্ মিরজাফরের মতিগতি ফেরাতে চেষ্টার † পরিণামে নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, প্রেমের বিধান কেবল দাম্পত্য বা ঐ রকম কোন কিছু কলহেই প্রশস্ত। অন্যত্র বড়ই বিপজ্জনক।

এই প্রেমের গ্যারাণ্টি দেবার ফল শীঘ্রই ফলেছিল। চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে সি, আই, ডি-র বড় কর্ত্তা ডেনহাম সাহেব ও সামসুল আলম মিঞা প্রভৃতির খুব ঘন ঘন শুভাগমন ও গোপন আলাপ সুরু হয়েছিল। একে একে অনেকে এই অযাচিত প্রেমের লোভ সম্বরণ করতে না পেরেই বুঝি, কে কত ইনফরমেশন দিতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চালাতে লাগল।

আদালতে আমাদের পক্ষসমর্থনকারী বড় বড় ব্যারিষ্টার উকীলরাও পাছে লোকে কিছু বলে, এই লজ্জায় আর ভয়ে অর্থাৎ প্রেস্‌টিজ রক্ষার জন্য "ঢাক ঢাক চাপ চাপ" নীতিরই ব্যবস্থা করলেন। এতে ক'রে প্রকারান্তরে এঁরাও ইন্‌ফরমেশন দেবার সুধু প্ররোচনা নয়, পরন্তু ইনফরমেশন দেওয়া জনিত গর্হিত কাযের জন্য লোকনিন্দার বদলে দোষ গোপনের আর প্রেম ও সহানুভূতির গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন।

এ হেন গ্যারাণ্টি পেয়ে ইন্‌ফরমার ও তাদের সাহায্যকারীরা এমনই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়েছিল যে, এই ইন্‌ফরমেশন দেওয়া উচিত ব'লে দাবী করতে একটুও লজ্জাবোধ করে নি। আমাদের মধ্যে দু'এক জন এর প্রতিবাদ করাতে ভীষণ ঝগড়া-ঝাটিও

* সীতার বনবাস।
† পলাশীর যুদ্ধ।

ঘটেছিল। সব চেয়ে মজার কথা এই যে, প্রতিবাদ করবার কি অধিকার আছে, এই প্রশ্নও উঠেছিল। অবশেষে ইন্‌ফরমেশন দেওয়া বৈধ কি না, এই সমস্যার মীমাংসার জন্য ঋষিতুল্য নিরপেক্ষ অরবিন্দ বাবুর মতামত প্রার্থনা করা হয়েছিল। তিনি যা বিধান দিয়েছিলেন, তার সার মর্ম্ম হচ্ছে, ইন্‌ফরমেশন দিয়ে মুক্তিলাভের পর বেশী ক'রে দেশের কায করলেই এই ইন্‌ফরমেশন দেওয়া-জনিত সামান্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। নেড়া যে আবার বেলতলায় যায় না, অর্থাৎ আবার বেশী ক'রে দেশের কায ক'রে বেশী বিপদের মুখে যাবে, তার সিকিউরিটি যে কতটুকু, দেশের কায করতে গিয়ে যেই ধরা পড়বে, সেই যে এই বিধানের বলে ইন্‌ফরমেশন দিয়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবে না বা সবাই এরূপ চেষ্টা করলে যে ইন্‌ফরমেশনের মূল্য থাকবে না, কাযেই মুক্তি-লাভও ঘটবে না, এই সহজ কথা সেই হেতু তখন বোধ হয় কেউ ভেবে দেখেন নি, যেহেতু, তখন জানা ছিল না, আমাদের দেশের জেলখানা রাজদ্রোহীদের পক্ষে কি রকম অব্যর্থরূপে রিফর-মেটারী (reformatory)। আর এও জানা ছিল না, ইন্‌ফরমেশন দেবার ফলে মুক্তিলাভ করবার পর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য বেশী ক'রে দেশের কায কেউ করতে পারে কি না। কারণ, তখনও এর নমুনা দেখাবার সুযোগ এ দেশে কারও বোধ হয় ঘটে নি। বিশেষতঃ অরবিন্দ বাবুর কথা পৃথক্; কারণ, তিনি যে বৈপ্লবিক গুপ্ত ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, তা সকলেই জানেন। কিন্তু অন্যের পক্ষে এই যুক্তি মেনে নেওয়া কি ক'রে সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ খুঁজে বের করবার ভার মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের ওপর দিয়ে উক্ত প্রেম-পন্থীদের এক জনের মুখে পরে যা শুনেছিলাম, তা বলি। ইন্‌ফরমার-

দের প্রতি যারা প্রেম ও সহানুভূতি দেখায়, সেই আসামীরা মনে করে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে কিছু বল্‌বার প্রবৃত্তি ইন্‌ফরমারদের হবে না। ইন্‌ফরমারদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করলে কিংবা তাদের কুকার্যের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করলে, তারা নিশ্চয় বিদ্বেষ-কারীর বিরুদ্ধে, পুলিসের কাছে বেশী ক'রে লাগাবে, আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের মত বদলিয়ে দিলে বা দেবার চেষ্টা মাত্র করলেও পুলিস তা জানতেই পারবে, তখন সেই মতিপরিবর্ত্তনকারীর ওপর পুলিস প্রতিশোধ নেবেই। এই ভেবেই না কি কর্ত্তারা গীতার ভক্ত হয়েও উক্ত শ্রীমান অমুকের মতি ফেরাতে শ্রীকৃষ্ণের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন নি।*

জগতে বড় বড় কর্ম্মবীরের অনুকরণে এঁরা হয় ত মনে করতেন বা এখনও তাঁদের হয়ে কেউ দাবী করতে পারেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে, বিশেষ ক'রে বৈপ্লবিক ব্যাপারে মামুলী উচিত অনুচিত জ্ঞানের তৌলে মেপে, আগে থেকে ন্যায় অন্যায় ভেবে কায করা চলে না। সেই কাযের শেষ জয় বা পরাজয়ের দ্বারাই তা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। বেশ কথা, এই বড়লোকী মতের অনুযায়ী আলোচনা ক'রে এখন দেখা যাক। বাংলা দেশে প্রকৃত কায করবার মত লোকের অভাব হয়েছে কি না, এই অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর বাহুল্য মাত্র। এ ছাড়া দেশ-সেবার যে সকল ব্যবসা সুরু হয়েছে, অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে দরিদ্র দেশবাসীকে সদ্য রক্ষা করবার ওজুহাতে বা তথাকথিত স্বরাজ পাইয়ে দেবার অছিলায় নানা প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নামে হরেক রকম ফাণ্ড খুলে, তাতে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ টাকায়, সে-কাল হতে এ-কাল পর্য্যন্ত কতটুকু দারিদ্র্য নিবারিত হয়েছে বা হবার আশা হয়েছে, আর স্বরাজ

কতদূর এগিয়ে এসেছে, অথবা তাতে ক'রে কত চোর, জুয়াচোর, জালিয়াৎ, অপব্যয়কারী, ভক্তপালক, ভণ্ড ইত্যাদি যে তয়ের হয়েছে, তা পূর্ব্বোক্ত "বেশী ক'রে দেশহিতকর কায করে স্বদেশ-দ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করা", "দোষ ঢাক ঢাক চাপ চাপ" এবং "দোষীর প্রতি প্রেম আর সহানুভূতির গ্যারান্টি", এই ত্রিনীতির কল্যাণে কি না, তা ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

এ ছাড়া আরও ভারী মজার কথা এই যে, এখন নেতারা যে এই ত্রিনীতির প্রভাবে এ হেন সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন দেশেও কায খুঁজে পাচ্ছেন না, তা প্রকট হয়ে পড়ে তাঁদের যত সব অকাযের ফর্দ্দ আর তাতে মস্তিষ্কের অপব্যবহার থেকে; যথা "বৃথা অতীত গৌরবে"র রোমন্থন, বিদেশে তার সমর্থক অন্বেষণ, বিদেশীর কৃত তার অতিরঞ্জনের বিঘোষণ, পাশ্চাত্যবাসীকে আমাদের সভ্যতার কি কি দান করতে হবে, আর কেমন ক'রে করতে হবে, তার উদ্ভাবন ও আয়োজন ইত্যাদি।

যাই হোক্, তার পর এক দিন তদানীন্তন বাংলার মাননীয় লাট সার এডওয়ার্ড বেকার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের বোধ হয় জানুয়ারীতে আমাদের মধ্যে চার জনকে পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ বাবু, ইন্দ্রনাথ নন্দী (লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এস নন্দীর সন্তান) আর বালকৃষ্ণ হরিকানে। পাত্র-মিত্র সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দূরে রেখে, লাট সাহেব সটান সামনেকার উঠোন পেরিয়ে গেছলেন। কুঠরীর গরাদে ধ'রে মৃদুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রে যা বলেছিলেন, তার মর্ম্ম যতটুকু মনে আছে, তা হচ্ছে—আমরা যখন উচ্চ শিক্ষিত, বিশেষ ক'রে য়ুরোপীয় শিক্ষা যখন পেয়েছি, আর উচ্চবংশজাত, তখন আমাদের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের

আনীত ঐ মোকর্দ্দমায় গভর্ণমেণ্টকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। সকলের সঙ্গে ঠিক এ রকম আলাপ হয় ত হয় নি। সকলের সঙ্গে ভূমিকাটা বোধ হয় এই রকমই ছিল।

য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডার আমাদের অনেককে প্রথমে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখত, এক জন, প্রভাস দেব ও আমায় অকথ্য গালাগাল দিয়ে প্রায়ই বলত, সরকারের নিকট প্রার্থনা ক'রে সে আমাদের জল্লাদ নিযুক্ত হবে; তার পর নিজ হাতে আমাদের ফাঁসী দিয়ে ধন্ত হবে। সে অরবিন্দ বাবুকেও এক দিন অপমান করতে দ্বিধাবোধ করে নি। সে অত্যন্ত গোঁয়ার ছিল ব'লে সকলে তার নাম রেখেছিল "রাফিয়ান।" সেই রাফিয়ান কিন্তু কয়েক দিন পরে, আমাদের অনেকের পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। আরও দু'এক জন য়ুরোপীয় ওয়ার্ডারের রাফিয়ানের মত এমন একটু মহৎ হৃদয় ছিল, যা আমাদের মধ্যে বড়ই দুর্ল্লভ। আমাদের মধ্যে যারা পুলিসকে ইন্‌ফরমেশন দিত, তাদের এরা এমন বিদ্বেষ ও ঘৃণা করত যে, তারা পুলিসকে যা বলত, তা শোনবার চেষ্টা করত, আর আমাদের মধ্যে যারা পুলিসের সঙ্গে ও-রকম সম্বন্ধ স্থাপন করতে ঘৃণা-বোধ করত, তাদের তা ব'লে দিয়ে সহানুভূতি দেখাত, আমাদের মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত অনেক খবর দিত, আর অনেক সাহায্যও করত।

লাট সাহেবের পরিদর্শনের কয়েক দিন পরে শোনা গেল, অরবিন্দ বাবুকে জেলের কুঠরীর মধ্যে কিছু লেখবার জন্ত কাগজ-কলম দেওয়া হয়েছিল। আমাদের গোচর থেকে এই ব্যাপারটা গোপন করতে গিয়ে অকারণ এমন বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিল যে, আমাদের সন্দেহের উদ্রেক না হয়ে পারে নি। হঠাৎ নিতান্ত

অসাধারণ ভাবে ৪৪ ডিগ্রির ফাটক থেকে অরবিন্দ বাবুর কুঠরী পর্য্যন্ত সবগুলো উঠোনের সামনের দরজা মায় তার ফুটো, উপরো-উপরি দু-বার বন্ধ করা হয়েছিল দেখে, এর তথ্য জানবার প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল। রাফিয়ান সন্ত কিছুই জানাতে সাহস করে নি। পরে এই পর্য্যন্ত জেনেছিলাম, অরবিন্দ বাবুর জন্য কাগজ-কলম আদি নিয়ে যাওয়া-আসা ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোপন করবার জন্যই ঐ ব্যবস্থা হয়েছিল। অথচ দরজা না বন্ধ ক'রেও আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে এই সামান্য কাজটা সম্পন্ন করতে অনায়াসে পারত।

পরে কোর্টে যাবার সময় গাড়ীতে অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিলাম, তিনি কিছু লিখেছেন। এর বেশী কিছু জানতে পারি নি। তিনি যখন আমাদের দলভুক্ত নন, তখন এই সামান্য ব্যাপার এত গোপন করবার কারণ বুঝতে পারি নি।

যাই হোক, এর কয়েক দিন পরে ঐ লেখা ব্যাপারটা সংক্রামক হয়ে পড়েছিল। তার পর অনেকের পিতা ও অভিভাবকরাও লাট সাহেবের কাছে তাঁদের ছেলেদের, কি সব লিখে পাঠাবার জন্য বিশেষ ক'রে জিদ করেছিলেন। কোর্টে ব্যারিষ্টার সাহেবরা (বিশেষ ক'রে দেশবন্ধু) শুনে, তাঁদের পরামর্শ ব্যতীত ও-রকম লিখতে, এমন কি, অনুনয় ক'রেও নিষেধ করেছিলেন। তখন নিষেধ অনর্থক হয়েছিল। অর্থাৎ গোড়াতে আমাদের মধ্যে যে Morale ব'লে জিনিষটা একটু ছিল, তা তখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছল।

ও দিকে খবরের কাগজে আমাদের বীরত্ব ঘোষণা আর তারিফের অন্ত ছিল না। অর্থাৎ গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের যে আমরা সম্পূর্ণ আদর্শ কর্ম্মী, আমরা সুখে দুঃখে যে একবারে সম্পূর্ণ সমজ্ঞান

জীবন্মুক্ত পুরুষ, তা দেশের লোক সংবাদপত্রের মারফত জেনে ধন্য হয়ে যাচ্ছিল।

এ ধারে আমরা প্রথমে সেসন আদালতে গিয়ে দেখলাম, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় দলের আট জনের মধ্যে ছ' জন সেসন সোপর্দ্দ হয়ে আমাদেরই দলভুক্ত হয়েছেন। বাকী দু'জনের এক জন চন্দন-নগরের ডুপ্লে কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়। ফরাসী রিপাব্লিকের অধিকারভুক্ত স্থানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের অপরাধে তাঁর গ্রেপ্তার, ইণ্টারন্যাসেন্যাল আইন বিরুদ্ধ ব'লে স্ব-নামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যোমকেশ তাঁর মুক্তির দাবী করাতে, জজ সাহেব মিঃ বিচক্রফ্ট্ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। পরে না কি এই আইন অমান্য করবার জন্য ফরাসী সরকার খেসারত আদায় করেছিলেন। অন্য এক জন যিনি বেকসুর খালাস হয়েছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন না কি তিনি নিরালম্ব স্বামী। ইনি পূর্ব্বে এক জন নেতা ছিলেন। পরে না কি বারীনের সঙ্গে ঝগড়া আদির ফলে রাষ্ট্রনৈতিক মত বদলে সনাতন প্রথা অনুযায়ী হয়েছিলেন সন্ন্যাসী।

এই দলের মধ্যে দু'জন ছাড়া বাকী সকলেই অল্পাধিক নাকি বৈপ্লবিক নেতা ব'লে ধৃত হয়েছিলেন। চারু বাবু জেল-কর্ত্তৃপক্ষ ও সি, আই, ডি কর্ম্মচারীর সামনে, "বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে" ব'লে না কি কেঁদে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়তেন। শুনে তখন মনে হয়েছিল, উনি যদি আমাদের গুপ্ত সমিতির নেতা হতেন, তা হ'লে আমাদের হয় ত বোধনে বিসর্জ্জন হ'ত না। সত্য সত্যই না কি তাঁর মনের অবস্থা তখন ঐ রকমই হয়েছিল। আমি তাঁর সম্বন্ধে তখন কিছুই জানতাম না। তাই মনে হয়েছিল, এ সব তাঁর গুপ্ত-সমিতির সভ্যদের অভ্যাসসুলভ কঠিন ন্যাকামী।

সর্ব্বসমেত আমরা ছত্রিশ জন আসামী তখন রইলাম। একখানা কয়েদী যান (prison van) গাড়ীতে আঠার জন ক'রে দু'বারে আদালতে নিয়ে যেত। অবশ্য প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া থাকত। হাতকড়াগুলো আবার একটা লম্বা শেকলে গেঁথে গাড়ীর সঙ্গে তালা দিয়ে আট্‌কান থাকত।

দ্বিতীয় দিন গিয়ে দেখি, আদালত-গৃহের এক কোণে জজ সাহেবের সুমুখের দিকে প্রায় ৬´×১০´ ফিট স্থান আমাদের বসবার জন্য লোহার জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের পুরে দিয়ে তালা বন্ধ করা হ'ত। এই জালের তার কেটে নিয়ে চাবী তৈরী ক'রে মুহূর্ত্তমধ্যে হাতকড়া খুলে ফেলা যেত। পুলিস হায়রান হয়ে অগত্যা ঐ খাঁচার মধ্যে থাকতে আর হাতকড়া দিত না।

অরবিন্দ বাবুকে সমর্থন করবার প্রথমে ভার নিয়েছিলেন মিঃ ব্যোমকেশ। তিনি আইনের মারপেঁচে আমাদের মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। বিফল হ'ল। কম ফিতে হাইকোর্ট ছেড়ে নিম্ন আদালতে আটকে থাকতে রাজী হলেন না। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে ধরা হ'ল। তিনি এককালীন অগ্রিম দু'হাজার টাকা এবং মোকর্দ্দমা শেষ করতে ১২ হাজার টাকা দাবী করেছিলেন। তখন অরবিন্দ বাবুর ভগিনী শ্রদ্ধেয়া কুমারী সরোজিনী ঘোষ তাঁর দাদার জন্য চাঁদা সংগ্রহের 'ফাণ্ড' খুলেছিলেন। তাতে সে যাবৎ লক্ষ টাকা পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার সাহেবকে বিদায় দিতে ব্যয়িত হয়ে গেছল। অথচ সেই দিনই দু'হাজার টাকা চাই। কারণ, পরদিন মোকর্দ্দমা চলবার কথা ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের মুখে পরে শুনেছি, এক জন সহৃদয় মাড়োয়ারী ভদ্রোলোককে বলা মাত্রেই দু'হাজার টাকা তক্ষুনি দিয়েছিলেন।

তখন যা শুনেছিলাম, তাতে মনে হয়, উক্ত ফাণ্ডে না কি উঠেছিল চল্লিস পঞ্চাশ হাজার টাকা। অরবিন্দ বাবু ছাড়া বারীন, উল্লাস, উপেন প্রভৃতি আরও দশ বারো জনের পক্ষ-সমর্থনের ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ ফাণ্ড থেকে। মিঃ আর, সি, ব্যানার্জ্জি ব্যারিষ্টার না কি, বিনা ফিতে, আর কয়েক জন অল্প ফিতে ওদের পক্ষ নিতে রাজি হয়েছিলেন। বাকী সকল আসামীকে যে যার পথ দেখতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেইমত অনেকে আপন আপন বাড়ীর অবস্থানুযায়ী উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেই থোক-থাক টাকাতে একেবারে চুক্তি ক'রে নিয়েছিলেন। কেবল সহৃদয় স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় বিনা ফিতে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকলের জন্য মোকর্দ্দমা তদ্বিরের সমস্ত ভার নিয়েছিলেন। তিনি যে রকম আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম ও যত্ন করেছিলেন, মাতৃপিতৃ-দায়েও বোধ হয় এত কেউ করে না। ফি ছাড়া মোকর্দ্দমা তদ্বিরের অন্যান্য রিস্তর খরচ সকলের নিকট হারাহারি আদায় করা হয়েছিল।

যে সকল আসামীর পক্ষসমর্থনের জন্য অর্থাভাবে উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ দু' ভাই—নগেন ও ধীরেন কবিরাজ, যাদের দোকানে উল্লাস বোমা তৈরীর মাল-মসলা-পূর্ণ কয়েকটি বাক্স রেখে এসেছিল। ঐ বাক্সগুলোতে কি ছিল, বেচারা কবিরাজরা কিছুই জানত না। এই দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে অস্ত্র-আইনের মামলায় হাইকোর্টের বিচারে এক দফা সাত সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড তারা লাভ করেছিল। তার পর আমাদের ষড়যন্ত্রের মোকর্দ্দমায়লিপ্ত ব'লে সেসন সোপর্দ্দও হয়েছিল। তাদের অবস্থা নেহাতই অস্বচ্ছল ছিল। তাই তাদের পক্ষ-সমর্থনের কোন

ব্যবস্থা হয় নি। এদের সঙ্গে আরও কয়েক জন ধৃত হয়েছিল। তাদের অবস্থা বোধ হয় স্বচ্ছল ছিল, তাই তাদের বাড়ীর খরচে উকীল-ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আদালতে নিজ দোষ স্বীকার ক'রে, আবার নির্দোষ প্রমাণিত হবার জন্য উকীল-ব্যারিষ্টার নিয়োগ আদির দ্বারা পক্ষ-সমর্থন চেষ্টার যে কোন কারণ দেখান হউক না কেন, তা যে অকারণ তা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। পরন্তু যেখানে অনেকের খালাস পক্ষসমর্থনের ওপর নির্ভর করেছিল, আর অর্থাভাবে তা যেখানে হচ্ছিল না, সেখানে নিজেদের অকারণ পক্ষ-সমর্থনের ব্যয়টা যে উক্ত ফাণ্ড থেকেই হচ্ছিল, তা কর্ত্তারা জানতেন। কবিরাজদের এ-হেন আপদের জন্য দায়ী কারা, তাও জানতেন আর তাদের মত নির্দোষ আসামীর পক্ষ-সমর্থন না হ'লে যে দণ্ড আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, তাও জানতেন। এই সব জেনে ভদ্রতার খাতিরেও নিজেদের সমর্থনের সুবিধা আর কাউকে না হ'লেও কবিরাজদের দেওয়া উচিত ছিল। তা যে দিলেন না, তার কারণ কি এ নয় যে, খালাসের আশাতেই প্রথমে দোষ স্বীকার করেছিলেন। তাতে কিছু হ'ল না দেখে অবশেষে আবার খালাসেরই জন্য অন্ধ হয়ে (যেমন সাধারণ আসামীরা নিত্য হয়ে থাকে) ব্যারিষ্টারের কেরামতির ওপর বৃথা আশা করেছিলেন।

বোধ হয়, খবরের কাগজে এই ব্যাপারটা প'ড়ে সদ্য বিলাত থেকে আগত এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার মিঃ পরমেশ্বর লাল কবরেজ-দের পক্ষসমর্থন জন্য এসেছিলেন। আর স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মশায়ও শেষে দয়া ক'রে এই ব্যারিষ্টারকে সাহায্য করেছিলেন।

কর্ত্তাদের কাছ থেকে ইন্‌ফরমেসন সংগ্রহ ক'রে পুলিস নাগপুর থেকে বালকৃষ্ণ হরিকানেকে ধ'রে এনে আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। তার অবস্থাও কবিরাজদের মত হয়েছিল। অথচ কানের মত আসামীরই পক্ষসমর্থনের দ্বারা খালাসের আশা ছিল। বাড়ী থেকে সাহায্য পাওয়াতে হাইকোর্টের আপীলে বেচারী মুক্তিও পেয়েছিল; তবু এক বছর হাজত-বাস ছাড়া, সাত মাস যাবৎ বেড়ী প'রে সশ্রম কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। আরও কয়েক জনকে প্রায় এই রকম মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল।

যাই হোক, নেতাদের সঙ্গে চেলারা ধরা পড়লে, ভালমানুষী দেখাবার জন্য, দরকার হ'লে চেলাদের দোষও প্রকাশ করবেন, আদালতে বিচারের সময় পক্ষসমর্থনের সমস্ত সুবিধা নিজেরা ভোগও করবেন, আর চেলাদের দয়াময় ভগবানের কৃপার ওপর ছেড়ে দেবেন, এ সর্ত্ত বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষাকালীন চেলাদের জানিয়ে দিলে কেমন হ'ত?

বিশেষ ক'রে বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা সফল হ'লে, ঐ নেতাদের দ্বারা যে নূতন আধ্যাত্মিক স্বরাজ গড়ে উঠত তার ন্যায়ের বিধানটা কেমন সুষ্ঠু হ'ত, সেইটাই এখানে বিশেষ ক'রে প্রণিধানযোগ্য। আসলে অপ্রিয় হ'লেও এটা অতি সোজা সত্য কথা যে, বিবেক ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নাই, অর্থাৎ আমাদের মনন বা চিন্তা-শক্তি পরাধীন।

আমরা যা চিন্তা করি বা অন্য যে কায করি, তা পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ভগবানের প্রদত্ত পুরস্কারের আশা এবং দণ্ডের ভয় দ্বারা কতকটা চালিত হয়ে নাকি করি। তাতে আমরা অনেকে মনে করি, ভগবান্ সি, আই, ডি, পুলিসের মত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবগুলি ভাল কায করছে কি মন্দ কায করছে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা তার খোঁজ

ক'রে কাউকে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়ে দিচ্ছেন ; আর হাকিমের মত কাউকে দণ্ড বা এক তরফা ডিগ্রির বিধান দিয়ে, আবার পুলিস কিংবা জল্লাদের মত তা কাযে পরিণত করছেন। তার পর অপেক্ষাকৃত একটু কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিরা ভগবানের ওপর এই দণ্ড পুরস্কারের কাযটা আরোপ করা অর্ব্বাচীনতা মনে ক'রে, ভগবান্‌কে এ কায থেকে অব্যাহতি দিয়ে, অন্য যে কাযে নিয়োগ করেছেন, সেই কাযটা হচ্ছে, নিয়োগকারীদের, তাঁর প্রতি ভক্তির মাত্রানুযায়ী আনন্দ আর কথ... কথনও না কি দর্শন দেওয়া। এ ছাড়া অনেকে ভগবান্‌কে আ... অনেক কাযে লাগিয়ে থাকেন।

যাই হোক্, আমরা দেশের কায বা অন্য কিছু করবার বেলায় ভগবানের প্রদত্ত পুরস্কারের প্রলোভন আর দণ্ডের ভয় অপেক্ষা পুলিস আইন-আদালতের ঢের বেশী ভয় যে করি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এত অধিক পুলিস আর হাকিমদের অস্তিত্ব। আবার পুলিস আর হাকি... আদির চাইতেও পারিপার্শ্বিক লোকনিন্দাকে আরও ঢের বেশী ভয় ... করি, তার প্রমাণ, সাহানশা ইংরাজ বাদশার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী পুলিসের কর্ত্তার অভয় পেয়েও ভগবানের বিশেষ ভক্ত—আমাদের কর্ত্তারা লোকনিন্দার ভয়েই "ঢাক ঢাক চাপ চাপ" নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পাপ-পুণ্যের বিধাতা ভগবান, কর্ম্মফল, পরকাল আর পরকালে কর্ম্মফল-ভোক্তা আত্মা, এই কটি জিনিষ, যা দিয়ে শুধু ভক্তদের জন্যই ধর্ম্ম তয়ের হয়েছে, ধর্ম্মের ধ্বজাধারী নেতারা তা যে বিশ্বাস করেন না, তার প্রমাণ, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থের হানি করবার বেলায় ধর্ম্ম, ভগবান, তুরীয়ানন্দ, ভগবানের আদেশ, তাঁর আদর্শ অথবা নিজের বিবেকাদির কোনটাই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। তাঁদের কেবল

একমাত্র গ্রাহ্যের বিষয় হয়েছিল—লোকনিন্দার ভয়। লোকের চক্ষু এড়াবার আপাত সম্ভাবনা থাকলেও দেশ-উদ্ধারকারীদের অনেকে না পারেন, এমন দুষ্কর্ম্ম কিছুই নাই। টাকা-কড়ির অপব্যবহার, অপব্যয়, চুরী, জুয়াচুরী, এ সব ত অতি সামান্য কথা; এ সব হয় ত তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। এর চেয়ে যা না কি শতগুণে সমাজের অনিষ্টকর, সেই ভাবের ঘরে চুরী, জুয়াচুরী করছেন, ধরাও পড়ছেন। ভক্তির বশ। হাড়-মাস-রক্তই হোক বা কাঠ-পাথর-রাংতাই হোক, সাকার না হ'লে আমাদের ভক্তি উথ্‌লোয় না। নিরাকার ভাব বা আদর্শ না কি আমাদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খায় না। কাযেই ভাবের ঘরে চুরী-চামারী হ'লে আমাদের একটুও বাধে না। ভাবের বিপর্য্যয় ঘটলেও সেই ভাবাধার শরীর, বিশেষ ক'রে আমাদের ভক্তির কেন্দ্রস্থল শ্রীচরণখানির কোন পরিবর্ত্তনই দেখতে পাই না। তাই নেতারা যা-ই করুন, তাঁদের প্রতি আমাদের ভক্তি অটুট থাকে। তাঁদের পূজা ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়। এ রকম সিকিউরিটী আছে বলেই ত নেতারা এত বেপরোয়া, এত বিবেকহীন।

নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা অবধারিত মঙ্গলজনক কায করে, সে জন্য লোকমতে বিশেষরূপ নিন্দিত হ'লেও আত্মপ্রসাদ লাভে পরম তৃপ্তি, আর লোকমতে নিন্দিত নয়, বরং বিশেষ প্রশংসিত, এমন কিছু করে, নিজের বিচারবুদ্ধিতে বা বিবেকের দংশনে তা মন্দ ব'লে জেনে আত্মগ্লানির অনুভূতি, এই দু'টি জিনিষ আমাদের মধ্যে বড়ই অভাব কেন? যেহেতু, কার্য্যত দেখতে পাই, লোক-নিন্দা আর স্তুতি আমাদের ভাল মন্দ কায বা চিন্তার প্রবর্ত্তক অথবা পরিচালক। আবার লোকমত আমাদের ধর্ম্মের বা শাস্ত্রের অথবা পরম্পরামানিত লোকাচার দ্বারা শাসিত। শাস্ত্র আর আচার সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থপ্রণোদিত।

শাস্ত্র আবার এমন বস্তু, যাতে খুঁজে নিতে পারলে কোন বিষয়ে হাঁ আর না উভয় বিধান পাওয়া যায়। সুতরাং এই বিধানের দৌলতে এমন গর্হিত কায নাই, যা আমাদের চোখের সামনে নিত্য অবারিত আচরিত হচ্ছে না। অথচ সে জন্য আমাদের একটুও আত্মগ্লানির অনুভূতি নাই।

অন্যদিকে সমাজের মঙ্গলজনক কায বা দেশসেবারূপ মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পালন করতে যাই—কেবল লোকপূজা পাবার আকাঙ্ক্ষায়। যদি তা না হ'ত, তবে শুধু চুয়াল্লিশ ডিগ্রির দুঃখ নয়, দেশসেবার জন্য অনিবার্য্য দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন যত অধিক ভোগ করতাম, ততই পরম তৃপ্তি লাভ ক'রে জীবন সার্থক মনে করতে পারতাম।

যাই হোক, এই ভাবে দু-পক্ষের বিচার অবিচারে সেসন আদালতের পালা সাঙ্গ হ'ল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে। আমাদের মধ্যে ১৭ জনের বে-কসুর খালাস হ'ল। বাকী ১৯ জনের মধ্যে বারীন ও উল্লাসের হয়েছিল ফাঁসীর হুকুম। উপেন, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, সুধীর, ইন্দু (পোর্ট-ব্লেয়ারে আত্মহত্যা করে); অবিনাশ, শৈলেন ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাস, অধিকন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। নিরাপদ (পরে মৃত), শিশির, পরেশ দশ বছর দ্বীপান্তর। সুশীল, বালকৃষ্ণ (পরে মৃত), সাত বছর দ্বীপান্তর আর কৃষ্ণজীবন (পরে মৃত) এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেছিল। অশোক নন্দী থাইসিস্ রোগে বিচার শেষ হবার আগেই মারা যায়।

যারা ছাড়া পেল, তাদের সঙ্গে সদ্য দণ্ডিতদের শেষ বিদায় পনের কি বিশ মিনিটের মধ্যে সারতে হয়েছিল। সে কি মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার! সত্যকার চোখের জল ফেলবার লোক থাকলে অতি দুঃখও যে মধুর হয়, অর্থাৎ যত বড় দুঃখই হোক আর যতকাল স্থায়ী হোক ঐ চোখের জলের স্মৃতি সেই দুঃখটাকে যে মাধুরী-গন্ধে